তাফসীর
ইব্‌নে
কাসীর

অষ্টাদশ খণ্ড

মূলঃ
হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইবনে কাসীর

অষ্টাদশ খন্ড

আম্মাপারা

(সূরা নাবা থেকে সূরা নাস)

মূল ঃ

হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদ ঃ

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

আম্মাপারা

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.drmujib.com

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ঃ
রাবিউল আউওয়াল ১৪১৪ হিজরী
সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ইংরেজী

দ্বাদশ সংস্করণ ঃ
শাবান ১৪৩১ হিজরী
জুলাই ২০১০ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮,
গুলশান, ঢাকা-১২১২।
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা,
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মোঃ ওবাইদুর রহমান
বিনোদপুর বাজার,
রাজশাহী

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ২০০.০০ মাত্র।

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাষ্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবূল করুন। –আমীন!

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুদিত ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর খণ্ড প্রকাশ করার পর অসংখ্য গুণগ্রাহী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভক্ত অনুরাগী ভাই-বোনের অনুরোধে ও বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম প্রকাশ নিঃশেষ হওয়ায় আমরা পুনঃ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিই। মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় কম্পিউটার কম্পোজ করে দ্বিতীয় সংস্করণে ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট ও সপ্তম খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে প্রকাশ করেছি। অতঃপর ১৭ নম্বর খণ্ড প্রকাশ করার পর অষ্টাদশ খণ্ড (আমপারা) প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। প্রথম সংস্করণে পারা ভিত্তিক প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে আমরা সূরা ভিত্তিক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেছি। যথারীতিতে অষ্টাদশ খণ্ড (আমপারা) প্রকাশ করে ৩০ পারার পুরো তাফসীরটি প্রকাশ শেষ হলো। এজন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জানাই হাজার হাজার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা।

মুদ্রণে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকলে, ক্ষমার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি ও তার সহকর্মীবৃন্দ কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন 'রিজেন্ট প্রিন্টিং লিমিটেড' এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য দোয়া কামনা করি।

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে পুনরায় নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রবাসী ও দেশী কয়েকজন ভাই এবং কুরআনের তাফসীর-মজলিসের বোনেরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশ করার জন্য মুক্ত হস্তে যে অনুদান দিয়েছেন, সে জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা দোয়া করি মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্বাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

এর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রামাণিকতা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মূল্যের কথা ইতিপূর্বেই আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীতে। এই বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা ও অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ

লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দূ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দূ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা একাধিক ভাষায় লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা" শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা', 'কুরআন কণিকা', "ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তরকরণ। দুঃখের বিষয় 'ইবনে কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে

দেশের বিদগ্ধ সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে এসেছেন কি? না, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআন পাকের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের বেনুবনেই তা গুমরে গুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই অনমনীয় অদম্য স্পৃহাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় কি?

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন।

আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ। আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

প্রায় দেড় যুগ আগে এই অনুবাদের কাজ শুরু করে এই সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে এই সম্পূর্ণ তাফসীর ১৮ খণ্ডে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। এই খণ্ডগুলোর নিখুঁত ও নির্ভুল প্রকাশনা এবং তা সহৃদয় পাঠকবর্গের হাতে তুলে দেয়া যে আরো কষ্টসাধ্য সময় সাপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য।

আমার এই অনূদিত ও প্রকাশিত খণ্ডগুলোর জনপ্রিয়তা ও উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এর সর্বতোমুখী অপরিসীম গুরুত্বের কথা সম্যক অনুধাবন করে হুবহু আমারই অনুকরণে দেশে আজ আরো একটি তরজমা বাজারজাত হয়েছে। তাই আমি

মনে করি, যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে মহান আল্লাহ যেমন তাঁর সুমহান পাক কালামের খিদমত কল্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একদল নিষ্ঠাবান মুমিন বান্দার মেহনত কবূল করেছেন, তেমনি আমার মতো একজন দীনহীন আকিঞ্চনকেও তিনি তাঁর পবিত্র গ্রন্থের খিদমতে নিয়োজিত করেছেন। এই দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য সৌভাগ্যের শুকরিয়া আমি কোন ভাষায় ব্যক্ত করবো? উপরোক্ত ভাষা এবং শব্দমালা খুঁজতে গিয়েও আমি বারবার আজ খেই হারিয়ে ফেলছি এবং হোঁচট খাচ্ছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত গুনাহগার ব্যক্তির পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযেগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক মাওলানা আব্দুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহাষ্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচাইতে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খণ্ড থেকে একাদশ খণ্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিংশতিতম তথা আমপারা খণ্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্টা ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন ঢাকাস্থ ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দিন। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটি কিছু সংক্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে ১২, ১৩, ১৪ নম্বর খণ্ড প্রকাশ করে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী ভাই বোনদের অনুরোধে ১-২-৩ খণ্ড (একত্রে), ৪-৫-৬-৭ (একত্রে) ও ৮-৯-১০ খণ্ড (একত্রে) এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। এরপর গত ২ বছরে ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ নম্বর খণ্ড (আমপারা) প্রকাশ করে তাফসিরটির প্রকাশ সম্পূর্ণ করে। ১৭ নম্বর খণ্ড প্রকাশ করার সময় আর্থিক সংকট দেখা দিলে বেগম বদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ

প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের ও প্রকাশিত খণ্ডগুলির কেনার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পালিকেশন কমিটি পুরো তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যে ভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নসীব করেন। সুম্মা আমীন!

প্রথম খণ্ড থেকে ১১ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ও পরের খণ্ডগুলির প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। ইতিপূর্বে সব খণ্ডগুলো হয়েছে পারা ভিত্তিক কিন্তু এবার হলো সূরা ভিত্তিক। কারণ প্রতি পারায় সমাপ্তির সাথে সাথে খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলে সূরার একটা চলমান বিষয়বস্তু হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে করে পাঠকের মনের কোণে একটা অস্ফুট অতৃপ্তি ও অব্যক্ত অস্বস্তি বিরাজ করে। এই অতৃপ্তির নিরসন কল্পেই সূরা ভিত্তিক প্রকাশনার অবতারণা।

আমি যুগপৎভাবে দুঃখিত যে, আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং সম্ভাব্য প্রযত্ন সত্ত্বেও একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে এতে কিছু মুদ্রণ বিভ্রাট এবং অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রম প্রমাদ হয়তো রয়ে গেছে। পরবর্তীতে এগুলো সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে পরিবেশিত হবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যাশা পোষণ করছি। এছাড়া এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে এই দীনহীন অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তবে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমি বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদাপ্রস্তুত। কারণ, আমার মতো অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতোটুকু সম্ভব হয়েছে, ততোটুকুই আমি আপাতত সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি। সুতরাং এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের ন্যায়সঙ্গতঃ চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ এবং এর ভাল-মন্দ দোষগুণের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম মূল্যায়ন তাঁরাই করবেন। তাঁদের হাতেই তো রয়েছে মানদণ্ড ও উত্তপ্ত কষ্টিপাথর।

এক্ষণে এই তরজমা যদি চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার মনের কোণে রূহানী আনন্দ দিয়ে কুরআনের মহাশিক্ষাকে তাঁদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ রূপলাভের সংকল্প জাগিয়ে তোলে আর এই আলোকেই তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন

তাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনধারা, তাহলেই এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনাকে আমি সফল ও সার্থক মনে করবো। পবিত্র কুরআনের এক এক হরফে যখন দশ দশ করে নেকী, তখন ইবনে কাসীর শীর্ষক কুরআনের এই সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক বিশুদ্ধতম বিশদ ব্যাখ্যা তাঁদের অন্তরকোণে যে বিপুলভাবে স্পন্দন ও সাড়া জাগাবে এতে আর বিচিত্র কি?

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি। যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যন্ত বিদেশ বিভূঁয়ে এমনিতেই অবসর মুহূর্তের উৎকট অভাব, তদুপরী ইসলাম বিষয়কে কোন কিছু শেখার জন্যে যে সব মাল-মসলা, উপাদান- উপকরণের অপরিহার্য প্রয়োজন তাও এখানে একান্তই দুষ্প্রাপ্য। বিশেষতঃ বাংলাভাষায় কোন উপাদান উপকরণ একেবারেই শুন্যের কোটায়। তবুও আজ আল্লাহ্ পাকের দরবারে জানাই লাখো শুকর যে তিনি এত সব সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এই মহান কাজটিকে অব্যাহত রাখার তাওফীক দিয়েছেন।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহাস্পদদের মধ্যে ডঃ ইউসুফ, ডাঃ রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর আতীক, হাবীব, মুহাম্মদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য।

এদের সবার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্তের। তাই ঘটা করে সপ্রসংশ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সমীচীন হবেনা। তবে এদের আবেগাপ্লুত আন্তরিকতা আমি মনে প্রাণেই অনুভব করি। তাই এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং উভয় জগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও শুভ কামনান্তে আজ প্রাণ খুলে নিরন্তর দোয়া করছি। শুধু তাই নয়, একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা। যেন আরো সঞ্জিবিত, পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত, সুশোভিত এবং পত্র-পল্লবিত করে তুলতে পারে। আমীন! সুম্মা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্থলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং 'রিজেন্ট প্রিন্টিং লিমিটেড' মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা সকল যুগেই দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্তুতি আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

এবারে আসুন ঊর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ "রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্নাসিনা..." অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তবে দয়া করে এজন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করোনা।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

পারস্য কবির ভাষায় ঃ

روز قیامت هر کسے دردست گیردنامه * من نیز حاضرمی شوم تصویر کتب در بغل

অর্থাৎ রোয হাশর ও মহাপ্রলয় কান্ডের সন্ধিক্ষনে যখন সবাই নিজনিজ আমল-নামা সংগে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, তখন আমার নেক আমল যেহেতু একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমি সে দিন মহান, আল্লাহর সম্মুখীন হবো আমার বাহুর নীচে এই সব সদ্-গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। আমীন!

আরব কবির ভাষায় ঃ

يَلُوحُ الْخَطُّ فِى الْقِرْطَاسِ دَهْرًا * وَكَاتِبُهُ رَمِيمٌ فِى التُّرَابِ

অর্থাৎ 'যুগ যুগান্তর ও অনন্তকাল ধরে এই ছাপার হরফগুলো তাফসীরুল কুরআনের পৃষ্ঠায় চির ভাস্বর এবং দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে অথচ লেখকের দেহ পিঞ্জর কবরে লীন হয়ে তার অস্থি মাংশ পর্যন্ত মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

কারণ ক্ষনে ক্ষনে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষ এই নশ্বর জগত থেকে দূরে সরে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে এই কবরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহপাক একে 'বারযাখ' অর্থাৎ অন্তরাল বা মাঝামাঝি ব্যবধানের স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। তাই ইনশাআল্লাহ তিনিই আমাদের সবার আশু মুক্তি ও নাজাতের দুর্গম বন্ধুর পথকে সুগম করবেন। আমীন!

অমা যালিকা আলাল্লাহি বি আযীয। রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আ।

বিনয়াবনত
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

বর্তমানে ঃ
পরিচালক, ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র
৪৭৭, ইষ্ট মিডো এ্যাভ্নিউ
ইষ্ট মিডো, নিউইয়র্ক–১১৫৫৪
যুক্তরাষ্ট্র

অনুবাদক পরিচিতি

১৯৩৬ সালে বাবলাবোনা নামক এক ছায়া ঢাকা নিভৃত গ্রামে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান এর জন্ম। পিতা অধ্যাপক মাওঃ আবদুল গণীর কাছেই তার প্রথম হাতে খড়ি। প্রথমে রাজশাহী নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং পরে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ও. এল ডিগ্রী নিয়ে তিনি দাদনচকে প্রথম স্তরের ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তার পিতা আবদুল গণী সাহেবও এককালে ওখানে অধ্যাপনা করতেন।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান দাদনচক থেকে যখন নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে গিয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রভাষক হন। পরবর্তীতে আরবী বিভাগের সভাপতি, সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ তিনি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও তিনি কিছু দিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক শহরে এক ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক।

গতিশীল প্রবন্ধকার হিসাবে ঢাকার ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন ভাষায় তার বিচিত্র-ধর্মী প্রবন্ধমালা দেশ-বিদেশের একাধিক পত্র পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলাদেশ ছাড়াও দিল্লী, হায়দরাবাদ, লাহোর, করাচী এবং ইসলামাবাদের বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর উর্দূ পত্রিকায় তার যে সব চিন্তাদীপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধমালা মুদ্রিত হয়, সেগুলি পরবর্তীতে নয়াদিল্লী, বেনারস ও ইসলামাবাদ থেকে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের বহু সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় তার অসংখ্য তথ্য-সমৃদ্ধ ও উন্নত মানের প্রবন্ধ রাজি প্রকাশিত হয়েছে একাদিক্রমে। এগুলি একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধিত হতো নিঃসন্দেহে। বর্তমানে সাগর পারের সুদূর প্রবাস থেকেও তিনি সেগুলি প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে এর সঠিক বাস্তবায়ন রয়েছে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাতেই।

১৯৫৩ সালের দিকে ঢাকার বাংলা বাজারস্থ "ঢাকা প্রকাশ" নামক পত্রিকায় তিনি একটি লেখা দিয়েছিলেন অন্তরের বহু সাধ ও আশা-আকাংখা পোষণ করে। লেখাটি মুদ্রণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার নামে নয়; বরং অন্যের নামে। এরপর থেকে বুক ভরা দুঃখ এবং এই বঞ্চনা জনিত ক্ষোভে তিনি সাহিত্য চর্চা একরূপ ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু এ নেশা যাকে একবার পেয়ে বসে, সে তা কোনদিন পরিহার করতে পারে না। লোভী তার ভুলের মাশুল দিয়ে কম্বলকে ছাড়তে চাইলেও কম্বল তাকে ভুলেও কখনো ছাড়ে কি ? ডঃ মুজীবুর রহমানের সাহিত্য কর্ম ও রচনা শৈলীর অধিকাংশই ইসলামী সাহিত্যকে নিয়ে অনুবর্তিত। এ নিয়েই তার নশ্বর জীবন হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সে যাই হোক, উক্ত সালের শেষ প্রান্তে 'তরজুমানুল হাদীস' নামক উচ্চাঙ্গের এক সাময়িক পত্রিকা তার লেখা "ত্যাগের দৃষ্টান্ত ও আদর্শের প্রেরণা" শীর্ষক প্রবন্ধ

ছাপে। তখন কিন্তু তার ঢাকাস্থ ছাত্র-জীবনের পাঠ চুকিয়ে সবে মাত্র লাহোর শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়েছে। এছাড়া দেশ-বিদেশের আরো বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং উচ্চতম বিদ্যাপীঠের ম্যাগাজিনে বহু মৌলিক এবং ভাষান্তরিত প্রবন্ধাবলী, নাটিকা, ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সব মিলিয়ে এগুলির সংখ্যা প্রায় দেড়-দুই'শর কাছাকাছি। এগুলিকে একত্রে সাজিয়ে গুছিয়ে গ্রন্থাবদ্ধ অবস্থায় বিন্যস্ত করে কয়েকটি আলাদা আলাদা খন্ডে সংকলিত করা যেতে পারে। কিন্তু তা করা কি আর সহজ ব্যাপার। ছাপাবে কে? এমনিতেই তার একাধিক প্রবন্ধমালা ও গ্রন্থাবলীর পান্ডুলিপি হারিয়ে গেছে পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলী ও প্রকাশকদের কাছ থেকে। বিগত রাষ্ট্র-বিপ্লব ও গণ-আন্দোলন জনিত ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়ে তার বেশ কিছু পান্ডুলিপি বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে। আর যেগুলি আজো পান্ডুলিপির আকারে আবদ্ধ থেকে গুমরে মরছে, সে সব কবে যে দিনের আলো দেখতে সক্ষম হবে তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

একাধারে ৪-৫টি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা সমূহের প্রায় সবটাতেই তার কিছু না কিছু বই পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে অবলীলাক্রমে। অবসর মুহূর্তে তিনি শিশু সাহিত্যের চর্চা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তার লেখা "বটগাছের ভূত", "মৃত্যুর ভয়", ছোটদের ইবনে বতুতা প্রভৃতি লেখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এভাবে সাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় সমানভাবে পদচারণা করতে গিয়ে তিনি প্রায় তিন যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষায় নিরলস ভাবে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। তার লেখায় কোন আবেগ প্রবণতা নেই, আছে মননশীলতার দীপ্তি। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সাধনাকে তিনি স্বীয় উপজীবিকার উৎস হিসাব গ্রহণ করেননি, বরং অবসর ক্ষণের চিত্ত বিনোদন হিসেবেই বেছে নিয়েছেন।

১৯৫৩-এর দিকে উচ্চ শিক্ষার্থে লাহোর গিয়ে তিনি দেখেন, সেই পরিবেশ সম্পূর্ণই নতুন এবং একেবারেই আলাদা। সেখানকার ভাষা ও সাহিত্য বাংলা নয়; বরং উর্দূ। তাই উর্দূ সাহিত্যকে বাংলায় ভাষান্তরিত করে এদেশের জনগণের জন্য এদেশেরই পত্রপত্রিকায় পাঠাতেন। এগুলির সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তার বইগুলির মধ্যে "মাযামীনে মুজীব" (নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশ) 'ইমাম বুখারী' 'ইমাম মুসলিম' 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ' 'হযরত ইব্রাহীম' 'মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা' 'ইসলামী সাহিত্যে তসলিমুদ্দীন', 'মিসরের ছোট গল্প' 'ক্বোরআন কণিকা' 'তাফসীর ইবনে কাসীর' 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস' 'মদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইউব আনসারী' 'বাংলা ভাষায় ক্বোরআন চর্চা' 'মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ)' 'নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায' 'ইদ্রিস মিয়া' 'মুহাদ্দিস আযীমাবাদী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবীদার। উপরোক্ত বিষয়বস্তুই হচ্ছে তার রচনাশৈলী ও সাহিত্য চর্চার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কৃত অধিকাংশ বই ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত। তার 'আল্লামা জারুল্লাহ্' শীর্ষক বইটি প্রথমে ইসলামাবাদ থেকে উর্দূতে প্রকাশ পায়। এর বাংলা সংস্করণটি প্রথমে ধারাবাহিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় এবং পরে উক্ত সংস্থা থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তার "ক্বোরআনের চিরন্তন

মুজিযা” শীর্ষক বইটিও প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এবং পরবর্তীতে এর উর্দূ সংস্করণটি বেনারস থেকে প্রকাশিত। এর অপূর্ব জনপ্রিয়তার এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, স্বল্প দিনে উভয়েরই বেশ কয়েকটি সংস্করণ বেরিয়ে যায়। “মাযামীনে মুজীব” নামক বইটি একাধিক খন্ডে ভারতের নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। ‘বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআন চর্চার পটভূমি শীর্ষক বইটি গুলবাহার খাতুন কর্তৃক ২৪ পরগণার চিংড়িপোতা থেকে প্রকাশিত। এটি তার পি. এইচ. ডি. থিসিসেরই একাংশ। এর শুরুতে বেশ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মুখবন্ধটি হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রবীণ গবেষক এম, আবদুর রহমানের লেখনী প্রসূত।

মিসর থেকে থিসিস করার সুযোগ পেয়েও ভাগ্যচক্রে পরবর্তীতে যেহেতু তাকে সেই সুযোগটি হারাতে হয়েছিল, তাই ১৯৮১ সালের শুরুতে উক্ত বিষয়বস্তু শীর্ষক থিসিসের ফলশ্রুতিতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। দেশী-বিদেশী পরীক্ষক মন্ডলীগণ সম্মিলিত ভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, এই আলোচ্য সুলিখিত অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এটিও ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত। এর সূচনাংশে বেশ তথ্য সমৃদ্ধ মুখবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ হাবীবুর রহমান চৌধুরী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আবদুস সোবহান সাহেব।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ‘বাংলাদেশের ইতিহাস সমিতি’ ‘ইতিহাস পরিষদ’ ‘এশিয়েটিক সোসাইটি’ ও ‘বাংলা একাডেমীর’ আজীবন সদস্য। এ ছাড়া ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন’, ঢাকা; বাংলাদেশ পরিষদ, রাজশাহী; শাহ মাখদুম ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী প্রভৃতি সংস্থা ও সংগঠনের সদস্য হিসাবে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বেশ কিছুদিন পূর্বে কলতাকার ইন্দো-আরব কালচারাল এসোসিয়েশনও তাকে সদস্যপদ প্রদান করেছে।

এদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মুখী জাতীয় সম্মেলন এবং বড় বড় সভা সমিতিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুরূপভাবে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন কল্পে তিনি বিদেশের বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান এবং চিন্তাদীপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধরাজির উপস্থাপনা করে দেশের প্রতিনিধিত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও তিনি ভাষণ দান করেন। এভাবে মক্কার উম্মুল ক্বোরা ও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহারলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, করাচী, মুলতান ও বাহাওয়ালপুর বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ও ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এসব শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত ভাষন দান ও চিন্তাদীপ্ত প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে তিনি বরাবর অংশ গ্রহণ করেন। অনুরূপ ভাবে লন্ডন, বার্মিংহাম, লেইসটার, ইস্তামবুল, রাজস্থান, আসামের রতনপুর, হাইলাকান্দী প্রভৃতি শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারেও তিনি যোগদান করেন এবং মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মোটকথা, প্রায় ১২-১৪টি দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রচার-প্রসারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই। তাই এতো নদ-নদী আর

সাগর-মহাসাগর পারি দিয়ে এই গগণচুম্বী পরিবেষ্টিত সুদূর আমেরিকার মাটিতে তার প্রথম ও একমাত্র প্রবাস জীবন বললে ভুল হবে। কারণ আগেই বলেছি, ছাত্র জীবন থেকেই তিনি অতি ব্যাপক ভাবে সস্ত্রীক পরিভ্রমণ করেছেন বিচিত্র দেশের পথ-প্রান্তর। প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরণের জাতি, ধর্ম ও মানুষ এবং নানা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবনধারা। সব কিছুই দেখতে চেয়েছেন অতি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে এবং অকপটে ব্যক্ত করেছেন স্বীয় পছন্দ, অপছন্দ ও ভালো মন্দের কথা।

পূর্বেই বলেছি, মিসরের মাটি থেকে আরবী ভাষায় পি. এইচ. ডি করতে চেয়েও তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই মিসরকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে তার লেখা "মিসরের ছোট গল্প", "মার্গারেট", "স্মৃতিময় শৈশব" প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এই শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় দীর্ঘ এক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে দৈনিক মিল্লাতের সাহিত্য পাতায় এবং মাসিক অনুক্তের পৃষ্ঠা সমূহে। বিভিন্ন সংস্করণ এই বইগুলির জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

স্বীয় মাতৃভাষা বাংলায় রচিত তার অধিকাংশ রচনাশৈলীর মাধ্যমে এই ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী ধারাটিকে সুসমৃদ্ধ ও সরস করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এভাবে মুসলিম মানস ও ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুগুলিকে নতুন আঙ্গিকে প্রথম বারের মতো তিনি বিদগ্ধ পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এসব রচনাশৈলী ও সাহিত্যধারা প্রকৃত প্রস্তাবে তার অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা মূলক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এ সবের মাধ্যমে বহু অজ্ঞাত ইতিহাস এবং দূর্লভ ও অপ্রাপ্তব্য তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটেছে।

একান্তই নিঃস্ব, রিক্ত ও নিঃসহায়দের যুগ যন্ত্রণা বুকের মাঝে পুষে রেখে এক মাত্র আল্লাহর আশীষ ধারাকে রক্ষাকবজ করে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার এই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। প্রায় তিন যুগ ধরে নিরলস শিক্ষাদান ও লাগাতার সাহিত্য সেবাই তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে তথ্যানুসন্ধানের আজন্ম প্রবণতাই তার সম্মুখ পানে হাজির করেছে পরিশীলিত বাণী আর তার সাহিত্য সৃষ্টিতে যুগিয়েছে বিচিত্র ধরণের মাল-মসলা এবং উপাদান উপকরণ। নিরন্তর সাহিত্য সৃষ্টিতে তার বিচিত্র অর্ন্তদৃষ্টি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটেছে উপর্যুপরি প্রকাশিত গ্রন্থমালায়। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য-শিল্পের স্মরণীতে তার প্রকাশনাগুলি নিঃসন্দেহে যেন এক একটি স্বগর্ব অধ্যায় ও পথ নির্দেশক। এই অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি প্রথমে উপনীত হয়েছেন গন্ড-গ্রাম-গরে নিভৃত কোণ থেকে শহরে বন্দরে এবং পরে রাজধানী নগরে, আর সর্বশেষ এসেছেন সুদূর আমেরিকার মাটিতে তথা নিউইয়র্ক নগরীতে। বর্তমানে তিনি এই শহরে এই উচ্চাঙ্গের শিক্ষা কেন্দ্রের (এডুকেশন সেন্টার) পরিচালক। আর ইতিপূর্বে ছিলেন "টেষ্টিমনি" নামক এক ইংরেজী মাসিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

কিন্তু এই সুদূর প্রবাসের অতি ব্যস্ত সমস্ত এবং সংগ্রাম মুখর জীবনেও কি তার লেখনী কিংবা সাহিত্য চর্চায় কোন রূপ ছেদ বা ভাটা পড়েছে কিংবা একেবারেই এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে ? না, আদৌ তা হয়নি, বরং তার বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে তা পূর্বের মতোই রয়েছে চির চলমান এবং সদা আগুয়ান।

সূচীপত্র

সূরা **পৃষ্ঠা**

সূরা নাবা ৭৮ — ১৭
সূরা নাযি'আত ৭৯ — ৩৪
সূরা আ'বাসা ৮০ — ৪৭
সূরা তাকভীর ৮১ — ৫৯
সূরা ইনফিতার ৮২ — ৭৪
সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩ — ৮২
সূরা ইনশিকাক ৮৪ — ৯৫
সূরা বুরূজ ৮৫ — ১০৫
সূরা তা-রিক ৮৬ — ১২৩
সূরা আ'লা ৮৭ — ১২৮
সূরা গাশিয়াহ্ ৮৮ — ১৩৭
সূরা ফাজর ৮৯ — ১৪৬
সূরা বালাদ ৯০ — ১৬৩
সূরা আশ্শামসি ৯১ — ১৭৩
সূরা লাইল ৯২ — ১৮২
সূরা দুহা ৯৩ — ১৯২
সূরা আলাম নাশরাহ ৯৪ — ২০২
সূরা তীন ৯৫ — ২০৯
সূরা আ'লাক্ ৯৬ — ২১২
সূরা কাদ্র ৯৭ — ২২০
সূরা বাইয়্যানাহ ৯৮ — ২৩৮
সূরা যিলযাল ৯৯ — ২৪৬
সূরা 'আদিয়াত ১০০ — ২৫৪
সূরা কা'রি'আহ ১০১ — ২৫৯
সূরা তাকাসুর ১০২ — ২৬২
সূরা আস্র ১০৩ — ২৭১
সূরা হুমাযাহ ১০৪ — ২৭৩
সূরা ফীল ১০৫ — ২৭৫
সূরা কুরাইশ ১০৬ — ২৮৫
সূরা মাঊ'ন ১০৭ — ২৮৮
সূরা কাওসার ১০৮ — ২৯৩
সূরা কা-ফিরুন ১০৯ — ২৯৯
সূরা নাস্র ১১০ — ৩০৪
সূরা লাহাব ১১১ — ৩১১
সূরা ইখলাস ১১২ — ৩১৬
সূরা ফালাক ১১৩ — ৩২৮
সূরা নাস ১১৪ — ৩৩৬
ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) — ৩৪১

ত্রিংশতিতম পারা

সূরা ঃ নাবা, মাক্কী

(আয়াতঃ ৪০, রুকূ'ঃ ২)

سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٤٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। তারা পরস্পর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	١- عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ○
২। সেই মহান সংবাদ সম্বন্ধে,	٢- عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ○ لا
৩। যেই বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে থাকে!	٣- الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ○ ط
৪। কখনই না, তাদের ধারণা অবাস্তব, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে;	٤- كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ○ لا
৫। আবার বলি কখনই না, তারা অচিরেই অবগত হবে।	٥- ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ○
৬। আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?	٦- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ○ لا
৭। ও পর্বতসমূহকে কীলক (রূপে) নির্মাণ করিনি?	٧- وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ○ صلے
৮। আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে যুগলে যুগলে;	٨- وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ○ لا
৯। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম,	٩- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ○ لا
১০। করেছি রজনীকে আবরণ,	١٠- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ○ لا
১১। এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের জন্যে (উপযোগী)।	١١- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ○ ص

১২। আর নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ	١٢- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ
১৩। এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ।	١٣- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ
১৪। আর বর্ষণ করেছি জলদজাল হতে প্রচুর বারি	١٤- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ
১৫। তদ্দ্বারা আমি উদ্গত করি শস্য ও উদ্ভিদ,	١٥- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ
১৬। এবং বৃক্ষরাজি বিজড়িত উদ্যানসমূহ।	١٦- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ

যে মুশ্রিকরা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করতো এবং ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে পরস্পরকে নানা ধরনের প্রশ্ন করতো, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঐ সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এবং কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা বর্ণনা করতঃ তাদের দাবী খণ্ডন করছেন। তিনি বলেনঃ 'তারা একে অপরের নিকট কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?' অর্থাৎ তারা একে অপরকে কি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? তারা কি কিয়ামত সম্পর্কে একে অপরের নিকট প্রশ্ন করছে? অথচ এটা তো এক মহা সংবাদ! অর্থাৎ এটা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও খারাপ সংবাদ এবং উজ্জ্বল সুস্পষ্ট দিবালোকের মত প্রকাশমান।

হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) ও হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) نَبَاٌ عَظِيْمٌ দ্বারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতর বলে মনে হচ্ছে অর্থাৎ এর দ্বারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানই উদ্দেশ্য।

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ (যেই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে), এতে যে মতানৈক্যের কথা বলা হয়েছে তা এই যে, এ বিষয়ে তারা দু'টি দলে বিভক্ত রয়েছে। একটি দল এটা স্বীকার করে যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর অপর দল এটা স্বীকারই করে না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে ধমকের সুরে বলছেনঃ 'কখনই না, তাদের ধারণা অবাস্তব, অলীক, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলিঃ কখনই না, তারা অচিরেই জানবে।' এটা তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার কঠিন ধমক ও ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিস্ময়কর সৃষ্টির সূক্ষ্মতার বর্ণনা দেয়ার পর নিজের আজীমুশ্শান ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি এসব জিনিস কোন নমুনা ছাড়াই প্রথমবার যখন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি দ্বিতীয়বারও ওগুলো সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। তাই তো তিনি বলেনঃ 'আমি কি ভূমিকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?' অর্থাৎ আমি সমস্ত সৃষ্টজীবের জন্যে এই ভূমিকে কি সমতল করে বিছিয়ে দিইনি? এই ভাবে যে, ওটা তোমাদের সামনে বিনীত ও অনুগত রয়েছে। নড়াচড়া না করে নীরবে পড়ে রয়েছে। আর পাহাড়কে আমি এই ভূমির জন্যে পেরেক বা কীলক করেছি যাতে এটা হেলাদোলা না করতে পারে এবং ওর উপর বসবাসকারীরা যেন উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।' অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরই প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমি তোমাদেরকে নর ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা একে অপর হতে কামবাসনা পূর্ণ করতে পার। আর এভাবেই তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۔

অর্থাৎ "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (৩০ ঃ ২১)

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম।' অর্থাৎ তোমাদের নিদ্রাকে আমি হট্টগোল গণ্ডগোল বন্ধ হওয়ার কারণ বানিয়েছি যাতে তোমরা আরাম ও শান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের সারা দিনের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এর অনুরূপ আয়াত সূরায়ে ফুরকানে গত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিঃ 'আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ।' অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার ও কৃষ্ণতা জনগণের উপর ছেয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا

অর্থাৎ "শপথ রজনীর যখন সে ওকে আচ্ছাদিত করে।" (৯১ ঃ ৪) আরব কবিরাও তাঁদের কবিতায় রাত্রিকে পোশাক বা আবরণ বলেছেন।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, রাত্রি শান্তি ও বিশ্রামের কারণ হয়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমি দিবসকে জীবিকা সংগ্রহের জন্যে (উপযোগী) করেছি।' অর্থাৎ রাত্রির বিপরীত দিনকে আমি উজ্জ্বল করেছি। দিনের বেলায় আমি অন্ধকার দূরীভূত করেছি যাতে তোমরা ওর মধ্যে জীবিকা আহরণ করতে পার।

মহান আল্লাহ্র উক্তিঃ 'আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ।' অর্থাৎ সাতটি সুউচ্চ, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত আকাশ তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে নির্মাণ করেছি যেগুলো চমৎকার ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। সেই আকাশে তোমরা হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল চকচকে নক্ষত্র দেখতে পাও। ওগুলোর কোন কোনটি পরিভ্রমণ করে ও কোন কোনটি নিশ্চল ও স্থির থাকে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ 'আর আমি সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ।' অর্থাৎ আমি সূর্যকে উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়েছি যা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করে থাকে এবং সমস্ত জিনিসকে ঝক্ঝকে তকতকে করে তোলে ও সারা দুনিয়াকে আলোকময় করে দেয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'এবং আমি বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রবাহিত বায়ু মেঘমালাকে এদিক ওদিক নিয়ে যায়। তারপর ঐ মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা ভূমিকে পরিতৃপ্ত করে। আরো বহু তাফসীরকার বলেছেন যে, مُعْصِرَات দ্বারা বায়ুই উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে, এর দ্বারা ঐ মেঘ উদ্দেশ্য যা বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি বরাবর বর্ষাতেই থাকে।

আরবে اِمْرَأَةٌ مُعْصِرَةٌ ঐ নারীকে বলা হয় যার মাসিক ঋতুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু এখনো ঋতু শুরু হয়নি। অনুরূপভাবে এখানেও অর্থ এই যে, আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে কিন্তু এখনো মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়নি। হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, مُعْصِرَات দ্বারা

আসমানকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য মেঘ হওয়াই অধিকতর প্রকাশমান উক্তি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ
وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ -

অর্থাৎ “আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও যে, ওটা হতে নির্গত হয় বারিধারা।” (৩০ঃ ৪৮)

ثَجَّاجًا -এর অর্থ হলো ক্রমাগত প্রবাহিত হওয়া এবং অত্যধিক বর্ষিত হওয়া। একটি হাদীসে রয়েছেঃ “ঐ হজ্ব হলো সর্বোত্তম হজ্ব যাতে ‘লাব্বায়েক’ খুব বেশী বেশী পাঠ করা হয়, খুব বেশী রক্ত প্রবাহিত করা হয় অর্থাৎ অধিক কুরবানী করা হয়।” এ হাদীসেও ثَجٌّ শব্দ রয়েছে।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, ইসতাহাযাহর মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্নকারিণী একজন সাহাবিয়া মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুলার পুঁটলী কাছে রাখবে।” মহিলাটি বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার রক্ত যে অনবরত আসতেই থাকে।” এই রিওয়াইয়াতেও ثَجٌّ শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ বিরামহীনভাবে রক্ত আসতেই থাকে। সুতরাং এই আয়াতেও উদ্দেশ্য এটাই যে, মেঘ হতে বৃষ্টি অনবরত বর্ষিত হতেই থাকে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ঐ পাক পবিত্র ও বরকতময় বারি দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান। এগুলো মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর আহারের কাজে লাগে। বর্ষিত পানি খালে বিলে জমা রাখা হয়। তারপর ঐ পানি পান করা হয় এবং বাগ-বাগিচা সেই পানি পেয়ে ফুলে-ফলে, রূপে-রসে সুশোভিত হয়। আর বিভিন্ন প্রকারের রঙ, স্বাদ ও গন্ধের ফলমূল মাটি হতে উৎপন্ন হয়, যদিও ভূমির একই খণ্ডে ওগুলো পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য গুরুজন বলেন যে, এর অর্থ হলো জমা বা একত্রিত। এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

অর্থাৎ "পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, তাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরাবিশিষ্ট অথবা এক শিরা বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে, আর ফল হিসেবে ওগুলোর কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে এতে রয়েছে নিদর্শন।" (১৩ঃ ৪)

١٧- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ○	১৭। নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে মীমাংসা দিবস;
١٨- يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا لا ○	১৮। সেই দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে,
١٩- وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا لا ○	১৯। আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।
٢٠- وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ط ○	২০। এবং সঞ্চালিত করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা (বৎ)।
٢١- اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا صلا ○	২১। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওৎপেতে রয়েছে;
٢٢- لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا لا ○	২২। (ওটা হচ্ছে) অবাধ্য লোকদের অবস্থিতি স্থল,
٢٣- لّٰبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا ج ○	২৩। সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে,
٢٤- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا لا ○	২৪। সেথায় তারা কোন স্নিগ্ধ (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবে না, আর কোন পানীয়ও (পাবে না),

২৫। উত্তপ্ত সলিল ও পুঁজ ব্যতীত;	٢٥- اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ
২৬। এটাই সমুচিত প্রতিফল।	٢٦- جَزَآءً وِّفَاقًا ۗ
২৭। তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতো না,	٢٧- اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۙ
২৮। এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল।	٢٨- وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۗ
২৯। সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।	٢٩- وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۙ
৩০। অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি তো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকবো।	٣٠- فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۧ ع

আল্লাহ তা'আলা يَوْمُ الْفَصْلِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলেন যে, ওটা একটা নির্ধারিত দিন। ওটা পূর্বেও আসবে না এবং পরেও আসবে না, বরং ঠিক নির্ধারিত সময়েই আসবে। কিন্তু কখন আসবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কারো এর জ্ঞান নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ -

অর্থাৎ "আমি ওটাকে শুধু নির্ধারিত সময়ের জন্যেই বিলম্বিত করছি।" (১১ঃ ১০৪)

ইরশাদ হচ্ছেঃ 'সেই দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।' প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ নবীর সাথে পৃথক পৃথক থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ

অর্থাৎ "যেই দিন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের ইমামদের সাথে আহ্বান করবো।" (১৭ ঃ ৭১)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا – এই আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "উভয় শিংগার মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "চল্লিশ দিন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমি বলতে পারি না।" তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেনঃ "চল্লিশ মাস কি?" তিনি জবাব দিলেনঃ "তা আমি বলতে পারবো না।" তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ "চল্লিশ বছর?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমি এটাও বলতে অস্বীকার করছি।" তিনি বলেনঃ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে যেভাবে উদ্ভিদ মাটি হতে অঙ্কুরিত হয়। তদ্রূপ মানুষ ভূ-পৃষ্ঠ হতে উত্থিত হতে থাকবে। মানুষের সারা দেহ পচে গলে যায়। শুধুমাত্র একটি জিনিস বাকী থাকে। তা হলো কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি। ঐ অস্থি থেকেই কিয়ামতের দিন মাখলূককে পুনর্গঠন করা হবে।

"আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।" অর্থাৎ আকাশকে খুলে দেয়া হবে এবং তাতে ফেরেশতামণ্ডলীর অবতরণের পথ ও দরজা হয়ে যাবে।

"আর চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা।" যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۔

অর্থাৎ "তুমি পর্বতসমূহ দেখছো ও ওগুলোকে জমাট বলে ধারণা করছো, অথচ ওগুলো কিয়ামতের দিন মেঘের ন্যায় চলতে থাকবে।" (২৭ঃ ৮৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ

অর্থাৎ "পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রংগিন পশমের মত।" (১০১ ঃ ৫)

এখানে আল্লাহ পাক বলেন যে, পর্বতগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা। দর্শকরা মনে করবে যে, ওটা নিশ্চয়ই একটা কিছু, আসলে কিন্তু কিছুই নয়। শেষে ওটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۔
لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَآ اَمْتًا ۔

অর্থাৎ “তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলঃ আমার প্রতিপালক ওগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না।” (২০ঃ ১০৫-১০৭) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ـ

অর্থাৎ “স্মরণ কর, যেদিন আমি পর্বতকে করবো সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর।” (১৮ঃ ৪৭)

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ ‘নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে; (ওটা হবে) সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তন স্থল।” যারা হলো উদ্ধত, নাফরমান ও রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণকারী। জাহান্নামই তাদের প্রত্যাবর্তন ও অবস্থান স্থল। হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদাহ (রঃ)-এর অর্থ এও করেছেন যে, কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না জাহান্নামের উপর দিয়ে গমন করবে। যদি আমল ভাল হয় তবে মুক্তি পেয়ে যাবে, আর যদি আমল খারাপ হয় তবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, ওর উপর তিনটি পুল বা সেতু রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।’ اَحْقَابًا শব্দটি حُقْبٌ শব্দের বহুবচন। দীর্ঘ যুগকে حُقْبٌ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, আশি বছরে এক حُقْبٌ হয়। বারো মাসে হয় এক বছর। ত্রিশ দিনে এক মাস হয় এবং প্রতিটি দিন হাজার বছরের হবে। বহু সাহাবী এবং তাবেয়ী হতে এটা বর্ণিত আছে। কারো কারো মতে সত্তর বছরে এক حُقْبٌ হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এক حُقْبٌ এ হয় চল্লিশ বছর। বছরগুলোর প্রতিটি দিন হাজার বছরের। বাশীর ইবনে কা'ব (রঃ) তো বলেন যে, এক একটি দিন এরূপ বড় এবং এরূপ তিনশ বছরে এক ‘হুকব’। একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, حُقْبٌ -এর মাসগুলো ত্রিশ দিনের, বছরগুলো বারো মাসের, বছরগুলোর দিনের সংখ্যা তিনশ ষাট এবং প্রতিটি দিন দুনিয়ার গণনা হিসেবে এক হাজার বছরের হবে।[১]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, আবূ মুসলিম ইবনে আ'লা (রঃ) সুলাইমান তাইমী (রঃ) কে জিজ্ঞেস করেনঃ “জাহান্নাম হতে কেউ বের হবে

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এ হাদীসটি অত্যন্ত মুনকার। এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছে জাবির ইবনে যুবায়েরের পুত্র কাসেম এবং তার থেকে বর্ণনা করেছে জাফর ইবনে যুবায়ের। দুই জনই পরিত্যাজ্য।

কি?” সুলাইমান তাইমী (রঃ) উত্তরে বলেনঃ ‘আমি নাফে’ (রঃ) হতে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহর কসম! জাহান্নামে সুদীর্ঘকাল অবস্থান ব্যতীত কেউই জাহান্নাম হতে বের হবে না।” তারপর বলেনঃ “আশির উপর কিছু বেশী বছরে এক حُقُبٌ হয়। প্রতি বছরে তিনশ’ ষাট দিন রয়েছে তোমরা গণনা করে থাকো।”

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে সাতশ’ ‘হকব’ পর্যন্ত থাকবে। প্রতিটি ‘হকবে’ সত্তর বছর রয়েছে, প্রতিটি বছরের দিনের সংখ্যা হলো তিনশ ষাট এবং প্রতিটি দিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান।

হযরত মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا-এই আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

হযরত খালিদ ইবনে মা’দান (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি এবং اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ (অর্থাৎ জাহান্নামীরা জাহান্নামে থাকবে আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন) এই আয়াতটি একত্ববাদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন ঃ ‘এও হতে পারে যে, لٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا সম্পর্কযুক্ত হবে حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا এর সাথে। অর্থাৎ ‘ফুটন্ত পানি ও পুঁজ’ এই একই শাস্তি যুগ যুগ ধরে হতে থাকবে। তারপর অন্য প্রকারের শাস্তি শুরু হবে। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, জাহান্নামে অবস্থানকালের পরিসমাপ্তিই নেই।

হযরত হাসান (রঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ ‘আহ্কাব’ এর অর্থ হলো জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করা। কিন্তু حُقُبٌ বলা হয় সত্তর বছরকে যার প্রতিটি দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, আহ্কাব কখনো শেষ হবার নয়। এক হাকব শেষ হলে অন্য হাকব শুরু হয়ে যাবে। এই আহ্কাবের সঠিক সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা’আলারই রয়েছে। তবে মানুষকে শুধু এতোটুকু জানানো হয়েছে যে, আশি বছরে এক حُقُبٌ হয়। এক বছরের মধ্যে রয়েছে তিনশ ষাট দিন এবং প্রতিটি দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সেথায় তারা আস্বাদন করবে না শৈত্য, না কোন পানীয়। অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে এমন ঠাণ্ডা জিনিস দেয়া হবে না যার ফলে তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতে পারে এবং ঠাণ্ডা পানীয়ও পান করতে দেয়া হবে না। বরং এর পরিবর্তে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি ও রক্ত পুঁজ।

حَمِيْم এমন কঠিন গরমকে বলা হয় যার পরে গরম বা উষ্ণতার আর কোন স্তর নেই। আর غَسَّاق বলে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত পুঁজ ইত্যাদিকে। এই গরমের মুকাবিলায় এমন শৈত্য দেয়া হবে যে, তা স্বয়ং যেন একটা আযাব এবং তাতে থাকবে অসহনীয় দুর্গন্ধ। সূরায়ে 'সাদ' -এর মধ্যে غَسَّاق -এর তাফসীর গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অশেষ রহমতের বদৌলতে আমাদেরকে তাঁর সর্বপ্রকারের শাস্তি হতে রক্ষা করুন! আমীন!

কেউ কেউ بَرْد শব্দের অর্থ ঘুমও বলেছেন। আরব কবিদের কবিতায়ও برد শব্দটি ঘুমের অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'এটাই উপযুক্ত প্রতিফল।'

এখানে তাদের দুষ্কৃতি লক্ষ্যণীয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হিসাব-নিকাশের কোন ক্ষণ আসবেই না। আল্লাহ যেসব দলীল প্রমাণ তাঁর নবীদের উপর অবতীর্ণ করেছেন, তারা এ সব কিছুকেই একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতো।

كِذَّابًا শব্দটি 'মাসদার' বা ক্রিয়ামূল। এই ওজনে আরো মাসদার রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ 'সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।' অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদের সমস্ত আমল অবগত রয়েছি এবং ওগুলোকে লিখে রেখেছি। সবগুলোরই আমি প্রতিফল প্রদান করবো। ভাল কাজ হলে ভাল প্রতিফল এবং মন্দ কাজ হলে মন্দ প্রতিফল।

জাহান্নামীদেরকে বলা হবেঃ এখন তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এরকমই এবং এর চেয়েও নিকৃষ্ট শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামীদের জন্যে এর চেয়ে কঠিন ও নৈরাশ্যজনক কোন আয়াত আর নেই। তাদের শাস্তি সদা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি হযরত আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলামঃ জাহান্নামীদের জন্যে কঠিনতম আয়াত কোনটি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ ... -এ আয়াতটি পাঠ করার পর নিম্নের বাক্যটি বলতে শুনেছিঃ "কওমকে তাদের মহামহিমান্বিত আল্লাহর অবাধ্যাচরণ ধ্বংস করে দিয়েছে।"[১]

---

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর একজন বর্ণনাকারী জাসর ইবনে ফারকাদ অত্যন্ত দুর্বল।

৩১। এবং নিশ্চয়ই সংযমশীল লোকদের জন্যেই সফলতা;

٣١- اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ○

৩২। প্রাচীর বেষ্টিত কানন কলাপ ও আঙ্গুর;

٣٢- حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ○

৩৩। এবং সমবয়স্কা যুবতীবৃন্দ;

٣٣- وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ○

৩৪। এবং পূর্ণ পূত পরম্পরা গত পানপাত্র।

٣٤- وَّكَاْسًا دِهَاقًا ؕ○

৩৫। সেথায় তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য;

٣٥- لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۚ○

৩৬। এটাই তোমার প্রতিপালকের পরিগণিত অনুগ্রহের প্রতিদান।

٣٦- جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ○

পরহেযগার ও পুণ্যবানদের জন্যে আল্লাহর নিকট যেসব নিয়ামত ও রহমত রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলছেন যে, এই লোকগুলো হলো সফলকাম। এদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে এবং এরা জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করে জান্নাতে পৌঁছে গেছে।

حَدَآئِقَ বলা হয় খেজুর ইত্যাদির বাগানকে। এই পুণ্যবান ও পরহেযগার লোকগুলো উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী অর্থাৎ হূর লাভ করবে, যারা হবে উঁচু ও স্ফীত বক্ষের অধিকারিণী এবং সমবয়স্কা। যেমন সূরায়ে ওয়াকিআ'র তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা গত হয়েছে।

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ নিশ্চয়ই জান্নাতীদের (গায়ের) জামাগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টিরূপে প্রকাশিত হবে। তাদের উপর মেঘমালা ছেয়ে যাবে এবং তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে "হে জান্নাতবাসিগণ! তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের উপর তা বর্ষণ করি?" (অতঃপর তারা যা কিছু চাইবে তা-ই তাদের উপর বর্ষিত হবে) এমন কি তাদের উপর সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণীও বর্ষিত হবে।"[১]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তারা পবিত্র শরাবের উপচে পড়া পেয়ালা একটির পর একটি লাভ করবে। তাতে এমন কোন নেশা হবে না যে, অশ্লীল ও অর্থহীন কথা তাদের মুখ দিয়ে বের হবে যা অন্য কেউ শুনতে পাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ -

অর্থাৎ "তথায় থাকবে না কোন অসার ও পাপের কথা।" অর্থাৎ তাতে কোন অর্থহীন বাজে কথা এবং অশ্লীল ও পাপের কথা প্রকাশ পাবে না। সেটা হলো দারুস সালাম বা শান্তির ঘর। যেখানে কোন দূষণীয় বা মন্দ কথাই প্রকাশ পাবে না।

পুণ্যবানদেরকে এসব নিয়ামত তাদের সৎ কর্মের বিনিময় হিসেবে আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। এটা হলো মহান আল্লাহর অশেষ করুণা ও রহমত। আল্লাহ পাকের এই করুণা ও অনুগ্রহ সীমাহীন, ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। আরবরা বলে থাকেঃ

اَعْطَانِىْ فَاَحْسَبَنِىْ অর্থাৎ "তিনি আমাকে ইনআম দিয়েছেন এবং পরিপূর্ণরূপেই দিয়েছেন।" অনুরূপভাবে বলা হয়ঃ حَسْبِىَ اللّٰهُ অর্থাৎ "সর্বদিক দিয়ে আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

৩৭। যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওগুলোর অন্তর্বর্তী সবকিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁর নিকট আবেদন নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না।

٣٧- رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ
مِنْهُ خِطَابًا ۝

৩৮। সেই দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে সঙ্গত কথা বলবে।

٣٨- يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
صَفًّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ
لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

৩৯। এই দিবস সুনিশ্চিত; অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক।

٣٩- ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ
شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ۝

٤٠- اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝ ع

٢ ع ١٠ ٢

৪০। আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেই দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবেঃ হায়রে হতভাগা আমি, যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম!

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি রহমান বা পরম দয়াময়। তাঁর রহমত বা করুণা সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর সামনে কেউ মুখ খুলতে পারবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

অর্থাৎ "কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?" (২ঃ ২৫৫) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ

অর্থাৎ "যেই দিন ঐ সময় আসবে সেই দিন কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে মুখ খুলতে বা কথা বলতে সাহস পাবে না।" (১১ঃ ১০৫)

রূহ দ্বারা হয়তো উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষের রূহ বা সমস্ত মানুষ, অথবা এক প্রকারের বিশেষ মাখলূক যারা মানুষের মত আকার বিশিষ্ট, পানাহার করে থাকে, যারা ফেরেশতাও নয়, মানুষও নয়। অথবা রূহ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে অন্য জায়গাতেও রূহ বলা হয়েছে। যেমনঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ـ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "ওটাকে বিশ্বস্ত আত্মা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছে যাতে তুমি ভয় প্রদর্শকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।" (২৬ঃ ১৯৩-১৯৪) এখানে রূহ দ্বারা নিশ্চিত রূপেই হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, সমস্ত ফেরেশতার মধ্যে বুযুর্গতম, অহী বাহক, আল্লাহর নৈকট্যলাভে

সমর্থ হয়েছেন এমন ফেরেশতা হলেন এই জিবরাঈল (আঃ)। অথবা রূহ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে নিম্নের আয়াতটি পেশ করা যেতে পারেঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۔

অর্থাৎ "এভাবেই আমি আমার আদেশে তোমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করেছি।" (৪২ঃ ৫২) এখানে রূহ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। ষষ্ঠ উক্তি এই যে, এই রূহ হলেন সমগ্র মাখলূকের সম আয়তন বিশিষ্ট এক ফেরেশতা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই ফেরেশতা সমস্ত ফেরেশতা হতে বহু গুণে বড়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রূহ নামক এই ফেরেশতা চতুর্থ আসমানে রয়েছেন। তিনি সমস্ত আকাশ, সমগ্র পাহাড়-পর্বত এবং সমস্ত ফেরেশতা হতে বড়। প্রত্যহ তিনি বারো হাজার তাসবীহ পাঠ করে থাকেন। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা জন্ম লাভ করে থাকেন। কিয়ামতের দিন তিনি একাই একটি সারিরূপে আসবেন। কিন্তু এই উক্তিটি হাদীসের সংজ্ঞায় খুবই গারীব বা দুর্বল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "ফেরেশতাদের মধ্যে এমন এক ফেরেশতাও রয়েছেন যে, যদি তাকে বলা হয়ঃ আকাশ ও পৃথিবীকে এক গ্রাসে নিয়ে নাও, তবে তিনি এক গ্রাসেই সবকে নিয়ে নিবেন।" তাঁর তাসবীহ হলোঃ سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ অর্থাৎ "আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি আপনি যেখানেই থাকুন না কেন।"[১]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এসব উক্তি আনয়ন করেছেন, কিন্তু কোন ফায়সালা করেননি। আমার মতে তো এখানে রূহ দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত (অন্যেরা কথা বলবে না)।" আল্লাহ পাকের এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতইঃ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হাদীস। এমনকি এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তি হওয়া সম্পর্কেও সমালোচনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি হবে। আর ওটাও হয় তো তিনি বানী ইসরাঈল হতে গ্রহণ করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ

অর্থাৎ "যখন ঐ দিন আসবে তখন তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কেউই কথা বলবে না।" (১১ ঃ ১০৫) সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ " সেইদিন রাসূলগণ ছাড়া কেউই কথা বলবে না।"

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'এবং সে যথার্থ বলবে।' সর্বাধিক সত্য কথা হলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।"

মহান আল্লাহর উক্তিঃ 'এই দিবস সুনিশ্চিত।' অর্থাৎ অবশ্যই এটা সংঘটিত হবে। 'অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক।' অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে তার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবার পথ তৈরী করুক, যে পথে চলে সে সোজাভাবে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি হতে সতর্ক করলাম।' অর্থাৎ কিয়ামতের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করলাম। যা আসবে তাকে এসেই গেছে মনে করা উচিত। কারণ যা আসার তা আসবেই। সেই দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। ঐদিন নতুন, পুরাতন, ছোট, বড় এবং ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল মানুষের সামনে থাকবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ـ

অর্থাৎ "তারা যে আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে।" (১৮ ঃ ৪৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ

অর্থাৎ "সেই দিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে পাঠিয়েছে ও যা পশ্চাতে রেখে গেছে সে সম্পর্কে।" (৭৫ঃ ১৩)

"আর কাফির বলবেঃ হায়, আমি যদি মাটি হতাম।" অর্থাৎ দুনিয়ায় যদি আমরা মাটিরূপে থাকতাম, যদি আমাদেরকে সৃষ্টিই না করা হতো এবং আমাদের কোন অস্তিত্বই না থাকতো তবে কতই না ভাল হতো! তারা সেদিন আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। নিজেদের মন্দ ও পাপকর্মগুলো সামনে থাকবে যেগুলো পবিত্র ফেরেশতাদের ন্যায়পূর্ণ হস্তে লিখিত হয়েছে।

সুতরাং একটি অর্থ তো এই হলো যে, তারা দুনিয়াতেই মাটি হবার আকাঙ্ক্ষা করবে। অর্থাৎ সৃষ্ট না হওয়া কামনা করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যখন জীবজন্তুগুলোর ফায়সালা হয়ে যাবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে, এমন কি যদি শিংবিহীন বকরীকে শিংবিশিষ্ট বকরী মেরে থাকে তবে তারও প্রতিশোধ নিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাদেরকে (জন্তুগুলোকে) বলা হবে ঃ তোমরা মাটি হয়ে যাও, তখন তারা মাটি হয়ে যাবে। তখন এই কাফির লোকও বলবেঃ হায়, যদি আমি (এদের মত) মাটি হয়ে যেতাম! অর্থাৎ যদি আমিও জন্তু হতাম এবং এভাবে মাটি হয়ে যেতাম তবে কতই না ভাল হতো!

সূরের (শিংগার) সুদীর্ঘ হাদীসেও এই বিষয়টি এসেছে এবং হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

সূরা ঃ নাবা এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ নাযি‘আত, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৪৬, রুকূ' ঃ ২)

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٤٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,	١- وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ○
২। এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয়,	٢- وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ○
৩। এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,	٣- وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ○
৪। এবং যারা দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়,	٤- فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ○
৫। অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।	٥- فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ○
৬। সেই দিন প্রথম শিঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করবে,	٦- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ○
৭। ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি,	٧- تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۭ○
৮। কত হৃদয় সেই দিন সন্ত্রস্ত হবে,	٨- قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ○
৯। তাদের দৃষ্টি ভীতি বিহ্বলতায় অবনমিত হবে।	٩- اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ○
১০। তারা বলেঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই	١٠- يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۭ○
১১। গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?	١١- ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۭ○

১২। তারা বলেঃ তা-ই যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন!	١٢- قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ○
১৩। এটা তো এক বিকট শব্দ মাত্র;	١٣- فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ○
১৪। ফলে তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।	١٤- فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ○

এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে যাঁরা কোন কোন মানুষের রূহ কঠিনভাবে টেনে বের করেন এবং কারো কারো রূহ এমন সহজভাবে কব্য করেন যে, যেন একটা বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। কাফিরদের রূহ টেনে হিঁচড়ে বের করে নেয়া হয়, তারপর জাহান্নামে ডুবিয়ে দেয়া হয়। এটা মৃত্যুর সময়ের আলোচনা। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য। হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا দ্বারা নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কঠিনভাবে সংগ্রামকারীকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক উক্তি। অর্থাৎ এর দ্বারা রূহ বেরকারী ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে তৃতীয় আয়াত সম্পর্কেও এই তিনটি তাফসীর বর্ণিত আছে। অর্থাৎ ফেরেশতা, মৃত্যু ও নক্ষত্র। হযরত আতা (রঃ) বলেন যে, এখানে নৌকা উদ্দেশ্য।

سٰبِقٰت শব্দের তাফসীরেও এই তিনটি উক্তি রয়েছে। অর্থ হচ্ছে ঈমান ও তাসদীকের দিকে অগ্রগামী। আতা (রঃ) বলেন যে, মুজাহিদদের ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে।

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا (অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে)। এর দ্বারা ও ফেরেশতামণ্ডলী উদ্দেশ্য। এটা হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত আতা (রঃ), হযরত আবু স্বালেহ (রঃ), হযরত হাসান (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত রাবী ইবনে আনাস (রঃ) এবং হযরত সুদ্দীর (রঃ) উক্তি। হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, যে ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশক্রমে আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সর্বত্র কর্ম নির্বাহকারী। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই উক্তিগুলোর মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি।

'সেই দিন প্রথম শিংঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করবে ও ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি' এটা দ্বারা দুটো শিঙ্গাধ্বনি উদ্দেশ্য। প্রথম শিঙ্গার বর্ণনা يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ। (যেই দিন যমীন ও পাহাড় প্রকম্পিত হবে) এই আয়াতে রয়েছে আর দ্বিতীয় শিংগার বর্ণনা রয়েছে নিম্নের আয়াতেঃ

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً-

অর্থাৎ "পবর্তমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় ওগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।" (৬৯ ঃ ১৪)

হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রথম প্রকম্পিতকারী আসবে এবং ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী প্রকম্পিতকারী। অর্থাৎ মৃত্যু স্বসঙ্গীয় সমস্ত বিপদ আপদ নিয়ে আসবে।" একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যদি আমার অযীফা পাঠের সারাক্ষণ আপনার উপর দুরূদ পাঠ করতে থাকি (তবে কি হবে)?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশা হতে রক্ষা করবেন।"[১]

জামে তিরমিযী ও মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, যখন রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) উঠে পড়তেন ও বলতেনঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রথম প্রকম্পিতকারী এসে পড়েছে এবং পরবর্তী প্রকম্পিতকারী ওর অনুসরণ করছে এবং মৃত্যু তার সঙ্গীয় বিপদ-আপদ নিয়ে চলে আসছে।"

কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে, তাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। কেননা তারা নিজেদের পাপ এবং আল্লাহর আযাব আজ প্রত্যক্ষ করেছে।

যে সব মুশরিক পরস্পর বলাবলি করতোঃ কবরে যাওয়ার পরেও কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে? আজ তারা নিজেদের জীবনের গ্লানি ও অবমাননা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করবে।

حافرة কবরকে বলা হয়। অর্থাৎ কবরে যাওয়ার পর দেহ সড়ে-পড়ে যাবে এবং অস্থি পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাবে। এরপরেও কি পুনরুজ্জীবিত করা হবে? তাহলে তো দ্বিতীয়বারের এ জীবন অপমানজনক ও ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে। কুরায়েশ কাফিররা এ সব কথা বলাবলি করতো। حَافِرَةٌ শব্দের অর্থ মৃত্যুর

---

[১] এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

পরবর্তী জীবন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা জাহান্নামের নাম বলে উল্লেখ আছে। এই জাহান্নামের বহু নাম রয়েছে। যেমন জাহীম, সাকার, হাবিয়াহ, হাফিরাহ, লাযা, হুতামাহ্ ইত্যাদি।

এখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারা যে বিষয়টিকে বিরাট ও অসম্ভব বলে মনে করছে সেটা আমার ব্যাপক ক্ষমতার আওতাধীনে খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। এটা তো শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ। এর ফলে তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। তাঁর ফুৎকারের সাথে সাথেই আগের ও পরের সবাই জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সামনে এক ময়দানে সমবেত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ـ

অর্থাৎ "যে দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন তখন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে জবাব দিবে এবং জানতে পারবে যে, খুব অল্প সময়ই তোমরা অবস্থান করেছো।" (১৭ ঃ ৫২) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

অর্থাৎ "আমার আদেশ এতো কম সময়ের মধ্যে পালিত হবে যে, ঠিক যেন চোখের পলক ফেলার সময়।" (৫৪ ঃ ৫০) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

অর্থাৎ "কিয়ামতের আদেশ চোখের পলক ফেলার মত সময়ে কার্যকরী হবে, বরং এর চেয়েও কম সময়ে।" (১৬ ঃ ৭৭) এখানেও বলা হয়েছেঃ 'এটা তো এক বিকট শব্দের বিলম্ব মাত্র, তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।' ঐদিন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ ভীষণ ক্রুদ্ধ হবেন। এই শব্দও ক্রোধের সাথেই হবে। এটা হলো, শেষ ফুৎকার, যেই ফুৎকারের পরেই সমস্ত মানুষ জমীনের উপরে এসে পড়বে। অথচ এর পূর্বে তারা ছিল মাটির নীচে।

سَاهِرَة শব্দের অর্থ হলো ভূ-পৃষ্ঠ ও সমতল ময়দান। সাওরী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা সিরিয়ার যমীনকে বুঝানো হয়েছে। উসমান ইবনে আবিল আ'নিকার (রঃ) উক্তি এই যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের যমীন। অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, سَاهِرَة হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের এক দিকের

একটি পাহাড়। কিন্তু এটা হলো সবচেয়ে গারীব বা দুর্বল উক্তি। প্রথমটিই সঠিকতম উক্তি অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ। সমস্ত মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে সমবেত হবে। ঐ সময় ভূ-পৃষ্ঠ হবে সাদা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং শূন্য। যেমন ময়দার রুটি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থাৎ “যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও, আর মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।” (১৪ ঃ ৪৮) আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۔ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۔

অর্থাৎ “তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলঃ আমার প্রতিপালক ওগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না।” (২০ ঃ ১০৫–১০৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۔

অর্থাৎ ‘আর যেদিন আমি পাহাড়কে চালিত করবো এবং ভূ-পৃষ্ঠ পরিষ্কার রূপে প্রকাশ হয়ে পড়বে।” (১৮ ঃ ৪৭) মোটকথা, সম্পূর্ণ নতুন একটি যমীন হবে, যেই যমীনে কখনো কোন অন্যায়, খুনাখুনি এবং পাপাচার সংঘটিত হয়নি।

১৫। তোমার নিকট মূসা (আঃ)-এর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?	١٥– هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ○
১৬। যখন তার প্রতিপালক পবিত্র তোওয়া প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,	١٦– اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ○
১৭। ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে,	١٧– اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○
১৮। এবং (তাকে) বলঃ তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও?	١٨– فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ○

১৯। আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।	١٩- وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝ ج
২০। অতঃপর সে তাকে মহানিদর্শন দেখালো।	٢٠- فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝ زصلے
২১। কিন্তু সে অস্বীকার করলো এবং অবাধ্য হলো।	٢١- فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝
২২। অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো।	٢٢- ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝ زصلے
২৩। সে সকলকে সমবেত করলো এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো,	٢٣- فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝
২৪। আর বললোঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।	٢٤- فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝
২৫। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন পরকালের ও ইহকালের দণ্ডের নিমিত্ত।	٢٥- فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۝ ط
২৬। যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।	٢٦- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝ ع ط

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-কে অবহিত করছেন যে, তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল হযরত মূসা (আঃ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং মু'জিযা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফিরাউন ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও কুফরী হতে বিরত হয়নি। অবশেষে তার উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হলো এবং সে ধ্বংস হয়ে গেল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ) তোমার বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফিরদেরও অনুরূপ অবস্থা হবে। এজন্যেই এই ঘটনার শেষে বলেনঃ 'যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।'

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তোমার নিকট কি মূসা (আঃ)-এর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? ঐ সময় হযরত মূসা (আঃ) 'তুওয়া' নামক

একটি পবিত্র প্রান্তরে ছিলেন। তুওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সূরা তোয়াহা' এর মধ্যে গত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে আহ্বান করে বলেনঃ ফিরাউন হঠকারিতা, অহংকার ও সীমালংঘন করেছে। সুতরাং তুমি তার কাছে গমন কর এবং আমার বার্তা তার নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তাকে জিজ্ঞেস কর যে, তোমার কথা শুনে সে সরল, সত্য ও পবিত্র পথে পরিচালিত হতে চায় কি না? তাকে তুমি বলবেঃ তুমি যদি আমার কথা শ্রবণ কর ও মান্য কর তবে তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। আমি তোমাকে আল্লাহর ইবাদতের এমন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করবো যার ফলে তোমার হৃদয় নরম ও উজ্জ্বল হবে। তোমার অন্তরে বিনয় ও আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি হবে। আর তোমার মন হতে কঠোরতা, রূঢ়তা ও নির্মমতা বিদূরিত হয়ে যাবে।

হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনের কাছে গেলেন, তাকে আল্লাহর বাণী শোনালেন, যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করলেন এবং নিজের সত্যতার স্বপক্ষে মু'জিযা দেখালেন। কিন্তু ফিরাউনের মনে কুফরী বদ্ধমূল ছিল বলে সে হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা শোনা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না। সে বারবার সত্যকে অস্বীকার করে নিজের হঠকারী স্বভাবের উপর অটল রয়ে গেল। হক ও সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য ফিরাউন ঈমান আনতে পারলো না।

ফিরাউনের মন জানতো যে, তার কাছে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে যিনি এসেছেন তিনি সত্য নবী এবং তাঁর শিক্ষাও সত্য। কিন্তু তার মন জানলেও সে বিশ্বাস করতে পারলো না। জানা এক কথা এবং ঈমান আনয়ন করা অন্য কথা। মন যা জানে তা বিশ্বাস করাই হলো ঈমান, অর্থাৎ সত্যের অনুগত হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কথার প্রতি আমল করার জন্যে আত্মনিয়োগ করা।

ফিরাউন সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সত্যবিরোধী তৎপরতা চালাতে শুরু করলো। সে যাদুকরদেরকে একত্রিত করে তাদের কাছে হযরত মূসা (আঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলো। সে স্বগোত্রকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে ঘোষণা করলোঃ "আমিই তোমাদের বড় প্রতিপালক।" একথা বলার চল্লিশ বছর পূর্বে সে বলেছিলঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ

অর্থাৎ "আমি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ আছে তা আমি জানি না।" (২৮ঃ ৩৮) এবার তার হঠকারিতা এবং ঔদ্ধত্য একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল।

সে **খোলাখুলিভাবে** বলে ফেললোঃ "আমিই তোমাদের মহা প্রভু। আমি সবার **উপর বিজয়ী**।"

"অতঃপর আল্লাহ্ তাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তি দেন।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন শাস্তি দেন যে, তা তার মত আল্লাহ দ্রোহীদের জন্যে চিরকাল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এটা তো দুনিয়ার ব্যাপার। এছাড়া আখিরাতের শাস্তি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতা বানিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।" (২৮ ঃ ৪১) আয়াতের সঠিক অর্থ এটাই যে, আখিরাত ও উলা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা ফিরাউনের দুইটি উক্তি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তার এ কথা বলাঃ "আমি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ আছে বলে আমার জানা নেই।" এবং এরপরে বলাঃ "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।" আবার অন্য কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুফরী ও নাফরমানী। কিন্তু প্রথমটিই সঠিকতম উক্তি। আর এতে কোন সন্দেহ নেই। এতে ঐ লোকদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং যাদের অন্যায় হতে বিরত থাকার মানসিকতা রয়েছে।

২৭। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন।	٢٧- ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا ۝
২৮। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যাস্ত করেছেন।	٢٨- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝
২৯। এবং তিনি ওর রজনীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন।	٢٩- وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ۝
৩০। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।	٣٠- وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۝
৩১। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ,	٣١- اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۝

৩২। আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন;

٣٢- وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ○

৩৩। এই সব তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলোর ভোগের জন্যে।

٣٣- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ○ ط

যারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতো না তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা যুক্তি পেশ করছেন যে, আকাশ সৃষ্টি করার চেয়ে মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহর নিকট বহুগুণে সহজ ব্যাপার। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ “আসমান ও জমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন কাজ।” (৪০ ঃ ৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ “যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।” (৩৬ ঃ ৮১)

তিনি অত্যন্ত উঁচু, প্রশস্ত ও সমতল করে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তারপর অন্ধকার রাত্রে চমকিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ঐ আকাশের গায়ে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি অন্ধকার কৃষ্ণকায় রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। দিনকে উজ্জ্বল এবং আলোকমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। জমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। পানি এবং খাদ্যদ্রব্যও তিনি বের করেছেন। সূরা হা-মীম সাজদায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আকাশের পূর্বেই জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে যমীনের বিস্তৃতিকরণ আকাশ সৃষ্টির পরে ঘটেছে। এখানে এটাই বর্ণনা করা হচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক তাফসীরকার এ রকমই বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীরও (রঃ) এই উক্তিটি পছন্দ করেছেন। পাহাড় সমূহকে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন। তিনি বিজ্ঞানময় এবং অভ্রান্ত ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি দয়ালু ও পরম করুণাময়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) **বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ** তা'আলা যমীন সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে শুরু করে। **সুতরাং তিনি** তখন পাহাড় সৃষ্টি করে যমীনের বুকে স্থাপন করে দেন। ফলে **যমীন স্থির** ও নিশ্চল হয়ে যায়। এতে ফেরেশতামণ্ডলী খুবই বিস্মিত হন। তাঁরা **আল্লাহকে** জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের অপেক্ষাও অধিক শক্ত অন্য কিছু আছে কি?" তিনি উত্তরে বলেন! হ্যাঁ আছে। তা হলো লোহা।" ফেরেশতাগণ পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ "লোহা অপেক্ষাও কঠিনতর কিছু আছে কি?" আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ, আছে। তা হলো আগুন।" ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ "আগুন অপেক্ষাও বেশী কঠিন কিছু কি আছে?" আল্লাহ তা'আলা উত্তর দেনঃ "হ্যাঁ আছে। তা হলো পানি।" তাঁরা পুনরায় প্রশ্ন করেন "পানির চেয়েও বেশী কঠিন কিছু আছে কি?" তিনি জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ, আছে। তা হচ্ছে বাতাস।" তাঁরা আবারও প্রশ্ন করেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বায়ু অপেক্ষাও অধিক কঠিন কিছু কি আছে?" তিনি জবাব দেনঃ "হ্যাঁ আছে। সে হলো ঐ আদম সন্তান যে তার ডান হাতে যা খরচ (দান) করে বাম হাত তা জানতে পারে না।"[১]

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আল্লাহ যখন যমীন সৃষ্টি করেন তখন তা কাঁপতে থাকে এবং বলতে থাকেঃ 'আপনি আমার উপর আদম (আঃ)-কে এবং তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করলেন যারা আমার উপর তাদের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করবে এবং আমার উপরে অবস্থান করে পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে?' তখন আল্লাহ তা'আলা পাহাড় স্থাপন করে যমীনকে স্থির ও নিশ্চল করে দেন। তোমরা বহু সংখ্যক পাহাড় পর্বত দেখতে পাচ্ছ। আরো বহু পাহাড় তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে। পর্বতরাজি স্থাপনের পর যমীনের স্থির হয়ে যাওয়া ঠিক তেমনিই ছিল যেমন উট যবেহ করার পর ওর গোশত কাঁপতে থাকে এবং কিছুক্ষণ কম্পনের পর স্থির হয়ে যায়।"[২]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এসব কিছু তোমাদেরও তোমাদের জন্তুগুলোর উপকারের জন্যে ও উপভোগের জন্যে (সৃষ্টি করা হয়েছে)। অর্থাৎ যমীন হতে কূপ ও ঝর্ণা বের করা, গোপনীয় খনি প্রকাশিত করা, ক্ষেতের ফসল

---

[১] এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণনা করা হয়েছে।

[২] এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ)। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হাদীস।

ও গাছ-পালা জন্মানো, পাহাড়-পর্বত স্থাপন করা ইত্যাদি, এগুলোর ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন যাতে তোমরা জমীন হতে পুরোপুরি লাভবান হতে পার। সবকিছুই মানুষের এবং তাদের পশুদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐসব পশুও তাদেরই উপকারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। তারা কোন পশুর গোশত ভক্ষণ করে, কোন পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে এবং এই পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে থাকে।

৩৪। অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে	٣٤- فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ○
৩৫। সেই দিন মানুষ যা করেছে তা স্মরণ করবে,	٣٥- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ○
৩৬। এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্যে।	٣٦- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ○
৩৭। অনন্তর যে সীমালংঘন করে	٣٧- فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ○
৩৮। এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়,	٣٨- وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○
৩৯। জাহান্নামই হবে তার অবস্থিতি স্থান।	٣٩- فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ○
৪০। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে।	٤٠- وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ○
৪১। জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান।	٤١- فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ○
৪২। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে?	٤٢- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ○

٤٣- فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ○

৪৩। এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

٤٤- اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ○

৪৪। **এর চরম জ্ঞান আছে** তোমার প্রতিপালকেরই নিকট,

٤٥- اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ○

৪৫। যে ওর ভয় রাখে তুমি তাকেই সতর্ককারী।

٤٦- كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ○ ع

৪৬। যেই দিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেই দিন তাদের মনে হবে যে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি।

اَلطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য। কেননা, ঐদিন হবে খুবই ভয়াবহ ও গোলযোগপূর্ণ দিন। যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ

وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

অর্থাৎ "কিয়ামত বড়ই কঠিন ও অপছন্দনীয় দিন।" (৫৪ ঃ ৪৬) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى۔

অর্থাৎ "সেই দিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে, কিন্তু তখন উপদেশ গ্রহণে কি কাজ হবে?" (৮৯ ঃ ২৩) অর্থাৎ ঐ সময় উপদেশ গ্রহণে কোনই উপকার হবে না। মানুষের সামনে জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তারা ঐ জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখবে। পার্থিব জীবনে যারা শুধু পার্থিব চিন্তায় ও তৎপরতায় লিপ্ত ছিল, সেই দিন তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাদের খাদ্য হবে যাককূম নামক গাছ এবং পানীয় হবে হামীম বা ফুটন্ত পানি। তবে হ্যাঁ, যারা আল্লাহ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে, তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। সেখানে তারা সর্বপ্রকারের নিয়ামত লাভ করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে একথা তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ আমি সেটা জানি না এবং শুধু আমি কেন, আল্লাহর মাখলূকাতের মধ্যে কেউই তা জানে না।

এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। ওটা আকাশ ও পৃথিবীর উপর বোঝা হয়ে আছে, অকস্মাৎ এসে পড়বে। জনগণ তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যে, যেন তুমি সেটা জান। অথচ মহামহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া সে সম্পর্কে কারো কোন জ্ঞান নেই।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) যখন মানুষের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন তখন তিনি সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন "জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা বেশী জানে না।"

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ হে নবী (সঃ)! যে এর ভয় রাখে তুমি শুধু তাকেই সতর্ককারী। অর্থাৎ তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। যারা ঐ ভয়াবহ দিনকে ভয় করে তারাই শুধু এতে লাভবান হবে। তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে বলে সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা তোমার সতর্কীকরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না, বরং তোমার বিরোধিতা করবে তারা সেই দিন নিকৃষ্ট ধরনের ধ্বংসাত্মক আযাবের কবলে পতিত হবে।

মানুষ যখন নিজেদের কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে তখন পৃথিবীর জীবনকাল তাদের কাছে খুবই কম বলে অনুভূত হবে। তাদের মনে হবে যে, তারা যেন সকাল বেলার কিছু অংশ অথবা বিকেল বেলার কিছু অংশ পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছে।

যুহরের সময় থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে عَشِيَّةً বলা হয় এবং সূর্যোদয় থেকে নিয়ে অর্ধ দিন পর্যন্ত সময়কে ضُحٰى বলা হয়। অর্থাৎ আখিরাতের তুলনায় পৃথিবীর সুদীর্ঘ বয়সকেও অতি অল্পকাল বলে মনে হবে।

সূরা ঃ নাযি'আত এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ আ'বাসা, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৪৬, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٤٦، رُكُوْعُهَا : ١)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো,	١- عَبَسَ وَتَوَلّٰى ○
২। যেহেতু তার নিকট এক অন্ধ আগমন করেছিল।	٢- اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى ○
৩। তুমি কেমন করে জানবে সে হয় তো পরিশুদ্ধ হতো,	٣- وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى ○
৪। অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো।	٤- اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ○
৫। পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না,	٥- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ○
৬। তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো।	٦- فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى ○
৭। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই,	٧- وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ○
৮। অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটে আসলো,	٨- وَاَمَّا مَنْ جَاۤءَكَ يَسْعٰى ○
৯। তার সে সশংকচিত্ত,	٩- وَهُوَ يَخْشٰى ○
১০। তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে!	١٠- فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ○
১১। না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ- বাণী;	١١- كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ○
১২। যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে,	١٢- فَمَنْ شَاۤءَ ذَكَرَهُ ○

১৩। ওটা মহিমান্বিত পত্রসমূহে (লিখিত)-

١٣- فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ○

১৪। (এবং) উন্নত, পূত-পবিত্র

١٤- مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۙ○

১৫। লেখকদের হস্তে (সুরক্ষিত)

١٥- بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ۙ○

১৬। (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ।

١٦- كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ؕ○

বহু তাফসীরকার লিখেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কুরায়েশ নেতাদেরকে ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করছিলেন এবং সেদিকে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আশা করছিলেন যে, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন। ঐ সময়ে হঠাৎ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ) নামক এক অন্ধ সাহাবী তাঁর কাছে এলেন। ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ) বহু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রায়ই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে হাযির থাকতেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। সেদিনও তাঁর আচরিত অভ্যাসমত এসে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানবী (সঃ) তখন একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ জন্যে তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-এর প্রতি তেমন মনোযোগ দিলেন না। তাঁর প্রতি তিনি কিছুটা বিরক্তও হলেন। ফলে তাঁর কপাল কুঞ্চিত হলো। এরপর এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে রাসূল (সঃ)। তোমার উন্নত মর্যাদা ও মহান চরিত্রের জন্যে এটা শোভনীয় নয় যে, একজন অন্ধ আমার ভয়ে তোমার কাছে ছুটে এলো, ধর্ম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভের আশায়, অথচ তুমি তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অহংকারী ও উদ্ধতদের প্রতি মনোযোগী হয়ে গেলে? পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি তোমার কাছে এসেছিল, তোমার মুখ থেকে আল্লাহ্র বাণী শুনে পাপ ও অন্যায় হতে বিরত থাকার সম্ভাবনা ছিল তার অনেক বেশী। সে হয়তো ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতো। অথচ তুমি সেই অহংকারী ধনী লোকদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলে এ কেমনতর কথা? ওদের সৎ পথে নিয়ে আসতেই হবে এমন দায়িত্ব তো তোমার উপর নেই। ওরা যদি তোমার কথা না মানে তবে তাদের দুষ্কৃতির জন্যে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল, আযাদ-গোলাম এবং পুরুষ ও নারী সবাই সমান। তুমি সবাইকে সমান নসীহত করবে। হিদায়াত আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। আল্লাহ্ যদি কাউকে সৎ পথ থেকে দূরে রাখেন তবে তার রহস্য তিনিই জানেন, আর যদি কাউকে সৎপথে নিয়ে আসেন সেটার রহস্যও তিনিই ভাল জানেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ) যখন এসেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে কথা বলছিলেন। এরপর থেকে নবী (সঃ) হযরত ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ)-কে খুবই সম্মান করতেন এবং তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাতেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেনঃ আমি ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ)-কে কাদেসিয়ার যুদ্ধে দেখেছি যে, তিনি বর্ম পরিহিত অবস্থায় কালো পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যখন ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বললেনঃ "আমাকে দ্বীনের কথা শিক্ষা দিন", তখন কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে ধর্মের কথা শোনাচ্ছিলেন আর জিজ্ঞেস করছিলেনঃ "বল দেখি, আমার কথা সত্য কি-না?" তারা উত্তরে বলছিলঃ "জ্বী, আপনি যথার্থই বলছেন।" তাদের মধ্যে উৎবা ইবনে রাবীআহ্, আবূ জাহ্ল ইবনে হিশাম এবং আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিবও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মনে প্রাণে চাচ্ছিলেন যে, এরা যেন মুসলমান হয়ে যায় এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে। এমনি সময়ে ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ) এসে বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাকে কুরআনের কোন একটি আয়াত শুনিয়ে আল্লাহ্র কথা শিক্ষা দিন!" ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ)-এর কথা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে অসময়োচিত মনে হলো, তিনি মুখ ফিরিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তাদের সাথে কথা শেষ করে ঘরে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মাথা ছিল নীচু, চোখের সামনে ছিল অন্ধকার। এই আয়াত ততক্ষণে নাযিল হয়ে গেছে। তারপর থেকে নবী (সঃ) ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ)-কে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাঁর কথা শুনতেন। আসা-যাওয়ার সময়ে জিজ্ঞেস করতেন যে, তাঁর কোন প্রয়োজন আছে কি-না, কোন কথা আছে কি-না এবং কোন কিছু তিনি চান কি-না।[১]

---

[১] এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসের সংজ্ঞায় এই বর্ণনাটি গারীব এবং এর সনদ সম্পর্কেও কথা আছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "বিলাল (রাঃ) রাত থাকতেই আযান দেয়, সুতরাং তখন তোমরা পানাহার করবে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ) আযান না দেয়া পর্যন্ত খেতে থাকবে, তার আযান শোনা মাত্র পানাহার বন্ধ করবে।"[১] ইনি সেই দৃষ্টিহীন লোক যাঁর সম্পর্কে সূরা عَبَسَ وَتَوَلّٰى ـ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ـ অবতীর্ণ হয়েছে। ইনিও মুআয্যিন ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্রটিপূর্ণ, পাশের লোকেরা যখন বলতো যে, সুবহে সাদেক হয়ে গেছে তখন তিনি আযান দিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ মত এই যে, তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ (রাঃ)। কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর নাম আমর (রাঃ)। অবশ্য এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ـ অর্থাৎ 'না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো এই সূরা অথবা ইলমে দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে মানুষের মাঝে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সমতা রক্ষার উপদেশ, যে, তাবলীগে দ্বীনের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সবাই সমান। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, تَذْكِرَةٌ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং সকল কাজ-কর্মে তাঁর ফরমানকেই অগ্রাধিকার দিবে। ক্রিয়া ذَكَرَ সঙ্গীয় যমীর বা সর্বনাম দ্বারা অহীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সূরা, এই নসীহত তথা সমগ্র কুরআন সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য সহীফায় সংরক্ষিত রয়েছে, যা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যা অপবিত্রতা হতে মুক্ত এবং যা কমও করা হয় না বা বেশীও করা হয় না।

سَفَرَةٌ অর্থ ফেরেশ্তাগণ, তাঁদের পবিত্র হাতে কুরআন রয়েছে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ) এবং হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ)-এর উক্তি। অহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ (রঃ) বলেন যে, سَفَرَةٌ দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তাঁরা হচ্ছেন কুরআনের পাঠকগণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা নবতী ভাষার শব্দ, যার অর্থ হলো 'কারিগণ'। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মতে এর দ্বারা ঐ ফেরেশ্তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যাঁরা আল্লাহ্ এবং তাঁর মাখলূকের মাঝে সাফীর বা দূত হিসেবে রয়েছেন। তিনি এটাকেই সঠিক উক্তি বলেছেন।

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

যাঁরা মানুষের মধ্যে সমঝোতা, আপোষ-মীমাংসা এবং কল্যাণের জন্যে চেষ্টা করেন তাঁদেরকে সাফীর বা দূত বলা হয়। যেমন কবি বলেনঃ

وما ادع السفارة بين قومي * و ما امشي بغش ان مشيت

অর্থাৎ "আমি আমার সম্প্রদায়ের মাঝে দৌত্যকার্য পরিত্যাগ করি না এবং আমি চললে অচৈতন্য হয়ে চলি না।"

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, এখানে سَفَرَةٌ দ্বারা ফেরেশ্তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে অহী ইত্যাদি নিয়ে আসেন। তাঁরা মানুষের মাঝে শান্তি রক্ষাকারী দূতদেরই মত। তাঁদের চেহারা সুন্দর, পবিত্র ও উত্তম এবং তাঁদের চরিত্র ও কাজকর্মও পূত-পবিত্র ও উত্তম। এখান হতে এটাও জানা যায় যে, কুরআন পাঠকদের আমল-আখলাক অর্থাৎ কাজকর্ম ও চরিত্র ভাল হতে হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে সে মহান ও পূত-পবিত্র লিপিকর ফেরেশ্তাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাঠ করে তার জন্যে দ্বিগুণ পুণ্য রয়েছে।"[১]

১৭। মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!	١٧- قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ ط ○
১৮। তিনি তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন?	١٨- مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ○
১৯। শুক্র বিন্দু হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,	١٩- مِنْ نُطْفَةٍ ط خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ لا ○
২০। অতঃপর তার জন্যে পথ সহজ করে দেন;	٢٠- ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ لا ○
২১। তৎপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন।	٢١- ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ لا ○
২২। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।	٢٢- ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ط ○

---

[১] এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২৩। না না, তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন, সে তা সমাধা করেনি।	٢٣- كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ○ ط
২৪। মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।	٢٤- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ○ لا
২৫। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি,	٢٥- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ○ لا
২৬। অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;	٢٦- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ○ لا
২৭। এবং ওতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;	٢٧- فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ○ لا
২৮। দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,	٢٨- وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ○ لا
২৯। যায়তূন, খর্জুর,	٢٩- وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا ○ لا
৩০। বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান,	٣٠- وَّحَدَائِقَ غُلْبًا ○ لا
৩১। ফল এবং গবাদির খাদ্য,	٣١- وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا ○ لا
৩২। এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের জন্যে।	٣٢- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ○ ط

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে যারা বিশ্বাস করে না এখানে তাদের নিন্দে করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) قُتِلَ الْإِنْسَانُ -এর অর্থ করেছেনঃ মানুষের উপর লা'নত বর্ষিত হোক। তারা কতই না অকৃতজ্ঞ! আর এও অর্থ করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে প্রায় সব মানুষই অবিশ্বাসকারী। তারা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে একটি বিষয়কে অসম্ভব মনে করে থাকে। নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতা সত্ত্বেও ঝট্ করে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে বসে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে তাকে কোন্ জিনিস উদ্বুদ্ধ করছে? তারপর মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ কেউ কি চিন্তা করে দেখেছে যে, আল্লাহ্ তাকে কি ঘৃণ্য জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? তিনি কি তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না? শুক্র বিন্দু বা বীর্য দ্বারা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের

তকদীর নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ বয়স, জীবিকা, আমল এবং সৎ ও অসৎ হওয়া। তারপর তাদের জন্যে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন। অর্থ এও হতে পারেঃ আমি স্বীয় দ্বীনের পথ সহজ করে দিয়েছি অর্থাৎ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ـ

অর্থাৎ "আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।" (৭৬ ঃ ৩) হযরত হাসান (রঃ) এবং হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) এ অর্থটিকেই সঠিকতর বলেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তৎপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। আরবদের বাক-বিনিময়ের মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে যে, যখন তারা কোন লোককে দাফন বা কবরস্থ করে তখন বলে থাকেঃ قَبَرْتُ الرَّجُلَ অর্থাৎ "আমি লোকটিকে কবরস্থ করলাম।" আর এ কথাও বলেঃ اَقْبَرَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাকে কবরস্থ করলেন।" এ ধরনের আরো কিছু পরিভাষা তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কবরের অধিবাসী করেছেন। আবার যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এটাকেই بَعْثٌ এবং نُشُوْر বলা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ-

অর্থাৎ "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো।" (৩০ঃ ২০) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ـ

অর্থাৎ "আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে আমি সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশ্ত দ্বারা ঢেকে দিই।" (২ ঃ ২৫৯) হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, "মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটিতে খেয়ে ফেলে।" জিজ্ঞেস করা হলো। "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! ওটা কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "ওটা একটা সরিষার বীজের সমপরিমাণ জিনিস, ওটা থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।"[১]

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমেও এটা ভাষার কিছু পার্থক্যসহ বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারী মানুষ বলে যে, তাদের জান-মালের মধ্যে আল্লাহ্র যেসব হক ছিল তা তারা আদায় করেছে। কিন্তু আসলে তারা তা আদায় করেনি। মূলতঃ তারা আল্লাহ্র ফারায়েয আদায় করা হতে বিমুখ রয়েছে। তাই তো আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তিনি তাদেরকে যা আদেশ করেছেন তা তারা এখনো পুরো করেনি।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহ্ তা'আলার ফারায়েয পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব নয়। হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতেও এ ধরনের একটি উক্তি বর্ণিত রয়েছে। মুতাকাদ্দিমীনের মধ্যে আমি এটা ছাড়া অন্য কোন উক্তি পাইনি। আমার মনে হয় আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, পুনরায় তিনি যখনই ইচ্ছা করবেন তখনই পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেই সময় এখনো আসেনি। অর্থাৎ এখনই তিনি তা করবেন না, বরং নির্ধারিত সময় শেষ হলে এবং বানী আদমের ভাগ্যলিখন সমাপ্ত হলেই তিনি তা করবেন। তাদের ভাগ্যে এই পৃথিবীতে আগমন এবং এখানে ভালমন্দ কাজ করা ইত্যাদি আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথমে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন দ্বিতীয়বারও সেভাবেই সৃষ্টি করবেন।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উযায়ের (আঃ) বলেনঃ "আমার নিকট একজন ফেরেশ্তা এসে আমাকে বলেন যে, কবরসমূহ জমীনের পেট এবং যমীন মাখলূকের মাতা। সমস্ত মাখলূক সৃষ্ট হবার পর কবরে পৌঁছে যাবে। কবরসমূহ পূর্ণ হবার পর পৃথিবীর সিলসিলা বা ধারা পূর্ণতা লাভ করবে। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু রয়েছে সবই মৃত্যুবরণ করবে। জমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে জমীন সেগুলো উগলিয়ে ফেলবে। কবরে যতো মৃতদেহ রয়েছে সবকেই বাইরে বের করে দেয়া হবে।" আমরা এই আয়াতের যে তাফসীর করেছি তা এই উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহান ও পবিত্র আল্লাহ্ই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রমাণ এর মধ্যেও নিহিত রয়েছে। হে মানুষ! শুষ্ক অনাবাদী জমি থেকে আমি যেমন সবুজ-সতেজ গাছের জন্ম দিয়েছি, সেই জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করেছি, ঠিক তেমনি পচে গলে বিকৃত হয়ে যাওয়া হাড় থেকে আমি একদিন তোমাদের

পুনরুত্থান ঘটাবো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, আমি আকাশ থেকে ক্রমাগত বারি বর্ষণ করে ঐ পানি জমিতে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। তারপর ঐ পানির স্পর্শ পেয়ে বীজ থেকে শস্য উৎপন্ন হয়েছে। কত রকমারী শস্য, কোথাও আঙ্গুর। কোথাও আবার তরি-তরকারী উৎপন্ন হয়েছে।

حَبّ সর্বপ্রকারের দানা বা বীজকে বলা হয় عِنَب -এর অর্থ হলো আঙ্গুর। قَضْب বলা হয় সেই সবুজ চারাকে যেগুলো পশুরা খায়। আল্লাহ্ তা'আলা যায়তুন পয়দা করেছেন যা তরকারী হিসেবে রুটির সাথে খাওয়া হয়। তাছাড়া ওকে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা যায় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায়। তিনি সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের কাঁচা-পাকা, শুকনো এবং ভিজে খেজুর তোমরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকো। সেই খেজুর দিয়ে তোমরা শিরা এবং সিরকাও তৈরী করে থাকো। তাছাড়া আল্লাহ্ বাগান সৃষ্টি করেছেন।

غُلْبًا খেজুরের বড় বড় ফলবান বৃক্ষকেও বলা হয়। حَدَآئِقَ غُلْبًا এমন বাগানকে বলা হয় যা খুবই ঘন এবং ফলে ফলে সুশোভিত। মোটা গ্রীবাবিশিষ্ট লোককেও আরববাসীরা أَغْلَب বলে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা মেওয়া সৃষ্টি করেছেন। أَبّ বলা হয় ঘাস পাতা ইত্যাদিকে যা পশুরা খায়, কিন্তু মানুষ খায় না। মানুষের জন্যে যেমন ফল, মেওয়া তেমনি পশুর জন্যে ঘাস।

হযরত আতা (রঃ) বলেন যে, জমিতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকে أَبّ বলা হয়। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, মেওয়া ছাড়া বাকী সবকিছুকে أَبّ বলা হয়। আবুস সায়েব (রঃ) বলেন যে, أَبّ মানুষ এবং পশু উভয়ের খাদ্য বা আহার্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "কোন আকাশ আমাকে তার নীচে ছায়া দিবে? কোন্ জমীন আমাকে তার পিঠে তুলবে? যদি আমি আল্লাহ্র কিতাবের যে বিষয় ভাল জানি না তা জানি বলে উক্তি করি?" অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে পাননি। সহীহ্ সনদে তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত উমার ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ রিওয়ায়িত আছে যে, তিনি মিম্বরের উপর সূরা عَبَسَ পাঠ করতে শুরু করেন এবং বলেনঃ فَاكِهَةً -এর অর্থ তো আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু أَبّ -এর অর্থ কি? তারপর তিনি নিজেই বলেনঃ "হে উমার (রাঃ)! এ কষ্ট ছাড়ো!" এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, أَبّ

যমীন থেকে উৎপাদিত জিনিসকে বলা হয়, কিন্তু তার আকার-আকৃতি জানা যায় না। .....فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا দ্বারা এর চেয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না।

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের জন্যে। কিয়ামত পর্যন্ত এই সিলসিলা বা ক্রমধারা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তোমরা তা থেকে লাভবান হতে থাকবে।

৩৩। যখন ঐ ধ্বংস ধ্বনি এসে পড়বে;	٣٣- فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ○
৩৪। সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে	٣٤- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○ لا
৩৫। এবং তার মাতা, তার পিতা,	٣٥- وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○ لا
৩৬। তার পত্নী ও তার সন্তান হতে,	٣٦- وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○ ط
৩৭। সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।	٣٧- لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○ ط
৩৮। সে দিন বহু আনন দীপ্তিমান হবে;	٣٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ○ لا
৩৯। সহাস্য ও প্রফুল্ল	٣٩- ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ○ ج
৪০ এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধুলি-ধূসর	٤٠- وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ○ لا
৪১। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।	٤١- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ○ ط
৪২। তারাই কাফির ও পাপাচারী।	٤٢- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ○ ع ع ٤٢ ٥

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, صاخة কিয়ামতের একটি নাম। এ নামের কারণ এই যে, কিয়ামতের শিংগার আওয়াজ ও শোরগোলে কানের পর্দা ফেটে যাবে। সেদিন মানুষ তার নিকটাত্মীয়দেরকে দেখবে কিন্তু তাদেরকে দেখে পালিয়ে যাবে। কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। স্বামী তার স্ত্রীকে দেখে বলবেঃ আমি পৃথিবীতে তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম? স্ত্রী উত্তরে

বলবেঃ নিঃসন্দেহে আপনি আমার সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিলেন। আমাকে খুবই ভালবাসতেন। এ কথা শুনে স্বামী বলবেঃ আজ আমার একটি মাত্র পুণ্যের প্রয়োজন, তাহলেই আমি আজকের এই মহা বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারি। ঐ একটি পুণ্য তুমি আমাকে দাও। স্ত্রী বলবেঃ আপনি তো সামান্য জিনিসই চেয়েছেন, কিন্তু আমি যে অক্ষম! আজ পুণ্যের আমার নিজেরই একান্ত প্রয়োজন। আশংকা করছি আমিও বিপদে পড়ি না কি? কাজেই পুণ্য দেয়া সম্ভব নয়। পুত্র পিতার সাথে দেখা করে একই রকম আবেদন-নিবেদন জানাবে এবং একই রকম জবাব পাবে।

সহীহ্ হাদীসে শাফাআত প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ বড় বড় পয়গাম্বরদের কাছে জনগণ শাফাআতের জন্যে আবেদন জানাবে, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই বলবেনঃ 'ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী!' এমনকি হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্ (আঃ) পর্যন্ত বলবেনঃ আজ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের প্রাণ ছাড়া অন্য কারো জন্যে আমি কিছুই বলবো না। এমনকি যাঁর গর্ভ থেকে আমি ভূমিষ্ট হয়েছি সেই মা জননী হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর জন্যেও কিছু বলবো না। মোটকথা, বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে, আত্মীয় আত্মীয়ের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত থাকবে। অন্যের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "তোমরা নগ্নপদে, নগ্নদেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে জমায়েত হবে।" এ কথা শুনে তাঁর এক স্ত্রী বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! তাহলে তো অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি চোখ পড়বে!" রাসূলুল্লাহ্ বললেন! ঐ মহা প্রলয়ের দিনে সব মানুষ এতো ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ কারো থাকবে না।"[১]

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, অতঃপর আল্লাহ্র নবী (সঃ) ....لِكُلِّ امْرِئٍ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঐ স্ত্রী ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি নিবেদিত হোক! আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনি তার উত্তর দিন।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "জানা থাকলে অবশ্যই উত্তর দিবো।" হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ "মানুষের হাশর কিভাবে হবে?" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তর দিলেনঃ

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

“নগ্নপায়ে ও নগ্নদেহে।” কিছুক্ষণ পর হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করলেনঃ “মহিলারাও কি ঐ অবস্থায় থাকবে?” রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ।” এ কথা শুনে উম্মুল মুমিনীন দুঃখ করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ্র নবী (সঃ) বললেনঃ “হে আয়েশা (রাঃ)! এই আয়াতটি শোনো, তারপর পোশাক পরিধান করা না করা নিয়ে তোমার কোন আফসোস বা দুঃখ থাকবে না।” হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “কোন্ আয়াত?” জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) لِكُلِّ ..... امْرِئٍ -এ আয়াতটি পাঠ করলেন।

অন্য এক বর্ণনায় উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রাঃ) -এর জিজ্ঞেস করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সব মানুষ নগ্নপায়ে, নগ্নদেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় হাশরের মাঠে সমবেত হবে। কেউ কান পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে, কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌঁছবে তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সেখানে লোকদের দু'টি দল হবে। এক দলের চেহারা আনন্দে চমকাতে থাকবে। তাদের মন নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত থাকবে। তাদের মুখমণ্ডল সুদর্শন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারা হবে জান্নাতি দল। আর একটি দল হবে জাহান্নামীদের। তাদের চেহারা মসিলিপ্ত, কালিমাময় ও মলিন থাকবে।

হাদীস শরীফে আছে যে, তাদের ঘাম হবে তাদের জন্যে লাগামের মত। তারা ধূলি-মলিন অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরা সেই দল যাদের মনে কুফরী ছিল এবং আমল ছিল পাপে পরিপূর্ণ। যেমন অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

অর্থাৎ “তারা জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী কাফির।” (৭১ ঃ ২৭)

সূরা ঃ আবাসা এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ তাক্ভীর, মাক্কী

(আয়াত ঃ ২৯, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٩، رُكُوْعُهَا : ١)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি চায় যে, কিয়ামতকে যেন সে স্বচক্ষে দেখছে সে যেন اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ - اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ - اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (এই সূরাগুলো) পাঠ করে।”[1]

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে,	١- اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۙ○
২। যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে,	٢- وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۙ○
৩। পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে,	٣- وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۙ○
৪। যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে,	٤- وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۙ○
৫। যখন বন্য পশুগুলি একত্রকৃত হবে;	٥- وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۙ○
৬। এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উপপ্লাবিত-উদ্বেলিত করা হবে;	٦- وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۙ○
৭। দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে,	٧- وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۙ○
৮। যখন জীবন্ত-প্রথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে;	٨- وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۙ○
৯। কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?	٩- بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۚ○
১০। যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে,	١٠- وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۙ○

---

[1] ১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

১১। যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে,	١١- وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ○
১২। জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে,	١٢- وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ○
১৩। এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হবে,	١٣- وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ○
১৪। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে।	١٤- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ○

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ অর্থাৎ সূর্য আলোহীন হবে। আওফী (রঃ) বলেনঃ অর্থাৎ আলো চলে যাবে। আরো অন্যান্য গুরুজন বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ সূর্যের আলো যেতে থাকবে এবং উপুড় করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে একত্রিত করে নিষ্প্রভ করে দেয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর উত্তপ্ত বাতাস প্রবাহিত হবে এবং আগুন লেগে যাবে।

হযরত আবূ মরিয়ম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ সম্পর্কে বলেনঃ “সূর্যকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”[১] অন্য একটি হাদীসে সূর্যের সাথে চাঁদেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ঐ হাদীসটি দুর্বল। সহীহ্ বুখারীতে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে জড়িয়ে নেয়া হবে। ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ -এর মধ্যে আনয়ন করেছেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করাই ছিল বেশী যুক্তিযুক্ত। অথবা এখানে ওখানে উভয় স্থানে আনয়ন করলেই তাঁর অভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন এরূপ হবে তখন হযরত হাসান (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ “ওদের অপরাধ কি?” তখন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ আমি হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি এর মধ্যে কথা তুলছো? কিয়ামতের দিন সূর্যের এ অবস্থা হবে, সমস্ত নক্ষত্র বিকৃত হয়ে খসে পড়বে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

অর্থাৎ "যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে। জনগণ বাজারে থাকবে এমতাবস্থায় হঠাৎ সূর্যের আলো হারিয়ে যাবে। তারপর নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়তে থাকবে। এরপর অকস্মাৎ পর্বতরাজি মাটিতে ঢলে পড়বে এবং যমীন ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করবে। মানব, দানব ও বন্য জন্তুসমূহ সবাই পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। যেসব পশু মানুষকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতো তারা মানুষেরই কাছে নিরাপত্তার জন্যে ছুটে আসবে। মানুষ এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে যে, তারা তাদের প্রিয় ও মূল্যবান গর্ভবতী উষ্ট্রীর খবর পর্যন্তও নেবে না। জ্বিনেরা বলবেঃ আমরা যাই, খবর নিয়ে আসি, দেখি কি হচ্ছে? কিন্তু তারা দেখবে যে, সমুদ্রেও আগুন লেগে গেছে। ঐ অবস্থাতেই যমীন ফেটে যাবে এবং আকাশ ফাটতে শুরু করবে। সপ্ত যমীন ও সপ্ত আকাশের একই অবস্থা হবে। একদিক থেকে গরম বাতাস প্রবাহিত হবে, যে বাতাসে সব প্রাণী মারা যাবে।[১]

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবী মরিয়ম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "নক্ষত্ররাজি এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়েছে তাদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা তবে, শুধু হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতা মরিয়ম (আঃ) বাকী থাকবেন। এঁরা যদি তাদের ইবাদতে খুশী হতেন তবে এঁদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতো।"[২]

পাহাড় নিজ জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়ে নাম নিশানাহীন হয়ে পড়বে। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ সমতল প্রান্তরে পরিণত হবে। উট-উষ্ট্রীসমূহের প্রতি কেউ লক্ষ্য রাখবে না। অযত্নে অনাদরে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া হবে। কেউ ওগুলোর দুধও দোহন করবে না এবং ওগুলোকে সওয়ারী হিসেবেও ব্যবহার করবে না।

عِشَار শব্দটি عُشَرَاءُ শব্দের বহুবচন। দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীকে عُشَرَاءُ বলা হয়। উদ্বেগ, ভয়-ভীতি, ত্রাস এবং হতবুদ্ধিতা এতো বেশী হবে যে, ভাল ভাল মাল-ধনের প্রতিও কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না। কিয়ামতের সেই ভয়াবহতা হৃদয়কে প্রকম্পিত করে দিবে। মানুষ এতদূর ভীত-বিহবল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিচলিত

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ)।

হয়ে পড়বে যে, তার কলিজা মুখের মধ্যে এসে পড়বে। কেউ কেউ বলেন যে, কিয়ামতের এই দিনে এ অবস্থায় কারো কিছু বলার বা বলার মত অবস্থা থাকবে না। যদিও তারা সবই প্রত্যক্ষ করবে। এই উক্তিকারী عِشَارُ শব্দের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। একটি অর্থ হলো মেঘ, যা দুনিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে আসমান ও যমীনের মাঝে শূন্যে বিচরণ করবে। কারো কারো মতে এর দ্বারা ঐ জমিনকে বুঝানো হয়েছে যার উশ্‌র দেয়া হয়। আবার অন্য কারো মতে এর দ্বারা ঐ ঘর উদ্দেশ্য যা পূর্বে আবাদ ছিল, কিন্তু এখন বিরাণ হয়ে গেছে। এসব উক্তি উদ্ধৃত করে ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উষ্ট্রীকে বুঝানো হয়েছে এবং তিনি এই অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারও এটাকেই সমর্থন করেছেন। আমি বলি যে, পূর্বযুগীয় উলামায়ে কিরামের নিকট থেকে এ ছাড়া অন্য কোন অভিমত পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্ তা'আলাই এর সবচেয়ে উত্তম তাৎপর্য সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ এবং যখন বন্য পশু একত্রিত করা হবে।' যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল পশু এবং বাতাসে উড্ডয়নশীল সকল পাখীও তোমাদের মতই দলবদ্ধ। আমি আমার কিতাবে সবকিছুর উল্লেখ করেছি, কোন কিছুই ছাড়িনি, অতঃপর তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হবে।" (৬ ঃ ৩৮) সব কিছুর হাশর তাঁরই নিকটে হবে, এমনকি মাছিরও। আল্লাহ্ তা'আলা সবারই সুবিচারপূর্ণ ফায়সালা করবেন। এসব প্রাণীর হাশর হলো তাদের মৃত্যু। তবে দানব ও মানবের সকলকে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাযির করা হবে এবং তাদের হিসাব-নিকাশ হবে। রাবী' ইবনে হায়সাম (রঃ) বলেন যে, বন্য জন্তুর হাশর দ্বারা তাদের উপর আল্লাহ্‌র হুকুম হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা তাদের মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। এসব প্রাণীও অন্যদের সাথে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে। কুরআন কারীমে রয়েছেঃ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً অর্থাৎ "পাখীদেরকে একত্রিত করা হবে।" (৩৮ঃ ১৯) এই আয়াতের প্রকৃত অর্থও হলো এই যে, বন্য জন্তুগুলোকে সমবেত বা একত্রিত করা হবে।

হযরত আলী (রাঃ) এক ইয়াহূদীকে জিজ্ঞেস করেনঃ “জাহান্নাম কোথায়?” ইয়াহূদী উত্তরে বলেঃ “সমুদ্রে।” হযরত আলী (রাঃ) তখন বলেনঃ “আমার মনে হয় একথা সত্য।” কুরআন কারীমে বলা হয়েছেঃ

وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرُ

অর্থাৎ “শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের।” (৫২ঃ ৬) আরও রয়েছেঃ

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

অর্থাৎ “সমুদ্র যখন স্ফীত হবে।” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা উত্তপ্ত বাতাস প্রেরণ করবেন। ঐ বাতাস সমুদ্রের পানি তোলপাড় করে ফেলবে। তারপর তা এক শিখাময় আগুনে পরিণত হবে।

وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرُ -এ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত মুআবিয়া ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, ভূমধ্য সাগর বরকতপূর্ণ। এ সাগর পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সব সাগর তাতে মিলিত হয়। এমনকি সবচেয়ে বড় সাগরও এই সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। এই সাগরের নীচে ঝর্ণা রয়েছে। সেই ঝর্ণার মুখ তামা দিয়ে বন্ধ করা রয়েছে। কিয়ামতের দিন সেই মুখ বিস্ফোরিত হয়ে আগুন জ্বলে উঠবে। এটা খুবই বিস্ময়কর। তবে সুনানে আবূ দাউদে একটি হাদীস রয়েছে যে, হজ্জ ও উমরাহ্ পালনকারীরা, জিহাদকারীরা বা গাযীরা যেন দুধ-সমুদ্রে সফর করে। কেননা, সমুদ্রের নীচে আগুন এবং সেই আগুনের নীচে পানি রয়েছে। সূরা ফাতিরের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

سُجِّرَتْ-এর অর্থ ‘শুকিয়ে দেয়া হবে’ এটাও করা হয়েছে। অর্থাৎ এক বিন্দুও পানি থাকবে না। আবার ‘প্রবাহিত করে দেয়া হবে এবং এদিক-ওদিক প্রবাহিত হয়ে যাবে’ এ অর্থও কেউ কেউ করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ প্রত্যেক প্রকারের লোককে (তাদের সহচর সহ) মিলিত করা হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ

অর্থাৎ “একত্রিত কর জালিমদেরকে ও তাদের সহচরদেরকে।” (৩৭ঃ ২২)

হাদীস শরীফে আছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির হাশ্র করা হবে তার কওমের সাথে যারা তার মতই আমল করে থাকে।[১] আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নের উক্তি দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছেঃ

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۔ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۔ وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۔ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۔

অর্থাৎ "তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে–ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! এবং বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী।" (৫৬ ঃ ৭-১০)

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) খুৎবাহ্ পাঠ করার সময় এ আয়াত পাঠ করেন এবং বলেনঃ "প্রত্যেক জামাআত বা দল তাদের মত জামাআত বা দলের সাথে মিলিত হবে।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, একই রকম আমলকারী দুই ব্যক্তি হয় তো একত্রে জান্নাতে থাকবে অথবা জাহান্নামে পাশাপাশি জ্বলবে।

হযরত উমার (রাঃ)-কে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "পুণ্যবান পুন্যবানের সাথে জান্নাতে মিলিত হবে এবং পাপী পাপীর সাথে জাহান্নামে মিলিত হবে।" অর্থাৎ জান্নাতে এবং জাহান্নামে সম আমলের মানুষ জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ সব মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হবে। ডান দিকের দল, বাম দিকের দল এবং অগ্রবর্তী দল। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, একই ধরনের লোক এক সাথে থাকবে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও এ কথা পছন্দ করেন।

দ্বিতীয় উক্তি হলো এই যে, আরশের কিনারা থেকে পানির একটা সমুদ্র আত্মপ্রকাশ করবে এবং তা চল্লিশ বছর পর্যন্ত প্রশস্ত আকারে প্রবাহিত হবে। সেই সমুদ্র থেকে সকল মৃত পচা গলা ভেসে উঠবে। এটা এভাবে হবে যে, যারা তাদেরকে চিনে তারা তাদেরকে এক নজর দেখলেই চিনতে পারবে। তারপর রূহসমূহ ছেড়ে দেয়া হবে এবং প্রত্যেক রূহ তার দেহ অধিকার করবে। وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ -এ আয়াতের অর্থ এটাই যে, দেহে আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে। আবার এ অর্থও করা হয়েছে যে, মুমিনদের জোড়া হূরদের সাথে লাগিয়ে দেয়া হবে এবং কাফিরদের জোড়া লাগিয়ে দেয়া হবে শয়তানের সাথে।[২]

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

২. এটা ইমাম কুরতুবী (রঃ) তাযকিরাহ্ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ঃ

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ـ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ـ

এটা জমহূরের কিরআত। জাহিলিয়াতের যুগে জনগণ কন্যা সন্তানদেরকে **অপছন্দ** করতো এবং তাদেরকে জীবন্ত দাফন করতো। তাদেরকে কিয়ামতের **দিন প্রশ্ন** করা হবেঃ 'এরা কেন নিহত হয়েছে?' যাতে এদেরকে হত্যাকারীদের **অধিক** ধমক দেয়া হয় ও লজ্জিত করা হয়। আর এটাও জানার বিষয় যে, অত্যাচারিতকে প্রশ্ন করা হলে অত্যাচারী স্বভাবতই অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হবে।

এটাও বলা হয়েছে যে, তারা নিজেরাই জিজ্ঞেস করবেঃ 'তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে বা কি কারণে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়েছে?'

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

উকাশার ভগ্নী জুযামাহ্ বিনতু অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে **জনগণের মধ্যে** বলতে শুনেনঃ "আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে জনগণকে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, রোমক ও **পারসিকরা** গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে থাকে এবং তাতে তাদের সন্তানের কোন **ক্ষতি হয় না**।" তখন জনগণ তাঁকে বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "এটা গোপনীয়ভাবে জীবন্ত দাফন করারই নামান্তর। আর وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ -এর মধ্যে এরই বর্ণনা রয়েছে।"[১]

হযরত **সালমা ইবনে ইয়াযীদ আরজাফী** (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ **"আমি এবং আমার** ভাই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাদের মাতা মুলাইকা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখতেন, অতিথি সেবা করতেন, এ ছাড়া অন্যান্য নেক আমলও করতেন। তিনি অজ্ঞতার যুগে মারা গেছেন। এসব সৎ আমল তাঁর কোন কাজে আসবে কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "না।" আমরা বললামঃ তিনি জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের এক বোনকে জীবন্ত প্রোথিত করেছিলেন। এতে তাঁর কোন কুফল হবে কি? তিনি জবাব দিলেনঃ "যাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে এবং যে দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামে যাবে। তবে হ্যাঁ, পরে ইসলাম গ্রহণ করলে সেটা অন্য কথা।"[২]

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “যে জীবন্ত দাফন করে এবং যাকে জীবন্ত দাফন করা হয় তারা উভয়েই জাহান্নামী।”[১]

খানসা বিনতে মুআবিয়া সারীমিয়্যাহ্ (রাঃ) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! জান্নাতে কারা যাবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ “নবী, শহীদ, শিশু এবং যাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় দাফন করা হয়েছে তারা জান্নাতে যাবে।”[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুশরিকদের শিশুরা জান্নাতে যাবে। যারা বলে যে, তারা (মুশরিকদের শিশুরা) জাহান্নামে যাবে তারা মিথ্যাবাদী। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ - بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ - -এর দ্বারা জীবিত প্রোথিত কন্যা শিশুকে বুঝানো হয়েছে।[৩]

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত কায়েস ইবনে আসিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! জাহিলিয়াতের যুগে আমি আমার কন্যাদেরকে জীবিত প্রোথিত করেছি (এখন কি করবো?)।” উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ “তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও।” তখন হযরত কায়েস (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমি তো উটের মালিক (গোলামের মালিক তো আমি নই?)।” তিনি বললেনঃ “তাহলে তুমি প্রত্যেকের বিনিময়ে একটি করে উট আল্লাহ্র নামে কুরবানী করে দাও।”[৪]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত কায়েস (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমি বারো বা তেরোটি কন্যাকে জীবন্ত দাফন করেছি।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তাদের সংখ্যা অনুযায়ী গোলাম আযাদ করে দাও।’ তিনি বললেনঃ “ঠিক আছে, আমি তাই করবো।” পরবর্তী বছর তিনি একশ'টি উট নিয়ে এসে বললেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমি মুসলমানদের সাথে যা করেছি তার জন্যে আমার কওমের পক্ষ থেকে এই সাদ্কা নিয়ে এসেছি।”

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[৩] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[৪] এ হাদীসটি মুসনাদে আবদির রায্যাকে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “আমি ঐ উটগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতাম। ঐগুলোর নাম কায়্যসিয়্যাহ্ রেখেছিলাম।”

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ‘যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে।’ অর্থাৎ আমলনামা বন্টন করা হবে। কারো ডান হাতে দেয়া হবে এবং কারো বাম হাতে দেয়া হবে। কাতাদাহ্ (রঃ) বলেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি যা লিখাচ্ছো সেটা কিয়ামতের দিন একত্রিতাবস্থায় তোমাকে প্রদান করা হবে। সুতরাং মানুষ কি লিখাচ্ছে এটা তার চিন্তা করে দেখা উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আসমানকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নেয়া হবে, তারপর গুটিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হবে। জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে। আল্লাহ্র গযবে ও বানী আদমের পাপে জাহান্নামের আগুন তেজদীপ্ত হয়ে যাবে। এসব কিছু হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে কি আমল করেছে তা জেনে নিবে। **সব আমল তার সামনে বিদ্যমান থাকবে।** যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚۛ تَوَدُّ لَوْ
اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗۤ اَمَدًاۢ بَعِيْدًا ـ

অর্থাৎ “সেদিন প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে, সে দিন সে তার ও ওর (মন্দ কর্মফলের) মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করবে।” (৩ ঃ ৩০) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ

অর্থাৎ “সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে।” (৭৫ ঃ ১৩)

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, যখন اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ সূরাটি নাযিল হয় এবং عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاۤ اَحْضَرَتْ পর্যন্ত পৌঁছে তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “পূর্ববর্তী সকল কথা এ জন্যেই বর্ণনা করা হয়েছে।”[১]

১৫। কিন্তু না, আমি প্রত্যাবর্তনকারী তারকাপুঞ্জের শপথ করছি;	١٥- فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۙ○
১৬। যা গতিশীল ও স্থিতিবান;	١٦- الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۙ○

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১৭। শপথ নিশার যখন ওর অবসান হয়	١٧– وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۙ○
১৮। আর ঊষার যখন ওর আবির্ভাব হয়,	١٨– وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۙ○
১৯। নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী,	١٩– اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ○
২০। যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন,	٢٠– ذِىْ قُـوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَـرْشِ مَكِيْنٍ ۙ○
২১। যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন।	٢١– مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ؕ○
২২। এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়,	٢٢– وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۚ○
২৩। সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে।	٢٣– وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۚ○
২৪। সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়।	٢٤– وَمَـا هُوَ عَلَى الْغَـيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ○
২৫। এবং এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।	٢٥– وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ○
২৬। সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো?	٢٦– فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ؕ○
২৭। এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ,	٢٧– اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ○
২৮। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্যে।	٢٨– لِـمَنْ شَـآءَ مِنْـكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ؕ○
২৯। তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।	٢٩– وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ع○ ع ٢٩ ٦

হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি নবী (সঃ)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়েছি এবং তাঁকে ঐ নামাযে فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ـ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ـ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ। এই আয়াতগুলো পড়তে শুনেছি।”[১]

এখানে নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে যেগুলো দিনের বেলায় পিছনে সরে যায় অর্থাৎ লুকিয়ে যায় এবং রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশ করে। হযরত আলী (রাঃ) এ কথাই বলেন। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ হতেও এ আয়াতের তাফসীরে এটাই বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন ইমাম বলেন যে, উদয়ের সময় নক্ষত্রগুলোকে خُنَّس বলা হয়। আর স্ব স্ব স্থানে ওগুলোকে جَوَّار বলা হয় এবং লুকিয়ে যাওয়ার সময় كُنَّس বলা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা বন্য গাভীকে বুঝানো হয়েছে। এও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা হরিণ উদ্দেশ্য।

ইবরাহীম (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রঃ)-কে এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “এ সম্পর্কে আমি কিছু শুনেছি। তবে লোকে বলে যে, এর দ্বারা নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে।” ইবরাহীম (রঃ) পুনরায় তাঁকে বলেনঃ “আপনি যা শুনেছেন তাই বলুন।” তখন হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ “আমি শুনেছি যে, এর অর্থ হলো নীল গাভী, যখন সে নিজের জায়গায় লুকিয়ে যায়।” অতঃপর ইবরাহীম (রঃ) বলেনঃ “তারা আমার উপর এ ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করেছে, যেমন তারা হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছে যে, তিনি আসফালকে আ'লার এবং আ'লাকে আসফালের যামিন বানিয়েছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এর মধ্যে কোন কিছু নির্দিষ্ট না করে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এখানে তিনটি জিনিসকেই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ নক্ষত্র, নীল গাভী এবং হরিণ।

وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ـ এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, এর অর্থ হলোঃ শপথ রাত্রির, যখন ওটা স্বীয় অন্ধকারসহ এগিয়ে আসে। আর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর অর্থ হলোঃ শপথ রাত্রির যখন ওটা পিছনে সরে যায় অর্থাৎ যখন ওর অবসান হয়।

হযরত আবূ আবদির রহমান সালমী (রাঃ) বলেন যে, একদা হযরত আলী (রাঃ) ফজরের নামাযের সময় বের হন এবং বলতে থাকেনঃ “বেত্‌র (এর

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নামায) সম্পর্কে প্রশ্নকারীরা কোথায়?” অতঃপর তিনি وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ـ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ـ -এ আয়াত দু'টি পাঠ করেন। অর্থাৎ “রাত্রির শপথ, যখন ওর অবসান হয় এবং ঊষার শপথ, যখন ওর আবির্ভাব হয়।”[১] ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন যে, وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ -এর অর্থ হলোঃ শপথ রাত্রির, যখন ওটা চলে যেতে থাকে। কেননা, এর বিপরীতে রয়েছেঃ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ অর্থাৎ ঊষার শপথ যখন ওর আবির্ভাব হয়। عَسْعَسَ -এর অর্থ اِدْبَارٌ বা পিছনে সরে যাওয়া অর্থাৎ বিদায় নেয়া, তার স্বপক্ষে কবির উক্তিকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কোন এক কবি বলেছেনঃ

حَتّٰى اِذَا الصُّبْحُ لَهٗ تَنَفَّسَا * وَ انْجَابَ عَنْهَا لَيْلُهَا وَعَسْعَسَا

অর্থাৎ “শেষ পর্যন্ত ঊষা আবির্ভূত হলো এবং তা হতে রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত হলো ও ওর অবসান হয়ে গেল।” এখানে عَسْعَسَ শব্দকে اِدْبَارٌ বা পিছনে সরে যাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আমার মতে اِذَا عَسْعَسَ -এর অর্থ হবেঃ যখন ওর আবির্ভাব হয়। যদিও ادبار অর্থেও এটাকে ব্যবহার করা শুদ্ধ। কিন্তু এখানে এ শব্দকে اِقْبَالٌ -এর অর্থে ব্যবহার করাই হবে বেশী যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা যেন রাত্রি এবং ওর অন্ধকারের শপথ করেছেন যখন ওটা এগিয়ে আসে বা যখন ওটা আবির্ভূত হয়। আর তিনি শপথ করেছেন ঊষার এবং ওর আলোকের যখন ওটা আবির্ভূত হয় বা যখন ওর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। যেমন তিনি বলেনঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ـ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى

অর্থাৎ “শপথ রজনীর, যখন ওটা আচ্ছন্ন করে এবং শপথ দিবসের, যখন ওটা আবির্ভূত হয়।' আরও বলেনঃ

وَالضُّحٰى ـ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ـ

অর্থাৎ “শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন ওটা হয় নিঝুম।” আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا ـ

অর্থাৎ “তিনি সকাল বিদীর্ণকারী ও তিনি রাত্রিকে করেছেন বিশ্রামের সময়।” (৬ ঃ ৯৬) এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। সবগুলোরই ভাবার্থ একই।

---

[১] এটা আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হ্যাঁ, তবে এ শব্দের একটা অর্থ পশ্চাদপসরণও রয়েছে। উসূলের পণ্ডিতগণ বলেন যে, এ শব্দটি সামনে অগ্রসর হওয়া এবং পিছনে সরে আসা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এরই প্রেক্ষিতে উভয় অর্থই যথার্থ হতে পারে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সকালের শপথ যখন ওর আবির্ভাব হয়। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ যখন সকাল প্রকাশিত হয়। কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ যখন সকাল আলোকিত হয় এবং এগিয়ে আসে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ দিনের আলো, যখন তা এগিয়ে আসে এবং প্রকাশিত হয়।

এই শপথের পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এই কুরআন এক বুযুর্গ, অভিজাত, পবিত্র ও সুদর্শন ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত। এই ফেরেশতা সামর্থ্যশালী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۔ ذُوْ مِرَّةٍ ۔

অর্থাৎ "তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ফেরেশতা (জিবরাঈল আঃ)।" (৫৩ ঃ ৫-৬)

ঐ ফেরেশতা আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। তিনি নূরের সত্তরটি পর্দার অভ্যন্তরে যেতে পারেন, তাঁর জন্যে এর সাধারণ অনুমতি রয়েছে। সেখানে তাঁর কথা শোনা যায়। বহু সংখ্যক ফেরেশ্তা তাঁর অনুগত রয়েছেন। আকাশে তাঁর নেতৃত্ব রয়েছে। তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর কথা মান্য করার জন্য বহু সংখ্যক ফেরেশ্তা রয়েছেন। আল্লাহ্র পয়গাম তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বড়ই বিশ্বাস ভাজন। মানুষের মধ্যে যিনি রাসূল হিসেবে মনোনীত হয়েছেন তিনিও পাক-সাফ ও পবিত্র। এ কারণেই এরপর বলা হয়েছেঃ তোমাদের সাথী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) উন্মাদ বা পাগল নন। তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেনি। তিনি জিবরাঈল আমীন (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে ছয় শত পাখা সমেত আত্মপ্রকাশের সময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। এটা বাতহার (মক্কার এক উপত্যকার) ঘটনা। ওটাই ছিল হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রথম দর্শন। আকাশের উন্মুক্ত প্রান্তে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর এই দর্শন আল্লাহর নবী (সঃ) লাভ করেছিলেন। নিম্নের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তারই বর্ণনা দিয়েছেনঃ

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ـ ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ـ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ـ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ـ
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ـ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ـ

অর্থাৎ “তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওয়াহী করবার তা অহী করলেন।” (৫৩ ঃ ৫-১০) এ আয়াতগুলোর তাফসীর সূরা নাজমের মধ্যে গত হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই সূরা মি'রাজের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এখানে শুধু প্রথমবারের দেখার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বারের দেখার কথা নিম্নের আয়াতগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ـ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ـ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ـ اِذْ
يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ـ

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত।” (৫৩ ঃ ১৩-১৬) এখানে দ্বিতীয়বার দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সূরা মি'রাজের পরে অবতীর্ণ হয়েছে بِضَنِيْنٍ অন্য কিরআতে بِظَنِيْنٍ রয়েছে, অর্থাৎ তাঁর প্রতি কোন অপবাদ নেই। আর ضَادْ দিয়ে পড়লে অর্থ হবেঃ তিনি কৃপণ বা বখীল নন, বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন গায়েবের কথা তাঁকে অবহিত করা হলে তিনি তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেন। এই দুটি কিরাআতই বিশুদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং জিবরাঈল (আঃ) বার্তাবহ হিসেবে বার্তা পৌঁছাতে কোন প্রকার ঘাটতি রাখেননি বা কোন প্রকারের অপবাদও আরোপ করেননি।

এই কুরআন অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয়। শয়তান এটা ধারণ করতে পারে না। এটা তার দাবী বা চাহিদার বস্তুও নয় এবং সে এর যোগ্যও নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ـ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ـ اِنَّهُمْ عَنِ
السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ “এই কুরআন নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয় নাই, এটা তাদের জন্যে সমীচিনও নয় এবং এটা বহন করার তাদের শক্তিও নেই। তাদেরকে তো এটা শ্রবণ করা হতেও দূরে রাখা রয়েছে।” (২৬ ঃ ২১০-২১২) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো? অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা, বাস্তবতা ও অলৌকিকতা প্রকাশিত হওয়ার পরও তোমরা এটাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করছো কেন? তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কোথায় গেল?

হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কাছে বানু হানীফা গোত্রের লোকেরা মুসলমান হয়ে হাযির হলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ “ যে মুসাইলামা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছে এবং যাকে তোমরা আজ পর্যন্ত মানতে রয়েছো, তার মনগড়া কথাগুলো শুনাও তো?” তারা তা শুনালে দেখা গেল যে, তা অত্যন্ত বাজে শব্দে ফালতু বকবকানি ছাড়া কিছুই নয়। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন তাদেরকে বললেনঃ “তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে? বাজে বকবকানিকে তোমরা আল্লাহ্র বাণী বলে মান্য করছো? এ ধরনের অর্থহীন ও লালিত্যহীন কথনও কি আল্লাহ্র বাণী হতে পারে? এটা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

এ অর্থও করা হয়েছেঃ তোমরা আল্লাহ্র কিতাব থেকে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে কোথায় পলায়ন করছো?

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এটা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্যে উপদেশ এবং নসীহত স্বরূপ। হিদায়াত প্রত্যাশী প্রত্যেক মানুষের উচিত এই কুরআনের উপর আমল করা। এই কুরআন সঠিক পথ-প্রদর্শক এবং মুক্তির সনদ। এই বাণী ছাড়া অন্য কোন বাণীতে মুক্তি বা পথনির্দেশ নেই। তোমরা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পার না এবং যাকে ইচ্ছা গুমরাহ্ বা পথভ্রষ্টও করতে পার না। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি সারা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছাই সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ -এই আয়াত শুনে আবূ জাহল বলেঃ “তাহলে তো হিদায়াত ও গুমরাহী আমাদের আয়ত্ত্বাধীন ব্যাপার?” তার এ কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ -

অর্থাৎ “তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।”

সূরাঃ আত্তাক্ভীর -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ ইন্‌ফিতার, মাক্কী
سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১৯, রুকূঃ ঃ ১)
(اٰيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعُهَا : ١)

হযরত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআ'য (রাঃ) ইশার নামাযে ইমামতি করেন এবং তাতে তিনি লম্বা কিরআত করেন। (তখন তাঁর বিরুদ্ধে এটার অভিযোগ করা হলে) নবী (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে মুআ'য (রাঃ)! তুমি তো বড়ই ক্ষতিকর কাজ করেছো? سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى - وَالضُّحٰى এবং اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ -এই সূরাগুলো কি নেই? এই হাদীসের মূল সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। হ্যাঁ, তবে اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ এর বর্ণনা শুধু সুনানে নাসাঈতে রয়েছে। আর ঐ হাদীসটি ইতিপূর্বে গত হয়েছে যাতে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি কামনা করে যে, কিয়ামতকে সে যেন স্বচক্ষে দেখছে, সে যেন اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ এবং اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ -এই সূরাগুলো পাঠ করে।"

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে,	١- اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ○
২। যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,	٢- وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ○
৩। যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হবে,	٣- وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ○
৪। এবং যখন সমাধিসমূহ সমুত্থিত হবে;	٤- وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ○
৫। তখন প্রত্যেকে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে পরিত্যাগ করেছে তা পরিজ্ঞাত হবে।	٥- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ ؕ○
৬। হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক হতে প্রতারিত করলো?	٦- يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ○

৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর সুবিন্যস্ত করেছেন,	٧- الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۙ○
৮। যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন।	٨- فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۗ○
৯। না, কখনই না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাকো;	٩- كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ○
১০। অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ;	١٠- وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ○
১১। সম্মানিত লেখক-বর্গ;	١١- كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ○
১২। তারা অবগত হয় যা তোমরা কর।	١٢- يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ اَلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ অর্থাৎ “ওর সাথে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।” (৭৩ ঃ ১৮)

‘আর নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।’ লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির সমুদ্র পরস্পর একাকার হয়ে যাবে। পানি শুকিয়ে যাবে, কবরসমূহ ফেটে যাবে। কবর ফেটে যাওয়ার পর মৃতেরা জীবিত হয়ে উঠবে। তারপর সব মানুষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব আমল সম্পর্কে অবহিত হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ধমক দিয়ে বলেনঃ হে মানুষ! কিসে তোমাদেরকে প্রতিপালক হতে প্রতারিত করলো?’ আল্লাহ্ তা'আলা যে, এ কথার জবাব চান বা শিক্ষা দিচ্ছেন তা নয়। কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে, বরং আল্লাহ্ তা'আলা জবাব দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ তাদেরকে গাফিল করে ফেলেছে। এ অর্থ বর্ণনা করা ভুল। সঠিক অর্থ হলোঃ হে আদম সন্তান! নিজেদের সম্মানিত প্রতিপালকের প্রতি তোমরা এতোটা উদাসীন হয়ে পড়লে কেন? কোন্ জিনিস তোমাদেরকে তাঁর অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করেছে? কেনই বা তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লেগে

পড়েছো? এটা তো মোটেই সমীচীন হয়নি। যেমন হাদীস শরীফে এসেছেঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ হে আদম-সন্তান! কোন জিনিস তোমাকে আমার সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে? হে আদম সন্তান! তুমি আমার রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছো?”

হযরত সুফিয়ান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) একটি লোককে يَآ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ -এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনে বলেনঃ “অজ্ঞতা।”[১] অর্থাৎ মানুষের অজ্ঞতাই তাকে তার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন হতেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, মানুষকে বিভ্রান্তকারী হলো শয়তান। হযরত ফুযায়েল ইবনে আইয়ায (রঃ) বলেন, যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “কিসে বিভ্রান্ত করেছে?” তবে অবশ্যই আমি বলবোঃ তোমার লটকানো পর্দাই তোমাকে বিভ্রান্ত করেছে। আবূ বকর আল আররাক (রঃ) বলেনঃ “কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে?” যদি এ প্রশ্ন আমাকে করা হয় তবে অবশ্যই আমি বলবোঃ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহই আমাকে বিভ্রান্ত করেছে।

মা'রেফাত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কারো কারো মতে এখানে كَرِيْم শব্দটিই যেন জবাবের ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু এ উক্তিটি তেমন যুক্তিযুক্ত নয়। বরং এর প্রকৃত তাৎপর্য হলো এই যে, অনুগ্রহশীল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মুকাবিলায় মন্দ কাজ তথা দুষ্কৃতি না করাই সমীচীন। কালবী (রঃ) এবং মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আসওয়াদ ইবনে শুরায়েকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এই দুর্বৃত্ত নবী পাক (সঃ)-কে মেরেছিল। তৎক্ষণাৎ তার উপর আল্লাহর আযাব না আসায় সে আনন্দে আটখানা হয়েছিল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর সুবিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং মধ্যম ধরনের আকার-আকৃতি প্রদান করেছেন ও সুন্দর চেহারা দিয়ে সুদর্শন করেছেন?

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত বিশর ইবনে জাহ্‌হাশ্‌ আল ফারাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং ওর উপর তাঁর একটি আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এই রকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর ঠিকঠাক করেছি, এরপর সঠিক আকার-আকৃতি দিয়েছি। অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে চলাফেরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে মাটির গর্ভে। অথচ তুমি তো বড়ই বড়াই করছো, আমার পথে দান করা হতে বিরত থেকেছো। তারপর যখন কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস এসে পৌঁছেছে তখন বলেছোঃ এখন আমি সাদকা বা দান-খায়রাত করছি। কিন্তু এখন আর দান-খায়রাত করার সময় কোথায়?[১]

এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। অর্থাৎ পিতা, মাতা, মামা, চাচার চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে গঠন করেছেন। আলী ইবনে রাবাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর দাদাকে নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমার ঘরে কি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ছেলে হবে অথবা মেয়ে হবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "কার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হবে।" তিনি জবাবে বললেনঃ ! হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আমার সাথে অথবা তার মায়ের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হবে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বললেনঃ "থামো, এরূপ কথা বলো না। বীর্য যখন জরায়ুতে অবস্থান করে তখন হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত নাসাব বা বংশ ওর সামনে থাকে। তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ -এই আয়াতটি পড়নি? অর্থাৎ "যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।"[২]

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেনঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের সন্তান প্রসব করেছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "তোমার উট

---

[১] এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

[২] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ), ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) এবং ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা যদি সহীহ্ হতো তবে এটা আয়াতের অর্থ প্রকাশের জন্যে যথেষ্ট হতো কিন্তু এ হাদীসের সনদ সঠিক প্রমাণিত নয়। কেননা, মুতহির ইবনে হায়সাম (রঃ) বলেন যে, এতে আবূ সাঈদ ইবনে ইউনুস নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাঁর হাদীস পরিত্যক্ত। তাছাড়া তাঁর ব্যাপারে আরো অভিযোগ রয়েছে।

আছে কি?" লোকটি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ, আছে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "উটগুলো কি রঙ এর?" লোকটি জবাব দিলেনঃ "লাল রঙ-এর।" তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ "উটগুলোর মধ্যে সাদা-কালো রঙ বিশিষ্ট কোন উট আছে কি?" লোকটি উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ, আছে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "লাল রঙ বিশিষ্ট নর-মাদী উটের মধ্যে এই রঙ-এর উট কিভাবে জন্ম নিলো?" লোকটি বললেনঃ "সম্ভবতঃ ঊর্ধ্বতন বংশধারায় কোন শিরা সে টেনে নিয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) লোকটিকে বললেনঃ "তোমার সন্তানের কালো রঙ হওয়ার পিছনেও এ ধরনের কোন কারণ থেকে থাকবে।" হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে বানরের বা শূকরের আকৃতিতেও সৃষ্টি করতে পারেন। আবূ সালেহ্ (রঃ) বলেন যে, তিনি (আল্লাহ্) ইচ্ছা করলে কুকুরের আকৃতিতেও সৃষ্টি করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে গাধা বা শূকরের আকৃতি দিয়ে গঠন করতে পারেন।

কাতাদাহ্ (রঃ) বলেনঃ এ সবই সত্য যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সব কিছুরই উপর সক্ষম। কিন্তু আমাদের সেই মালিক আমাদেরকে উন্নত, উৎকৃষ্ট, হৃদয়গ্রাহী এবং সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মহান ও অনুগ্রহশীল আল্লাহ্র অবাধ্যতায় তোমাদেরকে কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসই শুধু উদ্বুদ্ধ করেছে। কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা তোমাদের মন কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। এ কারণেই তোমরা এ রকম বেপরোয়া মনোভাব ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছো। তোমাদের এই বিশ্বাস রাখা অবশ্যই উচিত যে, তোমাদের উপর সম্মানিত, সংরক্ষণকারী লিপিকর ফেরেশ্তাবৃন্দ নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে তোমাদের সচেতন হওয়া দরকার। তাঁরা তোমাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করছেন ও সংরক্ষণ করছেন। পাপ, অন্যায় বা মন্দ কাজ করার ব্যাপারে তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা সম্মানিত লিপিকর ফেরেশতাদের সম্মান করো। তাঁরা নাপাক অবস্থা এবং পায়খানায় যাওয়ার অবস্থা ছাড়া কখনোই তোমাদের থেকে পৃথক হন না। গোসলের সময়েও তোমরা পর্দা করবে। দেয়াল যদি না থাকে তবে উট দ্বারা হলেও পর্দার ব্যবস্থা করবে। যদি সেটাও সম্ভব না হয় তবে নিজের কোন সাথীকে দাঁড় করিয়ে রাখবে, তাহলে ওটাই পর্দার কাজ করবে।"[১]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবূ বকর আল্ বায্যার (রঃ) এ হাদীসটি হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এতে শব্দের কিছু হেরফের রয়েছে। এতে একথাও রয়েছেঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে উলঙ্গ হতে নিষেধ করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র এই ফেরেশ্তাদের সম্মান করো। এতে এও আছে যে, গোসলের সময়েও এই ফেরেশ্তারা দূরে চলে যান।

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, কিরামান কাতিবীন আল্লাহর সামনে বান্দার দৈনন্দিনের আমল উপস্থাপন করেন। যদি দেখা যায় যে, শুরুতে ও শেষে ইস্তিগফার রয়েছে, তবে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ আমি আমার এ বান্দার (শুরু ও শেষের) মধ্যবর্তী সমস্ত গুণাহ্ মা‘ফ করে দিলাম।

আরো একটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলার কোন কোন ফেরেশ্তা মানুষ এবং তাদের আমলসমূহ জানেন ও চিনেন। কোন বান্দাকে পুণ্য কাজে লিপ্ত দেখলে তাঁরা পরস্পর বলাবলি করেন যে, আজ রাত্রে অমুক ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেছে। পক্ষান্তরে কাউকে পাপ কর্মে লিপ্ত দেখলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে সেটাও আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আজ রাত্রে অমুক ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

১৩। পুণ্যবানগণতো থাকবে পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে;	١٣- إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝
১৪। এবং দুষ্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে;	١٤- وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝
১৫। তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে;	١٥- يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝
১৬। তারা ওটা হতে অন্তর্হিত হতে পারবে না।	١٦- وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝
১৭। কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি জান?	١٧- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝
১৮। আবার বলিঃ কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি অবগত আছ?	١٨- ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

১৯। সেই দিন একের অপরের জন্যে কিছু করবার সামর্থ্য থাকবে না; এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।

١٩- يَوْمَ لَا تَـمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ
شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ○ ع
(١ ع ١٩ ٨)

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর অনুগত, বাধ্যগত এবং যারা পাপকর্ম হতে দূরে থাকে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তাদেরকে 'আবরার' বলা হয়েছে এই কারণে যে, তারা পিতামাতার অনুগত ছিল এবং সন্তানদের সাথে ভাল ব্যবহার করতো।"[১]

পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে। হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান লাভ করার দিনে তথা কিয়ামতের দিনে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এক ঘন্টা বা মুহূর্তের জন্যেও তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয়া হবে না। তারা মৃত্যু বরণও করবে না এবং শান্তিও পাবে না। ক্ষণিকের জন্যেও তারা শাস্তি হতে দূরে থাকবে না।

এরপর কিয়ামতের বিভীষিকা প্রকাশের জন্যে দুই দুইবার আল্লাহ পাক বলেনঃ ঐদিন কেমন তা তোমাদেরকে কোন জিনিস জানিয়েছে? তারপর তিনি নিজেই বলেনঃ কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না এবং শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয়ার ক্ষমতা রাখবে না। তবে হ্যাঁ, কারো জন্যে সুপারিশের অনুমতি যদি স্বয়ং আল্লাহ কাউকেও প্রদান করেন তবে সেটা আলাদা কথা।

এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। তাহলো এই যে, নবী (সঃ) বলেনঃ "হে বানু হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর। (জেনে রেখো যে,) আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করার কোনই অধিকার রাখবো না।।"

সূরা শুআ'রার তাফসীরের শেষাংশে এ হাদীসটি গত হয়েছে। এখানে এ কথাও বলেছেন যে, সেই দিন কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

لِمَنِ الْـمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

---

[১] এ হাদীসটি ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ “আজ কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।” (৪০ ঃ ১৬) **আরো বলেনঃ** مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ “যিনি কর্মফল দিবসের মালিক।” আর এক **জায়গায়** বলেনঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ

অর্থাৎ “সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের (অর্থাৎ আল্লাহর।)” (২৫ ঃ ২৬)

এসব আয়াতের আসল বক্তব্য হলো এই যে, সেই দিন মালিকানা ও সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র কাহ্‌হার ও রহমানুর রাহীম আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। অবশ্য এখনো তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী বটে, কিন্তু সেই দিন বাহ্যিকভাবেও অন্য কেউই কোন হুকুমত ও কর্তৃত্বের অধিকারী থাকবে না। বরং সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।

সূরা ঃ ইন্‌ফিতার এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ মুতাফ্ফিফীন, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৩৬, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٣٦، رُكُوْعُهَا : ١)

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। মন্দ পরিণাম তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়	١- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ○
২। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে,	٢- الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ○
৩। এবং যখন তাদের জন্যে মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।	٣- وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ○
৪। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।	٤- اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ○
৫। সেই মহান দিবসে:	٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ○
৬। যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।	٦- يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম (সঃ) যে সময় মদীনায় আগমন করেন সে সময় মদীনাবাসীরা মাপ জোকের ব্যাপারে খুবই নিকৃষ্ট ধরনের আচরণ করতো। এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে তারা মাপ জোক ঠিক করে নেয়।

হযরত হিলাল ইবনে তালাক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-কে বললামঃ মক্কা ও মদীনার অধিবাসীরা খুবই ভাল মাপ জোক করে থাকে। আমার এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ তা করবে না কেন? তুমি কি শুননি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ অর্থাৎ মন্দ পরিণাম তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়।"[১]

---

[১] এটা ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

تَطْفِيْف -এর অর্থ হলো মাপে কম দেয়া। অর্থাৎ অন্যদের নিকট হতে নেয়ার সময় বেশী নেয়া, আর অন্যদেরকে দেয়ার সময় কম দেয়া। এ জন্যেই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তারা নিজেদের প্রাপ্য নেয়ার সময় পুরোপুরি নেয়, এমনকি বেশীও নেয়। অথচ অন্যদের প্রাপ্য দেয়ার সময় কম করে দেয়।

সঠিক কথা এটাই যে, كَالُوْا এবং وَزَنُوْا -এই ক্রিয়াদ্বয়কে مُتَعَدِّى মেনে নেয়া হবে, আর هُمْ সর্বনামকে مَحَلًّا مَنْصُوْب ধরা হবে, যদিও কেউ কেউ এটাকে ضَمِيْر مُؤَكَّد -এর تَاكِيْد মেনেছেন, যা كَالُوْا ـ وَزَنُوْا -এর মধ্যে লুক্কায়িত সর্বনামের জন্যে। আর مَفْعُوْل কে উহ্য মেনেছেন, যার উপর كَلَام -এর دِلَالَت বিদ্যমান রয়েছে। দুই ভাবেই ভাবার্থ প্রায় একই হবে।

মাপ ও ওজনকে ঠিক করার হুকুম কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতগুলোতেও রয়েছেঃ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ـ

অর্থাৎ "মেপে দিবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।" (১৭ ঃ ৩৫) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ

অর্থাৎ "ন্যায্য মানের সাথে মাপ ও ওজনকে পূর্ণ করো, কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া হয় না।" (৬ ঃ ১৫২)

আরো বলেনঃ

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ـ

অর্থাৎ "ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিয়ো না।" (৫৫ঃ৯)

হযরত শুআইব (আঃ)-এর কওমকে আল্লাহ্ তা'আলা এই মাপের কারণেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, জনগণের প্রাপ্য যারা নষ্ট করছে তারা কি কিয়ামতের দিনকে ভয় করে না, যেদিন

সেই মহান সত্তার সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে? যেই সত্তার কাছে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কিছুই গোপন নেই? সেই দিন খুবই বিভীষিকাময়, আশংকাপূর্ণ, ভয়াবহ এবং উদ্বেগজনক দিন হবে। সেই দিন এসব ক্ষতিসাধনকারী লোক জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলা গণগণে আগুনে প্রবেশ করবে। সেই দিন সমস্ত মানুষ নগ্নপায়ে, নগ্নদেহে খাৎনা-বিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে। তারা যেখানে দাঁড়াবে সে জায়গা হবে সংকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, নানা বিপদ-বিভীষিকাময় আপদে পরিপূর্ণ। সেখানে এমন সব বালা-মুসীবত নাযিল হবে যে, মন অতিশয় বিচলিত ও ভয়কাতর হয়ে পড়বে। হুঁশ-জ্ঞান সব লোপ পেয়ে যাবে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "যেদিন সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট দাঁড়াবে সেই দিন তাদের কেউ কেউ তার ঘামে তার কর্ণদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে।"[১]

হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "কিয়ামতের দিন সূর্য বান্দাদের এতো নিকটে থাকবে যে, ওর দূরত্ব হবে এক মাইল বা দুই মাইল। ঐ সময় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ হবে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত ঘাম পৌঁছবে, আবার কারো কারো ঘাম তার লাগামের মত হয়ে যাবে (অর্থাৎ ঘাম তার নাক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে)।"[২]

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন সূর্য এতো নিকটে আসবে যে, ওটা মাত্র এক মাইল উপরে থাকবে। ওর তাপ এতো তীব্র ও প্রচণ্ড হবে যে, ওর তাপে মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে যেমন চুল্লীর উপর রাখা হাঁড়ির পানি ফুটতে থাকে। মানুষকে তাদের ঘাম তাদের পাপ অনুপাতে ঢেকে ফেলবে। ঘাম কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে, কারো পৌঁছবে পায়ের গিরা পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত। আবার কারো ঘাম তার লাগাম হয়ে যাবে। (অর্থাৎ তার একেবারে নাক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।"[৩]

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[৩] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (সঃ) নিজের মুখে আঙ্গুল রেখে **বলেনঃ "এভাবে ঘাম লাগামের মত** ঘিরে থাকবে।" তারপর তিনি হাত দ্বারা **ইশারা করে বলেনঃ " কেউ কেউ ঘামের মধ্যে** সম্পূর্ণ ডুবে যাবে।"

একটি হাদীসে আছে যে, **তারা সত্তর বছর** ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, তারা এর **মধ্যে কোন** কথা বলবে না'। এ **কথাও বলা হয়েছে যে,** তারা তিন শ বছর **দাঁড়িয়ে থাকবে।** আবার এও বলা হয়েছে যে, তারা চল্লিশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে **থাকবে** এবং দশ হাজার বছরে বিচার করা হবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূরূপে বর্ণিত আছে যে, **এমন** এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বাশীর গিফারী (রাঃ)কে বলেনঃ " সে দিন তুমি কি করবে যখন জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে তিনশ বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? আসমান থেকেও কোন খবর আসবে না এবং কোন হুকুমও করা হবে না?" একথা শুনে হযরত বাশীর (রাঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তাহলে শিখে নাও! যখন তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন কিয়ামতের দিনের দুঃখ কষ্ট এবং হিসাব নিকাশের ভয়াবহতা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।"[১]

সুনানে আবী দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিয়ামত দিবসের দাঁড়ানোর জায়গায় সংকীর্ণতা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কোন কথা বলবে না। পাপী পূণ্যবান সবাইকে ঘামের লাগাম ঘিরে রাখবে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, তারা একশ বছর দাঁড়িয়ে থাকবে।

সুনানে আবী দাউদে, সুনানে নাসাঈ এবং সুনানে ইবনে মাজায় হযরত **আয়েশা** (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাত্রে উঠে **তাহাজ্জুদের** নামায শুরু করতেন তখন দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার **আলহামদু**লিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশবার আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন। **তারপর** বলতেনঃ

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ -

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিযিক দিন এবং আমাকে নিরাপদে রাখুন।” অতঃপর তিনি কিয়ামত দিবসের দাঁড়ানোর জায়গার সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

৭। না, না, কখনই না, পাপাচারীদের আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে;	٧- كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ○ ط
৮। সিজ্জীন কি তা কি তুমি জান?	٨- وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ○ ط
৯। ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক।	٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ○ ط
১০। সেইদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের,	١٠- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
১১। যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,	١١- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○ ط
১২। আর সীমা লংঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত, কেউই ওকে মিথ্যা বলতে পারে না।	١٢- وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○ لا
১৩। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলেঃএটা তো পূর্বকালীন কাহিনী!	١٣- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○ ط
১৪। না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে।	١٤- كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○
১৫। না, অবশ্যই সেই দিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে;	١٥- كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ○ ط
১৬। অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে;	١٦- ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ○ ط

১৭। তৎপর বলা হবেঃ এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে।

١٧- ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ ط

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, পাপাচারী ও মন্দ লোকদের ঠিকানা হলো **সিজ্জীন**। এ শব্দটি فِعِّيْلٌ এর অনুরূপ ওজনে سِجْنٌ থেকে নেয়া হয়েছে। سِجْنٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সংকীর্ণতা। যেমন বলা হয় فِسِّيْقٌ، شِرِّيْبٌ، خِمِّيْرٌ، سِكِّيْرٌ ইত্যাদি। তারপর ওর আরো মন্দ গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছেঃ তোমরা ওর প্রকৃত অবস্থা অবগত নও। ওটা হলো যন্ত্রণাদায়ক ও চিরস্থায়ী দুঃখ যাতনার স্থান।

বর্ণিত আছে যে, এই জায়গাটি সাত জমীনের তলদেশে অবস্থিত। হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ)-এর সুদীর্ঘ হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের রূহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) বলে থাকেনঃ তোমরা তার ফিতার সিজ্জীনে লিখে নাও। আর এই সিজ্জীন সাত জমীনের নীচে অবস্থিত। বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন হলো সপ্তম জমীনের নীচে একটি সবুজ পাথর। আরো বলা হয়েছে যে, ওটা জাহান্নামের মধ্যস্থিত একটি গর্ত। ইমাম ইবনে জারীর একটি গারীব, মুনকার ও গায়ের সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে যে, 'ফালাক' হলো জাহান্নামের একটি কূপ যার মুখ বন্ধ রয়েছে। আর সিজ্জীন হলো উন্মুক্ত মুখ বিশিষ্ট একটি কূপ। সঠিক কথা এই যে, এর অর্থ হলো জেলখানার এক সংকীর্ণ স্থান। নীচের মাখলুকের মধ্যে সংকীর্ণতা রয়েছে এবং উপরের মাখলুকের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে। আকাশসমূহের মধ্যে প্রতিটি উপরের আকাশ ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত এবং জমীনের মধ্যে প্রতিটি নীচের জমীন ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ। সপ্তম জমীনের মধ্যবর্তী কেন্দ্র সবচেয়ে সংকীর্ণ। কেননা, কাফিরদের প্রত্যাবর্তনের জায়গা সেই জাহান্নাম সবচেয়ে নীচে অবস্থিত। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ -

অর্থাৎ "অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু'মিন এবং সৎকর্ম পরায়ণ।" (৯৫ : ৫-৬) মোট কথা সিজ্জীন হলো একটা অতি সংকীর্ণ এবং নীচু জায়গা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا -

অর্থাৎ "এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে।" (২৫ ঃ ১৩)

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক), এটা এই সিজ্জীনের তাফসীর নয়, বরং এটা হলো তাদের জন্যে যা লিখিত হয়েছে তার তাফসীর। অর্থাৎ পরিণামে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের এই পরিণাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এতে এখন আর কম বেশী কিছু করা হবে না। বলা হচ্ছে। তাদের পরিণাম যে সিজ্জীনে হবে এটা আমার কিতাবে পূর্বেই লিখে দেয়া হয়েছে। এই লিখাকে যারা অবিশ্বাস করবে সেদিন তাদের মন্দ পরিণাম হবে। তারা জাহান্নামের অবমানকর শাস্তির সম্মুখীন হবে। মোটকথা, তাদের ধ্বংস ও সর্বনাশ সাধিত হবে। وَيْلٌ শব্দের অর্থ হলো সর্বনাশ, ধ্বংস এবং মন্দ পরিণাম। যেমন বলা হয়ঃ وَيْلٌ لِّفُلَانٍ অর্থাৎ "ধ্বংস ও মন্দ পরিণাম অমুকের জন্যে।" আর যেমন মুসনাদ ও সুনানের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ ব্যক্তির জন্যে মন্দ পরিণাম যে মানুষকে হাসাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে থাকে। তার জন্যে মন্দ পরিণাম, তার জন্যে মন্দ পরিমাণ।"

এরপর ঐ অবিশ্বাসী পাপী কাফিরদের সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এরা এমন লোক যারা আখিরাতের শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্বীকার করতো। বিবেক বুদ্ধির বিপরীত বলে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে বিশ্বাস করতো না। যেমন বলা হয়েছেঃ কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করা। ঐ সব লোকেরই কাজ যারা নিজেদের কাজে সীমা ছাড়িয়ে যায়, হারাম কাজ করতে থাকে অথবা বৈধ কাজে সীমা অতিক্রম করে। যেমন পাপীরা নিজেদের কথায় মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, গালাগালি করে ইত্যাদি। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন, যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলেঃ এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা। অর্থাৎ এগুলো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হতে সংকলন ও সংযোজন করা হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

অর্থাৎ "যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছেন? তারা উত্তরে বলেঃ পূর্ববর্তীদের উপকথা।" (১৬ ঃ ২৪) আরও বলেনঃ

وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ـ

অর্থাৎ “তারা বলেঃ এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, এগুলো সকাল সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়।” (২৫ ঃ ৫) আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেনঃ প্রকৃত ঘটনা তাদের কথা ও ধারণার অনুরূপ নয়। বরং এ কুরআন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কালাম। এটা আল্লাহর অহী যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর নাযিল করেছেন। তবে হ্যাঁ, তাদের অন্তরের উপর তাদের মন্দ কাজসমূহ পর্দা স্থাপন করে দিয়েছে। পাপ এবং অন্যায়ের আধিক্যের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। কাফিরদের অন্তরের উপর رِيْن হয় এবং পূণ্যবানদের অন্তরে غَيْم হয়।। জামে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “বান্দা যখন পাপ করে তখন তার মনের কোণে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। যদি তাওবা করে তবে ঐ দাগ মুছে যায়। আর যদি ক্রমাগত পাপে লিপ্ত থাকে তা হলে ঐ কালো দাগ প্রসার লাভ করে।

كَلَّا بَلْ رَانَ দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। সুনানে নাসাঈর শব্দে কিছু রদ বদল রয়েছে। এ হাদীস মুসনাদে আহমদেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেন যে, পাপের উপর পাপ করলে মন অন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ঐ মন মরে যায়। তারপর বলেন যে, এ সব লোক উপরোক্ত শাস্তিতে জড়িয়ে পড়ে আর আল্লাহর দীদার হতেও বঞ্চিত হয়।

ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বলেনঃ এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুমিন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে সম্মানিত হবে। ইমাম সাহেবের এই মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে সত্য, আর আয়াতের সারমর্মেও এটাই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ـ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ

অর্থাৎ “সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।” (৭৫ ঃ ২২-২৩) সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দারা নিজেদের সম্মানিত প্রতিপালককে বেহেশতের মনোরম বাগানে বসে প্রত্যক্ষ করবে। হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ পর্দা সরে যাবে এবং মুমিন তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। কাফিরদেরকে পর্দার পিছনে সরিয়ে দেয়া হবে। মুমিন বান্দারা, প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় পরওয়ারদিগারে আ'লামের দীদার লাভ করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ কাফিররা শুধু আল্লাহর দীদার লাভ থেকেই বঞ্চিত হবে না, বরং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর তাদেরকে ধমক, ঘৃণা, তিরস্কার ও ক্রোধের সুরে বলা হবেঃ এটাই ঐ জায়গা যা তোমরা অস্বীকার করতে।

১৮। অবশ্যই পুণ্যবানদের আমল নামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে,	١٨- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ۝ط
১৯। ইল্লিয়্যীন কি তা কি তুমি জান?	١٩- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝ط
২০। (তা হচ্ছে) লিখিত পুস্তক।	٢٠- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝لا
২১। যারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা ওটা প্রত্যক্ষ করবে।	٢١- يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝ط
২২। পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,	٢٢- اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝لا
২৩। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।	٢٣- عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝لا
২৪। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে,	٢٤- تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝ج
২৫। তাদেরকে মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে,	٢٥- يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝لا
২৬। ওর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর থাকে যদি কারো কোন আকাঙ্খা বা কামনা তবে তারা এরই কামনা করুক।	٢٦- خِتٰمُهٗ مِسْكٌ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝ط
২৭। ওর মিশ্রণ হবে তাসনীমের,	٢٧- وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝لا
২৮। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করে।	٢٨- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝ط

পাপীদের পরিণাম অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়ার পর এবার পূণ্যবানদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ পুণ্যবানদের ঠিকানা হবে ইল্লিয়্যীন যা সিজ্জীনের সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত কা'বকে (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সিজ্জীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, সপ্তম জমীনকে সিজ্জীন বলা হয়। সেখানে কাফিরদের রূহ অবস্থান করবে। ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ সপ্তম আসমানকে ইল্লিয়্যীন বলা হয় সেখানে মোমিনদের রূহ অবস্থান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এর অর্থ হলো জান্নাত। হযরত আওফী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, মু'মিনদের আমলসমূহ আল্লাহ তা'আলার কাছে আকাশে রয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেনঃ এটা আরশের ডান পায়া।

অন্য লোকেরা বলেনঃ এটা সিদরাতুল মুনতাহার কাছে রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ শব্দটি عُلُوٌّ শব্দ হতে গৃহীত হয়েছে। عُلُوٌّ শব্দের অর্থ হলো উঁচু। যে জিনিস যত উঁচু এবং বুলন্দ হবে তার প্রশস্ততা এবং প্রসারতাও ততো বেশী হবে। এ কারণেই তার বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছেঃ তোমরা এর বিশেষত্ব সম্পর্কে অবগত নও কি? তারপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ মুমিনরা যে ইল্লিয়্যীনে থাকবে এটা নিশ্চিত ব্যাপার, কিতাবে তা লিখিত হয়েছে। ইল্লিয়্যীনের কাছে আকাশের সকল বিশিষ্ট ফেরেশতা গমন করে থাকেন। তারপর বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এই পুণ্যবান লোকেরা চিরস্থায়ী নিয়ামত রয়েছে এমন বাগানসমূহে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তা'আলার রহমতসমূহ তাদের উপর বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হবে। মুমিন বান্দারা পালংকে বসে থাকবে এবং নিজেদের সাম্রাজ্য ধনমাল, মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ করবে। তাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার এসব নিয়ামত অফুরন্ত। কখনো তাতে কিছুমাত্র কমতী হবে না। তারা নিজেদের আরামালয়ে সম্মানিত উচ্চাসনে বসে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করে ধন্য হবে। এটা কাফির মুশরিকদের সাথে কৃত আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের প্রতি সব সময় আল্লাহর দীদারের অনুমতি থাকবে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর এ বিষয় সংক্রান্ত একটি হাদীসের মর্মানুযায়ী সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর জান্নাতবাসীরা তাদের সম্পদ সাম্রাজ্য দু হাজার বছরের পথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করবে এবং তার শেষ সীমার সকল জিনিস নিকটবর্তী জিনিসের মতই স্পষ্ট দেখতে পাবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীরা প্রতিদিন দু দুবার

দীদারে ইলাহীর মাধ্যমে নিজেদের মন প্রফুল্ল রাখবে এবং দৃষ্টি আলোকিত করবে। কেউ তাদের চেহারার প্রতি তাকালে এক দৃষ্টিতেই তাদের পরিতৃপ্তি, আনন্দ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সজীবতা, মর্যাদার অনুভূতি, বৈশিষ্ট্য এবং আরাম আয়েশের পরিচয় পেয়ে যাবে এবং তাদের গৌরব মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবহিত হবে এবং অনুধাবন করবে যে, তারা সুখ সাগরে ডুবে আছে। তাদের মধ্যে জান্নাতী শারাব পরিবেশনের পর্ব চলতে থাকবে। رَحِيْق হলো জান্নাতের এক প্রকারের শারাব।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ অর্থাৎ মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করাবেন। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত কোন মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের মেওয়া খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোন উলঙ্গ মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমী পোশাক পরিধান করাবেন।”[১]

خِتَامُهٗ مِسْكٌ অর্থাৎ ওর মিশ্রণ হবে মিসক বা কস্তুরী। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে শারাবকে পবিত্র করেছেন এবং মিসকের মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এই অর্থও হতে পারে যে, সেই শারাবের পরিণাম হলো মিসক অর্থাৎ তাতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নেই, এবং মিসকের সুগন্ধি রয়েছে তাতে। ঠিক রূপোর রঙের মতই এ শারাব। তাতে রীতিমত সীলমোহর লাগানো থাকবে। সেই শারাব বা এমন সুগন্ধ যুক্ত হবে যে, পৃথিবীর কোন মানুষের একটা আঙ্গুল যদি সেই শারাবে লেগে যায় এবং তা সে বের করে নেয় তাহলে সেই সুগন্ধে সমগ্র পৃথিবী সুবাসিত হয়ে যাবে। خِتَام শব্দের অর্থ সুগন্ধ বলেও বর্ণিত আছে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। অর্থাৎ প্রতিযোগিতাকারীদের সেই দিকে সর্বাত্মক মনোযোগ দেয়া উচিত। যেমন অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ। অর্থাৎ “যারা আমল করে তাদের এরকম জিনিসের জন্যেই আমল করা উচিত।”

‘তাসনীম’ হলো জান্নাতের একটি উৎকৃষ্টতর শারাবের নাম। এটা এমন এক ঝর্ণা যা থেকে অগ্রাধিকারী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকেরা ক্রমাগত পান করবে। যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তারাও নিজেদের শারাব ‘রাহীক’ এর সঙ্গে মিশ্রিত করে পান করবে।

---

[১] এহাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২৯। যারা অপরাধী তারা মুমিনদেরকে উপহাস করতো	٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ○ زصلے
৩০। এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেতো তখন চোখ টিপে ইশারা করতো	٣٠- وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ○ زصلے
৩১। এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসতো তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে,	٣١- وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ○ زصلے
৩২। এবং যখন তাদেরকে দেখতো তখন বলতোঃ এরাই তো পথভ্রষ্ট,	٣٢- وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ○ لا
৩৩। তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি!	٣٣- وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ○ ط
৩৪। আজ তাই, মুমিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে,	٣٤- فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ○ لا
৩৫। সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করে।	٣٥- عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ○ ط
৩৬। কাফিররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেলো তো?	٣٦- هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা পাপীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে তো তারা খুব বাহাদুরী দেখায়, মুমিনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, চলাফেরার সময় তিরস্কার ভর্ৎসনা করে, ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি করে এবং আরও নানা প্রকার অবমাননাকর উক্তি করে নিজেদের দলের লোকদের কাছে গিয়ে তারা আপত্তিজনক নানা কথা বানিয়ে বলে, যা খুশী তাই করে বেড়ায় কুফরীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে নানা রকম কষ্ট দেয়। মুসলমানরা তাদের কথায় কান না দেওয়ায় তারা মুসলমানদেরকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাদেরকে মুমিনদের জন্য দারোগা করে পাঠানো হয়নি। কাজেই কাফিরদের এসব বলার কোনই প্রয়োজন নেই। কাফিরদের কি

হয়েছে যে, তারা মুমিনদের পিছনে লেগে থাকে এবং ব্যাঙ্গাত্মক কথাবার্তা বলে বেড়ায়? যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ۔ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۔ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰۤى اَنْسَوْكُمْ
ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْۤا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۔

অর্থাৎ "তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলিস না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলতোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে যে, ওটা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম।" (২৩ ঃ ১০৮-১১১) এ জন্যেই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আজ কিয়ামতের দিন মুমিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করছে ও সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করছে।

এটা স্পষ্টভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, এ মুমিনরাই ছিল সুপথ প্রাপ্ত, এরা পথভ্রষ্ট ছিল না, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে পথভ্রষ্ট। অথচ তোমরা এদেরকে পথভ্রষ্ট বলতে। প্রকৃত পক্ষে এ মুমিনগণ ছিল আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত। এ জন্যেই আজ আল্লাহর দীদার এদের চোখের সামনে রয়েছে, এরা আজ আল্লাহর মেহমান এবং তাঁর দেয়া মর্যাদাসিক্ত উচ্চাসনে সমাসীন।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এসব কাফির দুনিয়ার এই মুসলমানদের সাথে যে সব দুর্ব্যবহার করেছে, আজ কি তারা তাদের সেই সব ব্যবহারের পুরোপুরি প্রতিফল পেয়েছে? অবশ্যই পেয়েছে। তাদের পরিহাসের পরিবর্তে আজ তারা পরিহাস লাভ করেছে। এ কাফিররা যে সব মুসলমানকে মর্যাদাহীন বলতো, আল্লাহ আজ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। মোটকথা সমস্ত মানুষই আজ কিয়ামতের দিন নিজেদের কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের কাজের বিনিময় তারা পেয়ে গেছে।

সূরাঃ মুতাফ্‌ফিফীন এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ ইনশিকাক, মাক্কী

(আয়াত ঃ ২৫, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٥، رُكُوْعُهَا : ١)

ইমাম মালিক (রঃ)-এর মুআত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনগণকে নামায পড়ান এবং ঐ নামাযে তিনি اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এ সূরাটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (সিজদার আয়াতে নামাযের মধ্যেই) সিজদা করেন। নামায শেষে তিনি জনগণকে সংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এভাবে নামাযের মধ্যে সিজদা করেছেন।[১]

হযরত আবূ রাফে (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরাইরার (রাঃ) সাথে এশার নামায পড়েছি। তিনি নামাযে اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ সূরাটি পাঠ করেন এবং (সিজদার আয়াতে) সিজদা করেন। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ আমি আবূল কাসেমের (সঃ) পিছনে (নামায পড়েছি এবং তার সিজদার সাথে) সিজদা করেছি। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পর্যন্ত) এই স্থলে সিজদা করতেই থাকবো।"[২] সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এবং اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ এই সূরাদ্বয়ে সিজদা করেছি।

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,	١- اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ○
২। এবং ওটা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং ওকে তদুপযোগী করা হবে,	٢- وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ○
৩। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।	٣- وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ○
৪। এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং শূন্য গর্ভ হয়ে যাবে,	٤- وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ○

---

[১] এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈতেও বর্ণিত হয়েছে।

[২] ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এহাদীসের আরো সনদ রয়েছে।

৫। এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে (তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই)।	٥- وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○ ط
৬। হে মানব! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করে থাকো পরে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।	٦- يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ○ ج
৭। অনন্তর যাকে তার দক্ষিণ হস্তে তদীয় কর্মলিপি প্রদত্ত হবে,	٧- فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ○ لا
৮। তার হিসাব নিকাশ তো সহজভাবে গৃহীত হবে।	٨- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ○ لا
৯। এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে;	٩- وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ○ ط
১০। এবং যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে দেয়া হবে	١٠- وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ○ لا
১১। ফলতঃ অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে।	١١- فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ○ لا
১২। এবং জ্বলন্ত অগ্নিতেই সে প্রবিষ্ট হবে।	١٢- وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ○ ط
১৩। সে তার স্বজনদের মধ্যে তো সহর্ষে ছিল,	١٣- اِنَّهٗ كَانَ فِىْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ○ ط
১৪। যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবে না।	١٤- اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ○ ج

১৫। হ্যাঁ (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে), নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

١٥- بَلٰٓى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে যাবে, ওটা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ পালনের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকবে এবং ফেটে যাওয়ার আদেশ পাওয়া মাত্র ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তার করণীয়ই হলো আল্লাহর আদেশ পালন। কেননা, এটা ঐ আল্লাহর আদেশ যাঁ কেউ ঠেকাতে পারে না, যিনি সবারই উপর বিজয়ী সবকিছুই যাঁর সামনে অসহায় ও নাচার।

জমীনকে যখন সম্প্রসারিত করে দেয়া হবে। অর্থাৎ জমীনকে প্রসারিত করা হবে, বিছিয়ে দেয়া হবে এবং প্রশস্ত করা হবে। হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী পাক (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা জমীনকে চামড়ার মত টেনে নিবেন। তাতে সব মানুষ শুধু দুটি পা রাখার মত জায়গা পাবে। সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার ডান দিকে থাকবেন। আল্লাহর কসম! হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলাকে কখনো দেখেননি। আমি তখন বলবোঃ হে আমার প্রতিপালক! ইনি হযরত জিবরাঈল (আঃ), আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আপনি তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। (এটা কি সত্য) তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ উত্তরে বলবেনঃ হ্যাঁ, সত্য বলেছে।" অতঃপর আমি শাফাআতের অনুমতিপ্রাপ্ত হবো এবং বলবোঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আপনার ইবাদত করেছে।!" ঐ সময় তিনি মাকামে মাহমুদে থাকবেন।[১]

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে অর্থাৎ জমীন তার অভ্যন্তরভাগ থেকে সকল মৃতকে উঠিয়ে ফেলবে এবং এভাবে ও গর্ভ শূন্য হয়ে যাবে। সেও প্রতিপালকের ফরমানের অপেক্ষায় থাকবে তার জন্যে এটাই করণীয়ও বটে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করে থাকো পরে তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি অগ্রসর হতে থাকবে,

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমল করতে থাকবে, অবশেষে একদিন তাঁর সাথে মিলিত হবে এবং তার সম্মুখে দাঁড়াবে। তখন তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনি যতদিন ইচ্ছা জীবন যাপন করুন, অবশেষে একদিন আপনার মৃত্যু অনিবার্য। যা কিছুর প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি করার করুন, একদিন তা থেকে বিচ্ছেদ অবধারিত। যা ইচ্ছা আমল করুন, একদিন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে।" مُلَاقِيْه শব্দের 'ه' সর্বনাম দ্বারা রব হবে বা প্রতিপালককে বুঝানো হয়েছে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। তখন অর্থ হবেঃ তোমার সাথে তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ হবেই। তিনি তোমাকে তোমার সকল আমলের পারিশ্রমিক দিবেন। তোমার সকল প্রচেষ্টার প্রতিফল তোমাকে প্রদান করবেন। এ উভয় কথাই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে আদম সন্তান! তোমরা চেষ্টা কর বটে কিন্তু নিজেদের চেষ্টায় তোমরা দুর্বল। সকল চেষ্টা পুণ্যাভিমুখী যেন হতে পারে এ চেষ্টা করো। প্রকৃতপক্ষে পূণ্যকাজ করাবার এবং পাপকাজ হতে বিরত রাখার শক্তি একমাত্র আল্লাহর। তাঁর সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যাকে তার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে দেয়া হবে তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। অর্থাৎ তার ছোট খাট পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর খুটিনাটিভাবে যার আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। সে শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "(কিয়ামতের দিন) যার হিসাব যাচাই করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।" হযরত আয়েশা (রাঃ) একথা শুনে বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা কি একথা বলেন নাই? "অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে তার হিসাব হবে সহজতর।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, সেটা তো হিসাবের নামে দৃশ্যতঃ পেশ করা মাত্র (যথার্থ হিসাব নয়)। কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তির হিসাব যাচাই করা হবে, আযাব তার জন্যে অবধারিত।"[১]

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) ইমাম বুখারী (রঃ) ইমাম তিরমিযী (রঃ, ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এটা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় অঙ্গুলী স্বীয় হস্তের উপর রেখে যেভাবে কেউ কোন জিনিস তন্ন তন্ন করে খুঁজে ঠিক সেইভাবে অঙ্গুলি নাড়াচাড়া করে বলেনঃ “অর্থাৎ যাকে তন্ন তন্ন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।” হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, যার কাছ থেকে যথারীতি হিসাব নেয়া হবে সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। তাকে শাস্তি ভোগ থেকে রেহাই দেয়া হবে না। حِسَابًا يَّسِيْرًا দ্বারা শুধু পেশকরণ বুঝানো হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে তাঁর কোন এক নামাযে বলতে শুনিঃ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا - অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমার হিসাব আপনি সহজভাবে গ্রহণ করুন।” তিনি এ নামায হতে ফারেগ হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ সহজ হিসাব কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ “শুধু আমলনামার প্রতি দৃষ্টি দেয়ানো হবে অর্থাৎ ভাসাভাসা নযর দেয়ানো হবে। তারপর বলা হবেঃ যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু হে আয়েশা (রাঃ)! আল্লাহ তা'আলা যার কাছ থেকে হিসাব নিবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে।” মোটকথা, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে তা পেশ হওয়ার পরপরই ছাড়া পেয়ে যাবে। তারপর দলীয় লোকদের কাছে উৎফুল্লভাবে ফিরে আসবে।

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা আমল করতে রয়েছো, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কারো জানা নেই। শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমরা নিজেদের আমলসমূহ চিনতে পারবে। কোন কোন লোক উৎফুল্লভাবে দলীয় লোকদের সাথে মিলিত হবে। আর কোন কোন লোক বিমর্ষভাবে, মলিন মুখে এবং উদাসীন চেহারায় ফিরে আসবে। যারা পিঠের কাছে বাম হাতে আমলনামা পাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ততা ও ধ্বংসের কথা ভেবে চীৎকার করবে, মৃত্যু কামনা করবে এবং জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। পৃথিবীতে তারা খুব হাসিখুশী বা নিশ্চিন্ত আরাম আয়েশে দিন কাটিয়েছে। পরকালের জন্যে সামান্যতম ভয়ও তাদের ছিল না। আজ তাদেরকে সর্বপ্রকারের দুঃখ যাতনা, বিমর্ষতা, মলিনতা এবং উদাসীনতা সবদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তারা মনে করেছিল যে মৃত্যুর পর আর পুনরুত্থান হবে না এবং আর কোন জীবন নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে যাওয়ার কথা মোটেই বিশ্বাস করেনি।

তাই, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ নিশ্চয়ই তারা ফিরে যাবে। আল্লাহ অবশ্য তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথমবার তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় বারও সেভাবেই সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে পাপ ও পূণ্য কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। তিনি তাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তারা যা কিছু করছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

১৬। আমি শপথ করি অস্তরাগের,

١٦- فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ○

১৭। এবং রজনীর আর ওটা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,

١٧- وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ○

১৮। এবং শপথ চন্দ্রের, যখন ওটা পরিপূর্ণ হয়,

١٨- وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ○

১৯। নিশ্চয় তোমরা একস্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে।

١٩- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ؕ○

২০। সুতরাং তাদের কি হলো যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না?

٢٠- فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ○

২১। এবং তাদের নিকট কুরআন পঠিত হলে তারা সিজদাহ করে না?

٢١- وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۜ○ السجدة

২২। পরন্তু কাফিরগণই অসত্যারোপ করে।

٢٢- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ○ۖ

২৩। অথচ তারা (মনে মনে) যা পোষণ করে থাকে আল্লাহ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।

٢٣- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ○ۖ

২৪। সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর।

٢٤- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২৫। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।

٢٥- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ○ ع

সূর্যাস্তকালীন আকাশের লালিমাকে শফক বলা হয়। পশ্চিমাকাশের প্রান্তে এ লালিমার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ), হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত শাদদাদ ইবনে আউস (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রঃ), হযরত মাকহূল (রঃ), হযরত বকর ইবনে আবদিল্লাহ মাযানী (রঃ), হযরত বুকায়ের ইবনে আশাজ (রঃ), হযরত মালিক (রঃ), হযরত ইবনে আবী যি'ব (রঃ) এবং হযরত আবদুল আযীম ইবনে আবী সালমা মা, জিশূন (রঃ) বলেন ঐ লালিমাকেই শফক বলা হয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, শফক হলো শুভ্রতা। তবে কিনারা বা প্রান্তের লালিমাকে শফক বলা হয় সেটা সূর্যোদয়ের পূর্বেই হোক বা সূর্যোদয়ের পরেই হোক। খলীল (রঃ) বলেন যে, ইশার সময় পর্যন্ত এ লালিমা অবশিষ্ট থাকে। জওহীর (রঃ) বলেন, যে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে লালিমা বা আলোক অবশিষ্ট থাকে ওটাকে শফক বলা হয়। এটা সন্ধ্যার পর থেকে নিয়ে ইশার নামাযের সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, মাগরিবের সময় থেকে নিয়ে ইশার সময় পর্যন্ত এটা বাকী থাকে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মাগরিবের সময় শফক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে।" অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত মাগরিবের নামায আদায় করা যেতে পারে।" মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, শফকের অর্থ হলো সারাদিন। অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, শফকের অর্থ হলো সূর্য। মনে হয় আলো এবং অন্ধকারের কসম খেয়েছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ দিনের প্রস্থান এবং রাত্রির আগমনের শপথ। অন্যরা বলেন যে, সাদা এবং লাল বর্ণের নাম শফক। এই শব্দটি اَضْدَادْ এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ বিপরীত অর্থবোধক।

وَسَقَ শব্দের অর্থ হলোঃ একত্রিত করেছে অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি এবং যা কিছু রাত্রে বিচরণ করে

আর শপথ চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ চন্দ্র যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে পুর্ণ আলোকময় হয়ে যায় তার শপথ।

لَتَرْكَبُنَّ এর তাফসীর সহীহ বুখারীতে মারফূ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে চলে যাবে। হযরত আনাস (রাঃ)

বলেন যে, যে বছর আসবে সেই বছর পূর্বের বছরের চেয়ে খারাপ হবে। হযরত উমার (রাঃ), হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজনও এটাই সমর্থন করেন এবং মক্কাবাসী ও কুফাবাসীর কিরআত দ্বারাও এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

শাবী (রঃ) বলেন যে, لَتَرْكَبُنَّ এর অর্থ হলোঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এক আকাশের পর অন্য আকাশে আরোহণ করবে। এর দ্বারা মিরাজকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এক মনযিলের পর অন্য মনযিলে আরোহণ করতে থাকবে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী মনযিল অতিক্রম করবে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি বা পন্থার উপর চলবে। এমন কি তারা যদি গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাই করবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহ রাসূল (সঃ) পূর্ববর্তীদের দ্বারা কি ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "তারা ছাড়া আর কারা হবে?"

মাকহুল (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ প্রতি বিশ বছর পর পর তোমরা কোন না কোন এমন কাজ আবিষ্কার করবে যা পূর্বে ছিল না। আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ আসমান ফেটে যাবে, তারপর ওটা লাল বর্ণ ধারণ করবে এবং এর পরেও রঙ বদলাতেই থাকবে। এক সময় আকাশ ধূম্র হয়ে যাবে, তারপর ফেটে যাবে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ পৃথিবীতে অবস্থানকারী হীন ও নিকৃষ্ট মর্যাদার বহু লোক আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর উচ্চ মর্যাদাশীলও প্রভাবশালী বহু লোক আখেরাতে মর্যাদাহীন, অপমানিত ও বিফল মনোরথ হয়ে যাবে। ইকরামা (রঃ) এর অর্থ বর্ণনা করেন যে, প্রথমে দুধপানকারী, তারপর খাদ্য ভক্ষণকারী প্রথমে যুবক ছিল, তারপর বৃদ্ধ হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ কোমলতার পর কঠোরতা, কঠোরতার পর কোমলতা, আমীরীর পর ফকীরী ও ফকীরীর পর আমীরী এবং সুস্থতার পর অসুস্থতা ও অসুস্থতার পর সুস্থতা।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আদম সন্তান গাফলতী বা উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে। তারা যে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে তার পরোয়া তারা মোটেই করে না।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন একজন ফেরেশতাকে বলেনঃ 'তার রিয্ক. জন্ম-মৃত্যু ও পাপ-পুণ্য লিখে নাও।' আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে সেই ফেরেশ্তা চলে যান এবং অন্য ফেরেশতাকে আল্লাহ তার কাছে পাঠিয়েদেন। তিনি এসে ঐ মানব-শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ঐ শিশু বুদ্ধি বিবেকের অধিকারী হলে ঐ ফেরেশ্তাকে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তার পাপ-পুণ্য লিখবার জন্যে আল্লাহ্ তার উপর দু'জন ফেরেশ্তাকে নিযুক্ত করেন। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে এরা দু'জন চলে যান এবং মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশ্তা) তার নিকট আগমন করেন এবং তার রূহ্ কব্য করে নিয়ে চলে যান। তারপর ঐ রূহ্ তার কবরের মধ্যে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তখন মালাকুল মাউত চলে যান এবং তাকে প্রশ্নোত্তর করার জন্যে কবরে দু'জন ফেরেশ্তা আসেন এবং নিজেদের কাজ শেষ করে তাঁরাও বিদায় গ্রহণ করেন। কিয়ামতের দিন পাপ-পুণ্যের ফেরেশ্তাদ্বয় আসবেন এবং তার কাঁধ হতে তার আমলনামা খুলে নিবেন। তারপর তারা তার সাথেই থাকবেন, একজন চালকরূপে এবং অপরজন সাক্ষীরূপে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا ۔

অর্থাৎ 'তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে।" (৫০ ঃ ২২) তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এ আয়াতটি পাঠ করলেন। অর্থাৎ এক অবস্থার পরে অন্য অবস্থা। তারপর নবী করীম (সঃ) বললেনঃ "(হে জনমণ্ডলী!) তোমাদের সামনে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যা পালন করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং তোমরা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।"[১]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, এর প্রকৃত ভাবার্থ হলোঃ হে মুহাম্মদ (সঃ) তুমি একটার পর একটা কঠিন কঠিন কাজে জড়িয়ে পড়বে। যদিও এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে সব মানুষকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতের দিন একটার পর একটা বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করবে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা মুন্কার হাদীস এবং এর সনদের মধ্যে দুর্বল বর্ণনাকারী বেশ কয়েকজন রয়েছেন। তবে এর অর্থ বিশুদ্ধ। এসব ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনে না? আর কুরআন শুনে সাজদায় অবনত হতে কে তাদেরকে বিরত রাখে? বরং এই কাফিররা তো উল্টো অবিশ্বাস করে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং সত্য ও হকের বিরোধিতা করে। তারা হঠকারিতা এবং মন্দের মধ্যে ডুবে আছে। তারা মনের কথা গোপন রাখলেও আল্লাহ্ তা'আলা সেসব ভালভাবেই জানেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এই কাফিরদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

তারপর বলেনঃ সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে উত্তম পুরস্কারের যোগ্য তারাই যারা ঈমান এনে সৎকাজ করেছে। তারা পুরোপুরি, অফুরন্ত ও বেহিসাব পুরস্কার লাভ করবে। যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ - অর্থাৎ "এমন দান যা শেষ হবার নয়।" (১১ ঃ ১০৮) কেউ কেউ বলেছেন যে, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ এর অর্থ হলো غَيْرُ مَنْقُوْصٍ অর্থাৎ হ্রাসকৃত নয়। কিন্তু এর অর্থ ঠিক নয়। কেননা, প্রতি মুহূর্তে এবং সব সময়েই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন জান্নাতবাসীদের প্রতি ইহসান করবেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। বলা যাবে যে, আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী এবং অনুগ্রহের কারণেই জান্নাতীরা জান্নাত লাভ করেছে, তাদের আমলের কারণে নয়। সেই মালিকের তো নিজের মাখলূকাতের প্রতি একটা চিরস্থায়ী অনুগ্রহ রয়েছে। তার পবিত্র সত্তা চিরদিনের ও সব সময়ের জন্যে প্রশংসার যোগ্য। এ কারণেই জান্নাতবাসীদের জন্যে আল্লাহ্র হামদ, তাসবীহ্ শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ করা হবে। কুরআন কারীমে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ "তাদের শেষ ধ্বনি হবেঃ প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য।"

সূরা ঃ ইনশিকাক এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ বুরূজ, মাক্কী

(আয়াত ঃ ২২, রুকূ’ ঃ ১)

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٢، رُكُوْعُهَا : ١)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ই’শার নামাযে وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এবং وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ এই সূরা দু’টি পাঠ করতেন।[1]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ই’শার নামাযে سَمٰوٰت এর এই সূরাগুলো পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[2]

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

১। শপথ রাশিচক্র সমন্বিত আকাশের,

২। এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

৩। শপথ দ্রষ্টা ও দ্রষ্টের–

৪। ধ্বংস হয়েছিল কুণ্ডের অধিপতিরা

৫। ইন্ধন পূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি–

৬। যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল;

৭। এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করেছিল তাই প্রত্যক্ষ করছিল।

৮। তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই (অপরাধের) কারণে যে, তারা সেই মহিমাময়– পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ

٢- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ

٣- وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ؕ

٤- قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ

٥- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ

٦- اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ

٧- وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ

٨- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

٩- الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝

৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর, আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝

১০। যারা বিশ্বাসী নর নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা' করেনি, তাদের জন্যে নরক-যন্ত্রণা ও দহন যন্ত্রণা (নির্ধারিত) রয়েছে।

বুরুজের অর্থ হলো বড় বড় নক্ষত্র। হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বুরুজ ওকে বলা হয় যেখানে হিফাযতকারী অবস্থান করেন। ইয়াহ্ইয়া (রঃ) বলেন যে, এটা হলো আসমানী মহল। মিনহাল ইবনে আমর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ উত্তম কারুকার্য সম্পন্ন আকাশ। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ সূর্য ও চন্দ্রের মনযিলসমূহ। এই মনযিলের সংখ্যা বারো। প্রতি মনযিলে সূর্য এক মাস চলাচল করে এবং চন্দ্র ঐ মনযিলসমূহের প্রত্যেকটিতে দু'দিন ও এক তৃতীয়াংশ দিন চলাচল করে। এতে আটাশ দিন হয়। আর দু'রাত পর্যন্ত চন্দ্র গোপন থাকে, আত্ম প্রকাশ করে না।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ يَوْمٌ مَّوْعُوْدٌ দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। شَاهِد হলো জুমআ'র দিন। যেসব দিনে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয় সেগুলোর মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দিন হলো এই জুমআ'র দিন। এই দিনের মধ্যে এক ঘন্টা সময় এমন রয়েছে যে, ঐ সময়ে বান্দা যে কল্যাণ প্রার্থনা করে তা কবুল হয়ে যায়।। আর কেউ অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করলে তাকে পরিত্রাণ দেয়া হয়। আর مَشْهُوْدٌ হলো আরাফার দিন।"[১]

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। অন্যান্য কয়েকজন থেকেও এ তাফসীর বর্ণিত রয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। অন্য রিওয়াইয়াতে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছেঃ "জুমআ'র দিনকে

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে এটা ইবনে খুযাইমা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মূসা ইবনে উবায়েদ (রঃ) এর একজন বর্ণনাকারী এবং ইনি যাঈফ বা দুর্বল রাবী।

যে এখানে شَاهِد বলা হয়েছে এটা বিশেষভাবে আমাদের জন্যে ধনভাণ্ডারের মত গোপনীয় রেখে দেয়া হয়েছে।”

অন্য এক হাদীসে রয়েছেঃ “সকল দিনের নেতা হলো জুমআ'র দিন।” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, شَاهِد দ্বারা স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর مَشْهُوْد দ্বারা বুঝানো হয়েছে কিয়ামতের দিনকে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۔

অর্থাৎ “ওটা ঐ দিন যেই দিনে লোকদেরকে একত্রিত করা হবে এবং ওটা হলো হাযির করার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)।”(১১ ঃ ১০৩)

এক ব্যক্তি ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলোঃ شَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ কি? উত্তরে তিনি বললেন! “তুমি অন্য কাউকেও জিজ্ঞেস করেছো কি?” লোকটি জবাব দিলোঃ “হ্যাঁ, আমি হযরত ইবনে উমার (রঃ) ও হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি।” তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “তাঁরা কি বলেছেন?” লোকটি জবাবে বললোঃ তাঁরা বলেছেন যে, شَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ দ্বারা কুরবানীর দিন ও জুমআ'র দিনকে বুঝানো হয়েছে।” তিনি তখন বললেনঃ না তা নয়। বরং شَاهِد দ্বারা স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۔

অর্থাৎ ‘যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তখন কি অবস্থা হবে?” (৪ঃ ৪১) আর مَشْهُوْد দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ অর্থাৎ ওটা হলো হাযির করার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)। شَاهِد এর অর্থ আদম সন্তান বলেও বর্ণিত হয়েছে। আর مَشْهُوْد এর অর্থ কিয়ামতের দিন এবং জুমআর দিন বলেও উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। شَاهِد এর অর্থ আরাফার দিন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ “জুমআর দিন আমার প্রতি তোমরা বেশী করে দুরূদ পাঠ করো, কারণ এদিন “মাশহুদ’ দিন, এদিনে ফেরেশতা হাযির হন।” হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেনঃ شَاهِد হলেন

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا অর্থাৎ “সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।” (৪৮ ঃ ২৮) আর مَشْهُوْد হলাম আমরা। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাযির করা হবে।

অধিকাংশের মতে شَاهِد হলো জুমআ'র দিন এবং مَشْهُوْد হলো আরাফার দিন।

এই শপথ সমূহের পর ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘ধ্বংস করা হয় অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদেরকে।’ এরা ছিল একদল কাফির যারা ঈমানদারদেরকে পরাজিত করে তাঁদেরকে ধর্ম হতে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃতি জানালে ঐ কাফিররা মাটিতে গর্ত খনন করে তার মধ্যে কাঠ রেখে আগুন জ্বালিয়ে দেয় তারপর ঈমানদারদেরকে বলেঃ এখনো তোমাদের এ ধর্মত্যাগ কর। ঈমানদার লোকেরা এতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন ঐ কাফিররা তাঁদেরকে ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়। এটাকেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা ধ্বংস হয়ে গেছে। এরা ইন্ধনপূর্ণ প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঈমানদারদেরকে জ্বলে পুড়ে মৃত্যুবরণের দৃশ্য দেখছিল ও আনন্দে আটখানা হচ্ছিল। এ শত্রুতা এবং শাস্তির কারণ শুধু এটাই ছিল যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই সর্বশক্তিমান। তাঁর আশ্রয়ে আশ্রিত লোকেরা কখনো ধ্বংস হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যদি তিনি কখনো নিজের বিশেষ বান্দাদেরকে কাফিরদের দ্বারা কষ্টও দিয়ে থাকেন, সেটাও বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে এবং তার রহস্য কারো জানা না থাকতেও পারে। কিন্তু সেটা একটা প্রচ্ছন্ন ও বিশেষ অন্তর্নিহিত রহমত ও ফজীলতের ব্যাপার বৈ কিছু নয়।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গুণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তিনি জমীন, আসমান এবং সমগ্র মাখলুকাতের মালিক এবং তিনি সকল জিনিসের প্রতি নযর রাখছেন। তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে কোন জিনিসই গোপন নেই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, এটা পারস্যবাসীদের ঘটনা। পারস্যের বাদশাহ এ আইন জারী করতে চায় যে, মুহাররামাত অর্থাৎ মা, বোন, কন্যা প্রভৃতি সবারই সাথে বিবাহ হালাল বা বৈধ। সমকালীন আলেম সমাজ এই আইন মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং তীব্র প্রতিবাদও জানান। এতে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে খন্দক খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং প্রতিবাদকারীদেরকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। পারস্যবাসীরা এখনও সেই সব নারীকে বৈধ বলেই মনে করে থাকে। এরকমও বর্ণিত আছে যে, ঐ সব লোক ছিল ইয়েমনী। মুসলমান ও

কাফিরদের মধ্যে যে লড়াই হয় তাতে মুসলমানরা জয় লাভ করে। পরে অন্য যুদ্ধে কাফিররা জয়লাভ করার পর তারা খন্দক খনন করে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ওর মধ্যে মুসলমানদেরকে নিক্ষেপ করে এবং এভাবে তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করে। আবার এটাও বর্ণিত আছে যে, এটা আবিসিনীয়দের ঘটনা। আবার এটাকে বানী ইসরাঈলের ঘটনা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দানিয়াল এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে এরূপ আচরণ করে। আরো অন্য রকম বর্ণনা এ প্রসঙ্গে রয়েছে।

হযরত সুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল এক যাদুকর। সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলেঃ আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটা ছেলে দিন যাকে আমি ভালভাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।

তারপর সে একটি মেধাবী বালককে যাদুবিদ্যা শেখাতে শুরু করে। বালকটি তার শিক্ষাগুরুর বাড়ী যাওয়ার পথে এক সাধকের আস্তানার পাশ দিয়ে যেতো। সুফীসাধকও ঐ আস্তানায় বসে কখনো ইবাদত করতেন, আবার কখনো জনগণের উদ্দেশ্যে ওয়াজ নসীহত করতেন। বালকটিও পথের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদতের পদ্ধতি দেখতো কখনো ওয়ায নসীহত শুনতো। এ কারণে যাদুকরের কাছেও সে মার খেতো এবং বাড়ীতে বাপ মায়ের কাছেও মার খেতো। কারন যাদুকরের কাছে যেমন দেরীতে পৌঁছতো তেমনি বাড়ীতেও দেরী করে ফিরতো। একদিন সে সাধকের কাছে তার এ দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করলো। সাধক তাকে বলে দিলেনঃ যাদুকর দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, মা দেরী করে বাড়ী থেকে আসতে দিয়েছেন, কাজ ছিল। আবার মায়ের কাছে গিয়ে বলবে যে, গুরুজী দেরী করে ছুটি দিয়েছেন।

এমনিভাবে এ বালক একদিকে যাদু বিদ্যা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলো। একদিন সে দেখলো যে, তার চলার পথে এক বিরাট বিস্ময়কর কিম্ভুত কিমাকার জানোয়ার পড়ে আছে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এ পাশ থেকে ওপাশে এবং ওপাশ থেকে এপাশে যাওয়া আসা করা যাচ্ছে না। সবাই উদ্বিগ্নও বিব্রতাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বালকটি মনে মনে চিন্তা করল যে, একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেছে। দেখাযাক, আল্লাহর কাছে সাধকের ধর্ম অধিক পছন্দনীয় না যাদুকরের ধর্ম অধিক পছন্দনীয়। এটা চিন্তা করে সে একটা পাথর

তুলে জানোয়ারটির প্রতি এই বলে নিক্ষেপ করলোঃ হে আল্লাহ আপনার কাছে যদি যাদুকরের ধর্মের চেয়ে সাধকের ধর্ম অধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকে তবে এ পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে ফেলুন। এতে করে জনসাধারণ এর অপকার থেকে রক্ষা পাবে। পাথর নিক্ষেপের পরপরই ওর আঘাতে জানোয়ারটি মরে গেল। সুতরাং লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেল। আল্লাহ প্রেমিক সাধক এ খবর শুনে তার ঐ বালক শিষ্যকে বললেনঃ হে প্রিয় বৎস! তুমি আমার চেয়ে উত্তম। এবার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সে সব পরীক্ষা সম্মুখীন হলে আমার সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করবে না।

অতঃপর বালকটির কাছে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসতে শুরু করলো। তার দুআর বরকতে জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগলো। কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকলো এবং এছাড়া আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হতে লাগলো। বাদশাহর এক অন্ধমন্ত্রী এ খবর শুনে বহু মূল্যবান উপহার উপঢৌকনসহ বালকটির নিকট হাজির হয়ে বললেনঃ যদি তুমি আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে পার তবে এসবই তোমাকে আমি দিয়ে দিবো। বালকটি একথা শুনে বললোঃ দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি আমার নেই। একমাত্র আমার প্রতিপালক আল্লাহই তা পারেন। আপনি যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন তাহলে আমি তাঁর নিকট দুআ করতে পারি। মন্ত্রী অঙ্গীকার করলে বালক তাঁর জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলো। এতে মন্ত্রী তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে পেলেন। অতঃপর মন্ত্রী বাদশাহর দরবারে গিয়ে যথারীতি কাজ করতে শুরু করলেন। তার চক্ষু ভাল হয়ে গেছে দেখে বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ আপনার দৃষ্টিশক্তি কে দিলো? মন্ত্রী উত্তরে বললেনঃ আমার প্রভু। বাদশাহ বললোঃ হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি। মন্ত্রী বললেনঃ আপনি কেন হবেন? বরং আমার এবং আপনার প্রভু লা শারীক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ কথা শুনে বাদশাহ বললোঃ তাহলে আমি ছাড়াও আপনার কোন প্রভু আছে না কি?" মন্ত্রী জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আমার এবং আপনার উভয়েরই প্রভু ও প্রতিপালক। বাদশাহ তখন মন্ত্রীকে নানা প্রকার উৎপীড়ন এবং শাস্তি দিতে শুরু করলো এবং জিজ্ঞেস করলোঃ এ শিক্ষা আপনাকে কে দিয়েছে? মন্ত্রী তখন ঐ বালকের কথা বলে ফেললেন এবং জানালেন যে, তিনি তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাদশাহ তখন বালকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বললোঃ তুমি তো দেখছি যাদুবিদ্যায় খুবই

পারদর্শিতা **অর্জন করেছো** যে, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছ এবং দুরারোগ্য **রোগীদের আরোগ্য দান করছো?** বালক উত্তরে বললোঃ এটা ভুল কথা। আমি **কাউকেও সুস্থ করতে পারি না, যাদুও পারে না।** সুস্থতা দান একমাত্র আল্লাহ্ই করে থাকেন। বাদশাহ বললোঃ অর্থাৎ আমি। কারণ সবকিছুই তো আমিই করে থাকি। বালক বললোঃ না, না, এটা কখনই নয়। বাদশাহ বললোঃ তাহলে কি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু বলে স্বীকার কর? বালক উত্তরে বললোঃ হ্যাঁ, আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নয়। বাদশাহ্ তখন বালককে নানা প্রকার শাস্তি দিতে শুরু করলো। বালকটি অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধক সাহেবের নাম বলে দিলো। বাদশাহ্ সাধককে বললোঃ তুমি এ ধর্মত্যাগ কর। সাধক অস্বীকার করলেন। তখন বাদশাহ্ তাঁকে করাত দ্বারা ফেড়ে দু'টুকরা করে দিলো। এরপর বাদশাহ্ বালকটিকে বললোঃ তুমি সাধকের প্রদর্শিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ কর। বালক অস্বীকৃতি জানালো। বাদশাহ্ তখন তার কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দিলোঃ এ বালককে তোমরা অমুক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও। অতঃপর তাকে সাধকের প্রদর্শিত ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে দিতে বলো। যদি মেনে নেয় তবে তো ভাল কথা। অন্যথায় তাকে সেখান হতে গড়িয়ে নীচে ফেলে দাও। সৈন্যরা বাদশাহ্র নির্দেশমত বালকটিকে পর্বত চূড়ায় নিয়ে গেল এবং তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বললো। বালক অস্বীকার করলে তারা তাকে ঐ পর্বত চূড়া হতে ফেলে দিতে উদ্যত হলো। তখন বালক আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলোঃ হে আল্লাহ! যেভাবেই হোক আপনি আমাকে রক্ষা করুণ! এ প্রার্থনার সাথে সাথেই পাহাড় কেঁপে উঠলো এবং ঐ সৈন্য গুলো গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। বালকটিকে আল্লাহ্ রক্ষা করলেন সে তখন আনন্দিত চিত্তে ঐ যালিম বাদশাহ্র নিকট পৌঁছলো বাদশাহ্ বিস্মিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ ব্যাপার কি? আমার সৈন্যরা কোথায়? বালকটি জবাবে বললোঃ আমার আল্লাহ্ আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। বাদশাহ্ তখন অন্য কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে বললোঃ নৌকায় বসিয়ে তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাও, তারপর তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এসো। সৈন্যরা বালককে নিয়ে চললো এবং সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নৌকা হতে ফেলে দিতে উদ্যত হলো। বালক সেখানেও মহান আল্লাহ্র নিকট ঐ একই প্রার্থনা জানালো। সাথে সাথে সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ উঠলো এবং সমস্ত নৈস্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো। বালক নিরাপদে তীরে উঠলো। এবং বাদশাহ্র দরবারে হাজির হয়ে বললোঃ আমার আল্লাহ্ আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর কবল হতে রক্ষা করেছেন। হে বাদশাহ! আপনি

যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ আমি যে পদ্ধতি বলি সেভাবে চেষ্টা করলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বাদশাহ বললোঃ কি করতে হবে? বালক উত্তরে বললোঃ সকল মানুষকে একটি ময়দানে সমবেত করুন। তারপর খেজুর কাণ্ডের মাথায় শূল উঠিয়ে দিন। অতঃপর আমার তূণ হতে একটি তীর বের করে আমার প্রতি সেই তীর নিক্ষেপ করার সময় নিম্নের বাক্যটি পাঠ করুনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هٰذَا الْغُلَامِ অর্থাৎ "আল্লার নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের প্রতিপালক।" তাহলে সেই তীর আমার দেহে বিদ্ধ হবে এবং আমি মারা যাবো।

বাদশাহ তাই করলো। তীর বালকের কানপট্টিতে বিদ্ধ হলো এবং সেখানে হাত চাপা দিলো ও শাহাদাত বরণ করলো। সে শহীদ হওয়ার সাথে সমবেত জনতা ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করলো। সবাই সমবেত কণ্ঠেধ্বণি তুললোঃ আমরা এই বালকের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ সভাষদবর্গ ভীত সনত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং বাদশাহকে বললোঃ আমরা তো এই বালকের ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না, সব মানুষই তার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করলো! আমরা তার ধর্মের প্রসার লাভের আশংকায় তাকে হত্যা করলাম, অথচ হিতে বিপরীত ঘটলো। আমরা যা আশংকা করছিলাম তাই ঘটে গেল। সবাই যে মুসলমান হয়ে গেল! এখন কি করা যায়?

বাদশাহ তখন তার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দিলোঃ সকল মহল্লায় ও রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় খন্দক খনন করো এবং ওগুলোতে জ্বালানিকাষ্ঠ ভর্তি করে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও। যারা ধর্ম ত্যাগ করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে এই ধর্মে বিশ্বাসী সকলকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। বাদশাহর এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হলো। মুসলমানদের সবাই অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। একজন নারী কোলে শিশু নিয়ে একটি খন্দকের প্রতি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ঐ অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফুটে উঠলো। সে বললোঃ মা! কি করছেন? আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং ধৈর্য্যের সাথে নিশ্চিন্তে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।[১]

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের শেষ দিকেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। সুনানে নাসাঈতেও কিছুটা সংক্ষেপে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

জামে তিরমিযীতে হযরত সুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) প্রতিদিন আসরের নামাযের পর সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু বলতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজকে আপনি কি বলছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ নবীদের মধ্যে একজন নবী ছিলেন যিনি তাঁর উম্মতের উপর গর্ব করতেন। তিনি বলতেন যে, তাদের দেখাশোনা কে করবে? আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর কাছে অহী পাঠালেনঃ আমি নিজেই তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো অথবা তাদের উপর তাদের শত্রুদেরকে জয়যুক্ত করবো, এ দুটোর যে কোন একটি পছন্দ করার তাদের ইখতিয়ার বা অধিকার রয়েছে। তারা আল্লাহর প্রতিশোধকেই পছন্দ করলো। তখন একদিনেই তাদের সত্তর জন মারা গেল। এই ঘটনাটি ব্যক্ত করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর মহানবী (সঃ) قُتِلَ হতে مَجِيْد পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।

যুবক শহীদকে দাফন করা হলো। হযরত উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের আমলে তাঁর কবর থেকে তাঁকে বের করা হয়েছিল। তখন দেখা যায়, তাঁর আঙ্গুলী তাঁর কান পট্টিতে লাগানো আছে। এ অবস্থায়ই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) এ ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে নাজরানের অধিবাসীরা মূর্তিপূজক মুশরিক ছিল। নাজরানের পাশে একটি ছোট গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে এক যাদুকর বাস করতো। সে নাজরানের অধিবাসীদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিতো। একজন বুযুর্গ আলেম সেখানে এসে নাজরান এবং সেই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে আস্তানা গাড়েন। শহরের লোকেরা ঐ যাদুকরের কাছে যাদুবিদ্যা শিখতো যেতো। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ নামক একটি বালকও ছিল। যাদুকরের কাছে যাওয়া আসার পথে সেই ঐ বুযুর্গ আলেমের আস্তানায় তাঁর নামায এবং অন্যান্য ইবাদত দেখার সুযোগ পায়। ক্রমে ক্রমে সে আলেমের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারপর বালকটি আলেমের আস্তানায় যাওয়া আসা করতো এবং তাঁর কাছে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতো। কিছুদিন পর সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং ইসলাম সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করলো। ঐ আলেম ইসমে আযমও জানতেন। বালক তাঁর কাছে ইসমে আযম শিখতে চাইলো। তখন আলেম তাকে বললেনঃ তুমি এখনো এর যোগ্য হওনি, তোমার মন এখনো দুর্বল এই বালক আবদুল্লাহর পিতা নামির তার এই পুত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের খবর জানতো না। সে ভাবছিল যে, তার পুত্র যাদুবিদ্যা শিক্ষা করছে এবং সেখানেই যাওয়া আসা করছে।

আবদুল্লাহ যখন দেখলো যে, তার গুরু তাকে ইসমে আযম শিখাতে চান না এবং তার দুর্বলতার ভয় করছেন তখন সে তার তীরগুলো বের করলো এবং আল্লাহ তা'আলার যতগুলো নাম তার জানা ছিল, প্রত্যেকটি তীরে একটি একটি করে নাম সে লিখলো। তারপর আগুন জ্বালিয়ে একটি করে তীর আগুনে ফেলতে লাগলো। যে তীরে ইসমে আযম লিখা ছিল ঐ তীরটি আগুনে ফেলামাত্রই ওটা লাফিয়ে উঠে আগুন হতে বেরিয়ে পড়লো। ঐ তীরের উপর আগুনের ক্রিয়া হলো না। এ দেখে সে বুঝতে পারলো যে, এটাই ইসমে আযম। তখন সে তার গুরুর কাছে গিয়ে বললোঃ আমি ইসমে আযম শিখে ফেলেছি। গুরু জিজ্ঞেস করলেনঃ কিভাবে? আবদুল্লাহ তখন তীরের পরীক্ষার ঘটনাটি জানালো। গুরু একথা শুনে বললেনঃ ঠিকই বলছো তুমি, এটাই ইসমে আযম। তবে এটা তুমি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখো। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে যে, তুমি এটা প্রকাশ করে দিবে।

নাজরানে গিয়ে আবদুল্লাহ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, অসুস্থ যাকেই দেখলো তাকেই বলতে শুরু করলোঃ যদি তুমি আমার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে আমি তোমার আরোগ্যের জন্যে তাঁর কাছে দুআ করবো। রোগী সে কথা মেনে নিতো, আর আবদুল্লাহ ইসমে আযমের মাধ্যমে তাকে রোগমুক্ত করে তুলতো। দেখতে দেখতে নাজরানের বহু সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করলো। অবশেষে বাদশাহর কানেও ঐ খবর পৌঁছে গেল। সে আবদুল্লাহকে ডেকে পাঠিয়ে ধমক দিয়ে বললোঃ তুমি আমার প্রজাদেরকে বিভ্রান্ত করছো, আমার এবং আমার পিতা পিতামহের ধর্মের উপর আঘাত হেনেছো। তোমার হাত পা কেটে আমি তোমাকে খোঁড়া করে দিবো। আবদুল্লাহ ইবনে না'মির একথা শুনে বললোঃ আপনার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তারপর বাদশাহ তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে গড়িয়ে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু আবদুল্লাহ নিরাপদে ও সুস্থভাবে ফিরে এলো, তার দেহের কোন জায়গায় আঘাতের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। অতঃপর তাকে নাজরানের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করা হলো সেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসতে পারে না। কিন্তু আবদুল্লাহ সেখান থেকেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ফিরে এলো। বাদশাহর সকল কৌশল ব্যর্থ হবার পর আবদুল্লাহ তাকে বললোঃ "হে বাদশাহ! আপনি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন না যে পর্যন্ত না আমার ধর্মের উপর বিশ্বাস করেন এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে শুরু করেন। যদি তা করেন তবেই আমাকে হত্যা

করতে সক্ষম হবেন। বাদশাহ তখন আবদুল্লাহর ধর্মের বিশ্বাস করলো এবং আবদুল্লাহর বলে দেয়া কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর তার হাতের কাঠের ছড়িটি দিয়ে আবদুল্লাহকে আঘাত করলো। সেই আঘাতের ফলেই আবদুল্লাহ শাহাদাত বরণ করলো। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে নিজের বিশেষ রহমত দান করুন।

অতঃপর বাদশাহও মৃত্যুবরণ করলো। এ ঘটনা জনগনের মনে এ ধারনা বদ্ধমূল করে দিলো যে, আবদুল্লাহর ধর্ম সত্য। ফলে নাজরানের অধিবাসীরা সবাই মুসলমান হয়ে গেল। এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্য দ্বীনে বিশ্বাস স্থাপন করলো। ঐ সময় হযরত ঈসা (আঃ)-এর ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তখনো নবী হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেননি। কিছুকাল পর তাদের মধ্যে বিদআতের প্রসার ঘটে এবং সত্য দ্বীনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। নাজরানের খ্রিষ্টান ধর্ম প্রসারের এটাও ছিল একটা কারণ। এক সময় যুনুওয়াস নামক এক ইয়াহূদী সৈন্যদল নিয়ে সেই খ্রিষ্টানদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের উপর জয়যুক্ত হয়। সে তখন নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের বলেঃ তোমরা ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা তখন মৃত্যুর শাস্তি গ্রহণ করতে সম্মত হলো, কিন্তু ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হলো না। যুনুওয়াস তখন খন্দক খনন করে ওর মধ্যে কাষ্ঠ ভরে দিলো, অতঃপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। তারপর তাদেরকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো। কিছু লোককে স্বাভাবিকভাবেই হত্যা করা হলো। আর কারো কারো হাত পা, নাক কান কেটে নিলো। এ নরপিশাচ প্রায় বিশ হাজার লোককে হত্যা করলো।

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। যুনুওয়াসের নাম ছিল যারআহ এবং তার শাসনামলে তাকে ইউসুফও বলা হতো। তার পিতার নাম ছিল বায়ান আসআদ আবী কুরাইব। সে তুব্বা ছিল। সে মদীনায় যুদ্ধ করে এবং কাবা শরীফের উপর গেলাফ উঠায়। তার সাথে দুইজন ইয়াহূদী আলেম ছিলেন। ইয়ামনবাসী তাঁদের হাতে ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। যুনুওয়াস একদিনে সকালেই বিশ হাজার মুমিনকে হত্যা করেছিল। তাঁদের মধ্যে শুধু একমাত্র একজন লোক রক্ষা পেয়েছিলেন যাঁর নাম ছিল দাউস যুসালাবান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে রোমে পালিয়ে যান। তাঁরও পশ্চাদ্বাবন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি সরাসরি রোমক

সম্রাট কায়সারের নিকট পৌঁছেন। তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র লিখেন। দাউস সেখান হতে আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামনে আসেন। এ সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আরবাত ও আবরাহা। ইয়াহূদীরা পরাজিত হয় এবং ইয়ামন ইয়াহূদীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। যুনুওয়াস পালিয়ে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে মারা যায়। তারপর দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ইয়ামনে খ্রিস্টান শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর সাইফইবনুযী ইয়াযন হুমাইরী পারস্যের বাদশাহর নিকট থেকে প্রায় সাতশ' সহায়কবাহিনী নিয়ে ইয়ামনের উপর আক্রমণ চালান এবং জয়লাভ করেন। অতঃপর ইয়ামনে হিমারীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কিছু বর্ণনা সূরা 'ফীল' এর তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সীরাতে ইবনে ইসহাকে আছে যে, এক নাজরানবাসী হযরত উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের আমলে এক খণ্ড অনাবাদী জমি কোন কাজের জন্যে খনন করে। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে নামির (রঃ)-এর মৃত্যুদেহ দেখা যায়। তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন এবং মাথার যে জায়গায় আঘাত লেগেছিল। সেখানে তাঁর হাত রয়েছে। হাত সরিয়ে দিলে রক্ত বইতে শুরু করে এবং হাত ছেড়ে দিলে তা নিজ জায়গায় চলে যায় এবং রক্তপ্রবাহ্ বন্ধ হয়ে যায়। হাতের একটি আঙ্গুলে আংটি রয়েছে। তাতে লিখা রয়েছেঃ رَبِّیَ اللّٰهُ অর্থাৎ 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ।" হযরত উমার (রাঃ)কে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি ফরমান জারী করেনঃ তাঁকে সেই অবস্থাতেই থাকতে দাও। এবং মাটি ইত্যাদি যা কিছু সরানো হয়েছে সেসব চাপা দিয়ে দাও। তারপর কোন রূপ চিহ্ন না রেখে কবর সমান করে দাও। তাঁর এ ফরমান পালন করা হয়।

ইবনে আবিদ দুনিয়া লিখেছেনঃ হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) ইসবাহান জয় করার পর একটা দেয়াল ভেঙ্গে পড়া দেখে ঐ দেয়ালটি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী দেয়ালটি নির্মাণ করে দেয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধ্বসে পড়ে। পুনরায় নির্মাণ করা হয় এবং এবারও ধ্বসে পড়ে। অবশেষে জানা যায় যে, দেয়ালের নীচে একজন পূণ্যাত্মা সমাধিস্থ রয়েছেন। মাটি খননের পর দেখা যায় যে, একটি মৃতদেহ দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে এবং ঐ মৃতদেহের সাথে একখানা তরবারী দেখা যায়। তরবারীর উপর লিখিত রয়েছেঃ আমি হারিস ইবনে মাযায। আমি কুণ্ডের অধিপতিদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)ঐ মৃতদেহ বের করে নেন এবং সেখানে দেয়াল নির্মান করে দেন। পরে তা অটুট থাকে।

এ হারিস ইবনে মাযায ইবনে আমর জুরহুমী কাবাগৃহের মোতাওয়াল্লী ছিলেন। সাবিত ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমের সন্তানদের পর আমর ইবনে হারিস ইবনে মাযায মক্কায় জুরহুম বংশের শেষ নরপতি ছিলেন। খুযাআহ গোত্র তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইয়ামনে নির্বাসন দেয়। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি আরবীতে প্রথম কবিতা রচনা করেন।

এটা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর সময়ের কিছুকাল পরের ঘটনা এবং এটা খুবই প্রাচীনকালের ঘটনা। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রায় পাঁচ শ বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর এক দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্বে ঘটেছিল। এটাই সঠিক বলে মনে হয়। তবে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন আর এমনও হতে পারে যে, এরকম ঘটনা পৃথিবীতে একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। যেমন ইমাম ইবনে আবী হাতিমের (রঃ) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ তুব্বাদের সময়ে ইয়ামনে খন্দক খনন করা হয়েছিল। এবং কনষ্ট্যানটাইনের সময়ে কনষ্ট্যান্টি নোপলেও মুসলমানদেরকে একই রকম শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

খ্রিষ্টানরা যখন নিজেদের কিবলা পরিবর্তন করে নেয়, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ধর্মমতে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটায়, তাওহীদের বিশ্বাস ছেড়ে দেয় তখন খাঁটি ধর্মপ্রাণ লোকেরা তাদের সাথে সহযোগিতা করা ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে সত্যিকার ধর্ম ইসলামের প্রতি অটল রাখে। ফলে ঐ অত্যাচারীর দল খন্দকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করে। একই ঘটনা ইরাকের বা'বেলের মাটিতে বখত নাসরের সময়েও সংঘটিত হয়েছিল। বখতনাসর একটি মূর্তি তৈরী করে জনগণের দ্বারা সেই মূর্তিকে সিজদা করাতো। হযরত দানিয়াল (আঃ) ও তাঁর দুজন সহচর আযরিয়া ও মীসাঈল তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে বখত নাসর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদেরকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত পরিখায় নিক্ষেপ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের প্রতি আগুনকে শীতল করে দেন এবং তাঁদেরকে শান্তি দান করেন, অবশেষে নাজাত দেন।, তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সেই হঠকারী কাফিরদেরকে তাদেরই প্রজ্জ্বলিত পরিখার আগুনে ফেলে দেন। এরা নয়টি গোত্র ছিল। সবাই জ্বলে পুড়ে জাহান্নামে চলে যায়।

সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ ইরাক, সিরিয়া এবং ইয়ামন এ তিন জায়গায় এ ঘটনা ঘটেছিল। মুকাতিল (রঃ) বলেনঃ পরিখা তিন জায়গায় ছিলঃ ইয়ামনের নাজরান শহরে, সিরিয়ায় ও পারস্যে। সিরিয়ায় পরিখার নির্মাতা ছিল আনতানালুস ওরূমী, পারস্যে বখত নাসর, আরবে ছিল ইউসুফ যুনুওয়াস। সিরিয়া এবং পারস্যের পরিখার কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। এখানে নাজরানের পরিখার কথাই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

হযরত রাবী ইবনে আনাস (রঃ) বলেনঃ আমরা শুনেছি সে ফাৎরাতের সময়ে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এবং শেষ নবী (সঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে একটি সম্প্রদায় ছিল তারা যখন দেখলো যে, জনগণ ফিৎনা ফাসাদ এবং অন্যায় অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে ও দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তখন সেই সম্প্রদায় তাদের সংশ্রব ত্যাগ করলো। তারপর পৃথক এক জায়গায় হিজরত করে সেখানে বসবাস করতে লাগলো এবং আল্লাহর ইবাদতে একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করলো। তারা নামায রোযার পাবন্দী করতে লাগলো ও যাকাত আদায় করতে লাগলো। এক হঠকারী বেঈমান বাদশাহ এই সম্প্রদায়ের সন্ধান পেয়ে তাদের কাছে নিজের দূত পাঠিয়ে তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলো যে, তারা যেন তাদের দলে শামিল হয়ে মূর্তিপূজা করে। সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ওটা সরাসরি অস্বীকার করলো এবং জানিয়ে দিলো যে, লা শারীক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত বন্দেগী করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাদশাহ আবার তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিলো যে, যদি তারা তার আদেশ অমান্য করে তবে তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে। তারা বাদশাহকে জানিয়ে দিলোঃ আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন, আমরা আমাদের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করতে পারবো না।

ঐ বাদশাহ তখন পরিখা খনন করিয়ে তাতে জ্বালানী ভর্তি করলো ও আগুন ধরিয়ে দিলো। তারপর ঐ সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ সবাইকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড় করিয়ে বললোঃ তোমরা এখনো তোমাদের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ কর, অন্যথায় তোমাদেরকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। এটা তোমাদের প্রতি আমার শেষ নির্দেশ। বাদশাহর একথা শুনে সম্প্রদায়ের লোকেরা বললোঃ আমরা আগুনে জ্বলতে সম্মত আছি, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করতে সম্মত নই। ছোটছোট শিশু কিশোরেরা চীৎকার করতে শুরু করলো, পরে তাদেরকে বুঝালো ও বললোঃ আজকের পরে আর আগুন থাকবে না, সুতরাং আল্লাহর নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। অতঃপর সবাই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু

আগুনের আঁচ লাগার পূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাদের রূহ কবজ করে নিলেন। সেই পরিখার আগুন তখন পরিখা হতে বেরিয়ে এসে ঐ বেঈমান হঠকারী দুর্বৃত্ত বাদশাহও তার সাঙ্গ পাঙ্গদেরকে ঘিরে ধরলো এবং তাদের সবাইকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলো।

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে فَتَنُوْا শব্দের অর্থ হলোঃ জ্বালিয়ে দেয়া। এখানে বলা হচ্ছেঃ ঐ সব লোক মুসলমান নারী পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। যদি তারা তাওবা না করে অর্থাৎ দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, নিজেদের কৃতকর্মে লজ্জিত না হয় তবে তাদের জন্যে জাহান্নাম অবধারিত। জ্বলে পুড়ে কষ্ট পাওয়ার শাস্তি নিশ্চিত। এতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের যথাযথ শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, মেহেরবানী ও দয়ার অবস্থা দেখুন যে যেই দুষ্কৃতিকারী, পাপী ও হঠকারীরা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তিনি তাদেরকেও তাওবা করতে বলছেন এবং তাদের প্রতি মার্জনা, মাগফিরাত ও রহমত প্রদানের অঙ্গীকার করছেন।

১১। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যেই আছে স্বর্গোদ্যান যার নিম্নে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত; এটাই সুমহান সফলতা।	١١- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ○
১২। তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।	١٢- اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ○
১৩। তিনিই অস্তিত্বদান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,	١٣- اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ○
১৪। এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়।	١٤- وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ○
১৫। আরশের অধিপতি মহিমময়।	١٥- ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ○

١٦- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ○

১৬। (ইচ্ছাময় তিনি) যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

١٧- هَلْ اَتٰكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ○

১৭। তোমার নিকট কি সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?

١٨- فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ○

১৮। ফিরাউন ও সামূদের?

١٩- بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ○

১৯। তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত,

٢٠- وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيطٌ ○

২০। এবং আল্লাহ তাদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

٢١- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيدٌ ○

২১। এটা কুরআন,

٢٢- فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ○

২২। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা নিজ শত্রুদের পরিণাম বর্ণনা করার পর তাঁর বন্ধুদের পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ তাদের জন্যে বেহেশত রয়েছে তার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে। তাদের মত সফলতা আর কে লাভ করতে পারে? এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমার প্রতিপালকের মারা বা শাস্তি বড়ই কঠিন। তাঁর যে সব শত্রু তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয় তাদেরকে তিনি ব্যাপক শক্তির সাথে পাকড়াও করবেন, যে পাকড়াও থেকে মুক্তির কোন পথ তাঁরা খুঁজে পাবে না। তিনি বড়ই শক্তিশালী। তিনি যা চান তাই করেন। যা কিছু করার তাঁর ইচ্ছা হয় এক নিমেষের মধ্যে তা করে ফেলেন। তার কুদরত বা শক্তি এমনই যে, তিনি মানুষকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তারপর মৃত্যুমুখে পতিত করার পর পুনরায় জীবিত করবেন। পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারবে না, তাঁর সামনেও কেউ আসতে পারবে না।

তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন, তবে শর্ত হলো যে, তাদেরকে তাঁর কাছে বিনীতভাবে তাওবা করতে হবে। তাহলে যত বড় পাপ বা অন্যায় হোক না কেন তিনি তা মার্জনা করে দিবেন।

তিনি **ক্ষমাশীল ও প্রেমময়**। স্বীয় বান্দাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল। **তিনি আরশের মালিক**, সেই আরশ সারা মাখলুকাত অপেক্ষা উচ্চতর এবং সকল **মাখলুক তথা সৃষ্টির** উপরে অবস্থিত।

مَجِيْدُ শব্দের দুটি কিরআত রয়েছে। একটি কিরআতে 'মীম' এর উপর যবর দিয়ে অর্থাৎ مَجِيْدُ এবং অপর কিরআতের 'মীম' এর উপর পেশ দিয়ে অর্থাৎ مُجِيْدُ রয়েছে। مُجِيْدُ উচ্চারণ করলে তাতে আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে। আর مَجِيْدُ উচ্চারণ করলে প্রকাশ পাবে আরশের গুণ বৈশিষ্ট্য। উভয় কিরআতই নির্ভুল ও বিশুদ্ধ।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যে কোন কাজ যখন ইচ্ছা করতে পারেন, করার ক্ষমতা রাখেন। শ্রেষ্ঠত্ব, সুবিচার এবং নৈপুণ্যের ভিত্তিতে কেউ তাঁকে বাধা দেয়ার বা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা রাখেন না।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) যে রোগে মৃত্যুবরণ করেন ঐ রোগের সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা করেছেন কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, করেছেন।" জনগণ তখন তাঁকে বললেনঃ "চিকিৎসক আপনাকে (রোগের ব্যাপারে) কি বলেছেন?" তিনি জবাব দিলেনঃ "চিকিৎসক বলেছেনঃ اِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ "আমি যা ইচ্ছা করি তা-ই করে থাকি।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (হে নবী (সঃ)! তোমার নিকট কি ফিরাউন ও সামুদের সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? এমন কেউ ছিল না যে সেই শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে, তাদেরকে সাহায্য করতে পারে বা শাস্তি প্রত্যাহার করাতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও খুবই কঠিন। যখন তিনি কোন পাপী, অত্যাচারী, দুষ্কৃতিকারী ও দুর্বৃত্তকে পাকড়াও করেন তখন অত্যন্ত ভয়াবহভাবেই পাকড়াও করে থাকেন।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সঃ) কোথাও গমন করছিলেন এমন সময় তিনি শুনতে পান যে, একটি মহিলা هَلْ اَتٰـكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ এ আয়াতটি পাঠ করছেন। তিনি তখন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কান লাগিয়ে শুনতে লাগলেন। অতঃপর বললেনঃ نَعَمْ قَدْ جَاءَنِىْ অর্থাৎ হ্যাঁ এ খবর এসেছে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত। অর্থাৎ তারা সন্দেহ, কুফরী এবং হঠকারিতায় রত রয়েছে।

আর আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বিজয়ী ও শক্তিমান। তারা তাঁর নিকট হতে কোথাও আত্মগোপন করতে পারে না। অথবা তাঁকে পরাজিত করতে পারে না।

কুরআন কারীম সম্মান ও কারামত সম্পন্ন। তা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছে, কুরআন হ্রাস বৃদ্ধি হতে মুক্ত। এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, এই লাওহে মাহফুয হযরত ইসরাফীল (আঃ)-এর ললাটের উপর রয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে সালমান (রঃ) বলেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তা সবই লাওহে মাহফূযে মওজুদ রয়েছে এবং লাওহে মাহফুয হযরত ইসরাফীল (আঃ)-এর দু'চোখের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তা দেখতে পারেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লাওহে মাহফুযের কেন্দ্রস্থলে লিখিত রয়েছেঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনি এক, একক। তার দ্বীন ইসলাম, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, তাঁর অঙ্গীকারসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।

এ লাওহে মাহফুয সাদা মুক্তা দিয়ে নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য আসমান জমীনের মধ্যবর্তী স্থানের সমান। এর প্রস্থ মাশরিকও মাগরিবের মধ্যবর্তী জায়গার সমান। এর উভয় দিক মুক্তা এবং ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। এর কলম নূরের তৈরী। এর কালাম আরশের সাথে সম্পৃক্ত। এর মূল ফেরেশতাদের ক্রোড়ে অবস্থিত। মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, এ কুরআন আরশের ডানদিকে বিদ্যমান। তিবরানীর (রঃ) হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজকে সাদা মুক্তা দ্বারা নির্মান করেছেন। এর পাতা লাল ইয়াকূতের এর কলম নূরের, এর মধ্যকার লিখাও নূরের আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ তিনশ ষাটবার করে আরশকে দেখে থাকেন। তিনি সৃষ্টি করেন রিযক দেন, মৃত্যু ঘটান, জীবন দান করেন, সম্মান দেন, অপমানিত করেন এবং যা চান তাই করে থাকেন।

সূরা ঃ বুরূজ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ তা-রিক, মাক্কী

(আয়াত ঃ ১৭, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٧، رُكُوْعُهَا : ١)

আবু হাবল উদওয়ানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাকীফ গোত্রের পূর্ব প্রান্তে ধনুকের উপর অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এই সূরাটি সম্পূর্ণ পাঠ করতে শুনেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সেখানে তাদের নিকট সাহায্যের জন্যে গিয়েছিলেন। হযরত আবু হাবল উদওয়ানী (রাঃ) সূরাটি মুখস্থ করে নেন। ঐ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সাকীফ গোত্রের মুশরিকদেরকে তিনি সূরাটি পাঠ করে শুনান। তারা এটা শুনে বললোঃ "যদি আমরা তাঁর কথা সত্য বলে জানতাম বা বিশ্বাস করতাম তবে তো আমরা তার আনুগত্যই করতাম।"

সুনানে নাসাঈতে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআয (রাঃ) মাগরিবের নামাযে সূরা বাকারাহ্ ও সূরা নিসা পাঠ করেন। তখন নবী করীম (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে মুআ'য (রাঃ)! তুমি (জনগণকে) ফিৎনায় ফেলবে?

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ـ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এবং এ ধরনের (ছোট ছোট) সূরা পাঠ করাই কি তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল না?"

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার;	١- وَالسَّمَاۤءِ وَالطَّارِقِ ۙ○
২। তুমি কী জান রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কি?	٢- وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ○
৩। ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!	٣- النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ○
৪। প্রত্যেক জীবের উপরই সংরক্ষক রয়েছে।	٤- اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ؕ○
৫। সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।!	٥- فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ؕ○

৬। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে,	٦- خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ ○
৭। এটা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে।	٧- يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ○ ط
৮। নিশ্চয় তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান।	٨- اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ○ ط
৯। যেই দিন গোপন বিষয় সমূহ প্রকাশিত হবে	٩- يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۙ ○
১০। সেই দিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।	١٠- فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ○ ط

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশ এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজির শপথ করছেন। طَارِق এর তাফসীর করা হয়েছে চমকিত তারকা বা নক্ষত্র। কারণ এই নক্ষত্র দিনের বেলায় লুকায়িত থাকে এবং রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে। একটি সহীহ্ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "কেউ যেন রাত্রিকালে তার নিজের বাড়ীতে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ না করে।"

এখানেও طُرُوْق শব্দ রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে এ শব্দটি দুআ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

ثَاقِب বলা হয় চমকিত আলোকপিণ্ডকে যা শয়তানের উপর নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। প্রত্যেক লোকের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে একজন হিফাযতকারী নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "তার সামনে-পিছনে পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তার হিফাযত করে থাকে।"(১৩ ঃ ১১)

এরপর মানুষের দুর্বলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ মানুষের এটা চিন্তা করা উচিত যে, তাকে কি জনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছেঃ তাদের সৃষ্টির মূল কি? এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে কিয়ামতের নিশ্চয়তা দেয়া

হয়েছে। বলা হয়েছেঃ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি কেন পুনরুত্থানে সক্ষম হবেন না? যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ "যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনরুত্থান ঘটাবেন এবং এটা তার জন্যে খুবই সহজ।" (৩০ ঃ ২৭)

মানুষ সবেগে স্খলিত পানি অর্থাৎ নারী-পুরুষের বীর্যদ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। এই বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে এবং নারীর বক্ষদেশ হতে স্খলিত হয়। নারীদের এই বীর্য হলুদ রঙের এবং পাতলা হয়ে থাকে। উভয়ের বীর্যের সংমিশ্রণে শিশুর জন্ম হয়।

হার পরার জায়গাকে তারীবা' বলা হয়। কাঁধ থেকে নিয়ে বুক পর্যন্ত জায়গাকেও তারীবা বলা হয়ে থাকে। কণ্ঠনালী হতে বুক পর্যন্ত জায়গাকেও কেউ কেউ তারীবা' বলেছেন। বুক থেকে নিয়ে উপরের অংশকেও তারীবা' বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, নীচের দিকের চারটি পঞ্জরকে তারীবা' বলা হয়। কেউ কেউ আবার উভয় স্তনের মধ্যবর্তী স্থানকেও তারীবা' বলেছেন। এ কথাও বলা হয়েছে যে, পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকে تَرِيبَةٌ বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ (নিশ্চয় তিনি তার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান)। এতে দুটি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হলোঃ বের হওয়া পানি বা বীর্যকে তিনি ওর জায়গায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। এটা মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনের উক্তি। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে আখেরাতের দিকে প্রত্যাবৃত্ত করতেও তিনি ক্ষমতাবান। এটা হযরত যহ্হাক (রঃ)-এর উক্তি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। কেননা, দলীল হিসেবে এটা কুরআন কারীমের মধ্যে কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন গোপন বিষয়সমূহ খুলে যাবে, রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং লুকায়িত সবকিছুই বের হয়ে যাবে।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক গাদ্দার-বিশ্বাসঘাতকের নিতম্বের নিকট

তার বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা প্রোথিত করা হবে এবং ঘোষণা করা হবেঃ "এই ব্যক্তি হলো অমুকের পুত্র অমুক গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাৎকারী।"

সেই দিন মানুষ নিজেও কোন শক্তি লাভ করবে না এবং তার সাহায্যের জন্যে অন্য কেউও এগিয়ে আসবে না। অর্থাৎ নিজেকে নিজেও আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং অন্য কেউও তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

১১। শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি,	١١- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ○ لا
১২। এবং শপথ যমীনের যা বিদীর্ণ হয়,	١٢- وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ○ لا
১৩। নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।	١٣- اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ○ لا
১৪। এবং এটা নিরর্থক নয়।	١٤- وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ○ ط
১৫। তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে।	١٥- اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ○ لا
১৬। আর আমিও ভীষণ কৌশল করি।	١٦- وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ○ صلے
১৭। অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্যে।	١٧- فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ○ ع

رَجْعٌ শব্দের অর্থ হলো বৃষ্টি ধারা, বৃষ্টি রয়েছে যেই মেঘে সেই মেঘ। এই বাদলের মাধ্যমে প্রতিবছর বান্দাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। যেই রিয্‌ক ছাড়া ওরা এবং ওদের পশুগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হতো। সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহের এদিক ওদিক প্রত্যাবর্তন অর্থেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

জমীন ফেটে যায়। শস্য দানা, ঘাস, তৃণ বের হয়। এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী। ন্যায় বিচারের কথা এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিরর্থক ও বাজে কথা সম্বলিত কোন কিস্‌সা-কাহিনী এটা নয়। কাফিররা এই কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে

ফিরিয়ে রাখে। নানারকম ধোকা, প্রতারণা এবং ফেরেকবাযীর মাধ্যমে **লোকদেরকে** কুরআনের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এই কাফিরদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও। তারপর দেখবে যে, অচিরেই তারা নিকৃষ্টতম আযাবের শিকার হবে। যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ -

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে সামান্য সুখ ভোগ করাবো, অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো।" (৩১ঃ ২৪)

সূরা ঃ তা-রিক এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ আ'লা মাক্কী

(আয়াত ঃ ১৯, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعُهَا : ١)

এ সূরাটি যে মক্কী সূরা তার প্রমাণ এই যে, হযরত বারা' ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "নবী করীম (সঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা সর্ব প্রথম আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন তাঁরা হলেন হযরত মুসআ'ব ইবনে উমায়ের (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উম্মি মাকতূম (রাঃ)। তাঁরা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে শুরু করেন। অতঃপর হযরত বিলাল (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ) এবং হযরত সা'দ (রাঃ) আগমন করেন। তারপর হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বিশজন সাহাবী সমভিব্যাহারে আমাদের কছে আসেন। তারপর নবী করীম (সঃ) আসেন। আমি মদিনাবাসীকে অন্য কোন ব্যাপারে এতো বেশী খুশী হতে দেখিনি যতোটা খুশী তাঁরা নবী (সঃ) এবং তাঁর সহচরদের আগমনে হয়েছিলেন। ছোট ছোট শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকরা পর্যন্ত আনন্দে কোলাহল শুরু করে যে, ইনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আগমনের পূর্বেই আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى সূরাটি, এ ধরনের অন্যান্য সূরাগুলোর সাথে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম।"

মুসনাদে আহমদে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এই সূরাটিকে খুবই ভালবাসতেন।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত মুআ'য (রাঃ)-কে বলেনঃ "কেন তুমি নামাযে وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এই সূরাগুলো পড় না?" মুসনাদে আহমদে আরও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) উভয় ঈদের নামাযে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং هَلْ اَتٰـكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ এ সূরা দুটি পাঠ করতেন। যদি ঘটনাক্রমে একই দিনে জুমআ ও ঈদের নামায পড়ে যেতো তবে তিনি উভয় নামাযেই এই সূরা দু'টি পড়তেন।[১]

---

[১] এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম, সুনানে আবী দাউদ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী এবং সুনানে ইবনে মাজাহ্তেও বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আহমদে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বেতরের নামাযে قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরাগুলো পাঠ করতেন। অন্য একটি বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এই সূরা দু'টিও পড়তেন।[২]

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,	١- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ○ لا
২। যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন,	٢- الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ○ صلے لا
৩। এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন,	٣- وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ○ صلے لا
৪। এবং যিনি তৃণাদি সমুদিত করেছেন	٤- وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ○ صلے لا
৫। পরে ওকে বিশুষ্ক বিমলিন করেছেন।	٥- فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ○ ط
৬। অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না,	٦- سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى ○ لا
৭। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।	٧- اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ○ ط
৮। আমি তোমার জন্যে কল্যাণের পথকে সহজ করে দিবো।	٨- وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ○ صلے ج

---

[২] এই হাদীসটিও নানাভাবে বহুসংখ্যক সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তবে, এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

٩- فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ○	৯। অতএব উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ প্রদান কর।
١٠- سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ○	১০। যারা ভয় করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।
١١- وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ○	১১। আর ওটা উপেক্ষা করবে সেই যে নিতান্ত হতভাগ্য,
١٢- الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ○	১২। সে ভীষণ নরকানলে প্রবেশ করবে,
١٣- ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○	১৩। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।

মুসনাদে আহমদে হযরত উকবা' ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীদেরকে বলেনঃ "এটাকে তোমরা রুকুর মধ্যে গ্রহণ করে নাও।" তারপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى অবতীর্ণ হলো তখন তিনি বললেনঃ "এটাকে তোমরা তোমাদের সিজদাহ্র মধ্যে গ্রহণ কর।"[1]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পাঠ করতেন তখন তিনি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলতেন।[2] হযরত আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পাঠ করে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলতেন এবং যখন তিনি لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ এ সূরাটি পাঠ করতেন এবং শেষে اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى পড়তেন তখন سُبْحٰنَكَ وَبَلٰى বলতেন।[3]

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলেনঃ তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যিনি সমস্ত মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকে সুন্দর ও উন্নত আকৃতি দান করেছেন। যিনি মানুষকে সৌভাগ্যের

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজা (রঃ)ও বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ)

৩. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

পথ-নির্দেশ করেছেন। যিনি পশুদের চারণভূমিতে তৃণ ও সবুজ ঘাসের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

অর্থাৎ "(হযরত মুসা বললেন) আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।" (২০ঃ ৫০) যেমন সহীহ্ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আসমান ও জমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেছেন। সেই সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।"

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন, পরে ওকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

আরবের কোন কোন ভাষা-বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, এখানে اَحْوٰى শব্দটিকে যদিও শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এটাকে প্রথমে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ যিনি ঘাস, তৃণ, শস্য, গাঢ় সবুজ রঙের করে সৃষ্টি করেছেন, তারপর ওকে বিশুষ্ক করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না। তবে হ্যাঁ যদি স্বয়ং আল্লাহ্ কোন আয়াত ভুলিয়ে দিতে চান তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ অর্থই পছন্দ করেন এবং তাতে এ আয়াতের অর্থ হবেঃ যে কুরআন আমি তোমাকে পড়াচ্ছি তা ভুলে যেয়ো না। তবে হ্যাঁ, আমি যে অংশ মানসুখ করে দেই সেটা ভিন্ন কথা। অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ্র কাছে তাঁর বান্দাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল বা কাজ এবং আকীদা বা বিশ্বাস সবই সুস্পষ্ট। হে নবী (সঃ)! আমি তোমার উপর ভাল কাজ, ভাল কথা, শরীয়তের হুকুম-আহকাম সহজ করে দিবো। এতে কোন প্রকার সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য থাকবে না। থাকবে না কোন প্রকার বক্রতা। তুমি এমন জায়গায় উপদেশ দাও যেখানে উপদেশ হয় ফলপ্রসূ। এতে বুঝা যায় যে, অযোগ্য নালায়েকদেরকে শিক্ষাদান করা উচিত নয়। যেমন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "যদি তোমরা কারো সাথে এমন কথা বল যা তার জন্যে বোধগম্য নয়, তবে তোমাদের কল্যাণকর কথা তার জন্যে অকল্যাণ বয়ে

আনবে। তাতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। বরং মানুষের সাথে তোমরা তাদের বোধগম্য বিষয়ে কথা বলো, যাতে মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে না পারে।"

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ এই কুরআন থেকে তারাই নসীহত বা উপদেশ লাভ করবে যাদের অন্তরে আল্লাহ্ ভীতি রয়েছে এবং যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের ভয় মনে পোষণ করে। পক্ষান্তরে, যারা হতভাগ্য তারা এ কুরআন থেকে কোন শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে কোনরূপ আরাম-আয়েশ ও শান্তি-সুখ নেই, বরং আছে চিরস্থায়ী আযাব ও নানা প্রকার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

যারা আসল জাহান্নামী তারা না মৃত্যুবরণ করবে, না শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পাবে। তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করার ইচ্ছা রাখেন তারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হবার সাথে সাথেই পুড়ে মারা যাবে। তারপর সুপারিশকারী লোকেরা গিয়ে তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে এনে জীবনদানকারী ঝর্ণায় ফেলে দিবেন। তাদের উপর জান্নাতের ঐ ঝর্ণাধারা পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তারা সজীব হয়ে উঠবে যেমনভাবে বন্যায় নিক্ষেপিত বস্তুর (আবর্জনা স্তূপের) মাঝে বীজ গজিয়ে ওঠে।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "তোমরা দেখো না যে, ঐ উদ্ভিদ প্রথমে সবুজ হয়, তারপর হলদে হয় এবং শেষে পূর্ণ সজীবতা লাভ করে থাকে?" তখন সাহাবীদের কোন একজন বললেনঃ "নবীপাক (সঃ), কথাগুলো এমনভাবে বললেন যে, যেন তিনি জঙ্গলেই ছিলেন।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে কুরআন কারীমে বলেছেনঃ

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ ـ

অর্থাৎ "জাহান্নামীরা চীৎকার করে বলবেঃ হে (জাহান্নামের দারোগা) মালিক! আপনার প্রতিপালককে বলুন যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন। তখন জবাবে তাদেরকে বলা হবেঃ তোমাদেরকে এখানেই পড়ে থাকতে হবে।" (৪৩ঃ ৭৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তাছাড়া এটা বিভিন্ন শব্দে আরো বহু হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ـ

অর্থাৎ "তাদের মৃত্যুও ঘটানো হবে না এবং তাদের আযাবও হাল্কা করা **হবে না।" (৩৫ : ৩৬)**এই **অর্থ সম্বলিত** আরো আয়াত রয়েছে।

١٤- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ ○

১৪। নিশ্চয় সেই সাফল্য লাভ করে যে পবিত্রতা অর্জন করে।

١٥- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ؕ ○

১৫। এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে।

١٦- بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۫ ○

১৬। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাকো

١٧- وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ ○

১৭। অথচ আখেরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর।

١٨- اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ ○

১৮। নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (বিদ্যমান) আছে

١٩- صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ع ○

১৯। (বিশেষতঃ) ইবরাহীম (আঃ)-ও মুসা (আঃ)-এর গ্রন্থসমূহে।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি চরিত্রহীনতা হতে নিজেকে পবিত্র করে নিয়েছে, ইসলামের হুকুম আহকামের পুরোপুরি তাবেদারী করেছে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে শুধুমাত্র আল্লাহ্র আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে, সে মুক্তি ও সাফল্য লাভ করেছে।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করেছে, সে মুক্তি ও সাফল্য লাভ করেছে।" আর وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ "এটা হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া এবং এর উপর পুরোপুরি যত্নবান থাকা।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে দৈনন্দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) একবার ঈদের পূর্বের দিন আবূ খালদা (রঃ)-কে বলেনঃ "কাল ঈদগাহে যাওয়ার সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যেয়ো।" আবূ খালদা' (রঃ) বলেনঃ আমি তাঁর কথামত তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি কিছু খেয়েছো?" আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ (খেয়েছি)। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "গোসল করেছো?" আমি জবাব দিলামঃ হ্যাঁ (করেছি)। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "ফিৎরা' আদায় করেছো?" আমি জবাবে বললামঃ হ্যাঁ (করেছি)। তিনি তখন বললেনঃ "আমি তোমাকে এ কথা বলার জন্যেই ডেকেছিলাম। এ আয়াতের অর্থও এটাই বটে।" মদীনাবাসী ফিৎরা' আদায় করা এবং পানিপান করানোর চেয়ে উত্তম কোন সাদকার কথা জানতেন না। হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীযও (রঃ) লোকদেরকে ফিৎরা' আদায়ের আদেশ করতেন এবং এ আয়াত পাঠ করে শুনাতেন।

হযরত আবুল আহওয়াস (রঃ) বলতেনঃ "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়ার ইচ্ছা করে এবং এই অবস্থায় কোন ভিক্ষুক এসে পড়ে তবে যেন সে তাকে কিছু দান করে।" অতঃপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এই আয়াত দু'টি পাঠ করতেন।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতদ্বয়ের ভাবার্থ হলোঃ যে নিজের মালকে পবিত্র করেছে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করেছে (সে সফলকাম হয়েছে)।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো। অর্থাৎ তোমরা আখেরাতের উপর পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দুনিয়া তো হলো ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর অমর্যাদাকর। পক্ষান্তরে, আখেরাতের জীবন হলো চিরস্থায়ী ও মর্যাদাকর। কোন বুদ্ধিমান লোক অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং মর্যাদাহীনকে মর্যাদাসম্পন্নের উপর প্রাধান্য দিতে পারে না। দুনিয়ার জীবনের জন্যে আখেরাতের জীবনের প্রস্তুতি পরিত্যাগ করতে পারে না।

মুসনাদে আহমদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যার (আখেরাতে কোন) ঘর নেই, দুনিয়া ঐ ব্যক্তির সম্পদ যার (আখেরাতে কোন) সম্পদ নেই এবং দুনিয়ার জন্যে ঐ ব্যক্তি (মালধন) জমা করে যার বিবেক বুদ্ধি নেই।"

হযরত আ'রফাজা' সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى এই সূরাটির পাঠ শুনতে চাচ্ছিলাম। যখন তিনি بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তিনি এর পাঠ ছেড়ে দিয়ে স্বীয় সঙ্গীদেরকে বললেনঃ "আমরা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। তাঁর এ কথায় জনগণ নীরব থাকলে তিনি বলেনঃ আমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে গেছি। দুনিয়ার সৌন্দর্য নারী, খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আখেরাত আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। তাই আমরা আমাদের সামনের জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিয়েছি এবং দূরের জিনিস হতে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছি।"[১] হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এ কথাগুলো বিনয় প্রকাশের জন্যে বলেছেন, না মানুষের স্বভাব হিসেবে বলেছেন তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবেসেছে সে তার আখেরাতের ক্ষতি করেছে, আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালবেসেছে, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি করেছে। হে জনমণ্ডলী! যা বাকী থাকবে তাকে যা বাকী থাকবে না তার উপর প্রাধান্য দাও।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এটা তো পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহে রয়েছে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى - صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম (সঃ) বলেনঃ "এর প্রত্যেকটাই হযরত ইবরাহীম (আঃ)ও হযরত মূসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহে বিদ্যমান ছিল।"[২]

সুনানে নাসাঈতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى অবতীর্ণ হয় তখন বলেন "এর প্রত্যেকটাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহে রয়েছে।" আর যখন وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى (৫৩ঃ ৩৭) অবতীর্ণ হয় তখন বলেনঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছিলেন। وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى - (কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। (১৭ঃ ১৫) অর্থাৎ এই আয়াত সুরা নাজমের নিম্নের আয়াতগুলোর মতঃ

---

[১] এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি হাফিয আবু বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ۔ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى ۔ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۔ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۔ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۔ ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۔ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۔

অর্থাৎ "তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসা (আঃ) এর কিতাবে? এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়ীত্ব? তা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে। আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে। অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। আর এই যে, সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট [শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো]।" (৫৩ ঃ ৩৬-৪২) অর্থাৎ সমস্ত হুকুম-আহকাম পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেও লিপিবদ্ধ ছিল। একইভাবে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى সূরার আয়াতগুলোতেও ঐ সব হুকুম আহকামের কথা বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সমগ্র সূরাটিতেই এগুলোর বর্ণনা রয়েছে। আবার কারো কারো মতে قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى হতে وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى পর্যন্ত আয়াতগুলোতে এর বর্ণনা রয়েছে। প্রথম উক্তিটিই বেশী সবল। এটাকেই হাসান (রঃ) পছন্দ করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা ঃ আ'লা এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ গাশিয়াহ্ মাক্কী

(আয়াত ঃ ২৬, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٦، رُكُوْعُهَا : ١)

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি পূর্বে গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদের নামাযে এবং জুমআর দিনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং غَاشِيَة পাঠ করতেন।

ইমাম মালিক (রঃ) এর মুআত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, জুমআর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথম রাকআতে সূরা জুমআহ্ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করতেন।[1]

করুণাময়, কৃপা নিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। তোমার কাছে কি সমাচ্ছন্নকারীর সংবাদ এসেছে?	١- هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ○ ط
২। সে দিন বহু আনন অবনত হবে;	٢- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ○ لا
৩। কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে;	٣- عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ○
৪। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;	٤- تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ○ لا
৫। তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে;	٥- تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ○ ط
৬। তাদের জন্যে বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই;	٦- لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ○ لا
৭। যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না।	٧- لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ○ ط

---

[1] এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদ, সহীহ মুসলিম, সুনানে ইবনে মাজাহ এবং সুনানে নাসাঈর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে।

গাশিয়াহ্ হলো কিয়ামতের একটি নাম, কারণ এটা সবার উপর আসবে, সবাইকে ঘিরে ধরবে এবং ঢেকে ফেলবে। মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) একটি স্ত্রী লোকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় শুনতে পান যে, هَلْ اَتٰـكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করছে। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে শুনতে থাকেন এবং বলেনঃ نَعَمْ قَدْ جَآءَنِى অর্থাৎ “হ্যাঁ, আমার নিকট (কিয়ামতের সংবাদ) এসেছে।”

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সেইদিন বহু লোক হবে অপমানিত চেহারাবিশিষ্ট। অবমাননা তাদের উপর আপতিত হবে। তাদের পুণ্যকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা বড় বড় কাজ করেছিল, আমলের জন্যে কষ্ট করেছিল, কিন্তু আজ তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে।

হযরত আবূ ইমরান জাওফী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (র[illegible]) এক রাহিবের (খ্রিষ্টান পাদ্রীর) আশ্রমের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিলেন। সেখা[illegible]ড়িয়ে তিনি ঐ রা'হিবকে ডাক দেন। খ্রিস্টান সাধক তাঁর কাছে হাজির হ[illegible] সাধককে দেখে কেঁদে ফেলেন। সাধক তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলার কিতাবে উল্লেখিত তাঁর عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً এই উক্তি আমার স্মরণে এসেছে এবং ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে।[১] এর ভাবার্থ হলোঃ ইবাদত, রিয়াযত করছে, অথচ শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ দ্বারা খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইকরামা (রাঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ দুনিয়ায় তারা পাপের কাজ করছে এবং আখেরাতে তারা শাস্তি এবং প্রহারের কষ্ট ভোগ করবে।

তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে। সেখানে ضَرِيْع ছাড়া অন্য কোন খাদ্য মিলবে না। এটা হবে আগুনের বৃক্ষ, জাহান্নামের পাথর। এতে বিষাক্ত কন্টক বিশিষ্ট ফল ধরে থাকবে। এটা হবে দুর্গন্ধময় খাদ্য ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট আহার্য। এটা ভক্ষণে দেহও পুষ্ট হবে না, ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবে না এবং অবস্থারও কোন পরিবর্তন হবে না।

---

১. এটা হাফিয আবূ বকর বারকানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৮। বহু মুখমণ্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল,	٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ○ لا
৯। নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত,	٩- لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ○ لا
১০। সমুন্নত, কাননে অবস্থিত হবে।	١٠- فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○ لا
১১। সেথায় তারা অবান্তর বাক্য শুনবে না,	١١- لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ○
১২। সেখানে আছে প্রবহমান উৎসমালা,	١٢- فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ○ م
১৩। তন্মধ্যে রয়েছে সমুচ্চ আসনসমূহ	١٣- فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ○ لا
১৪। এবং সুরক্ষিত পান পাত্রসমূহ	١٤- وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ○ لا
১৫। ও সারিসারি উপাধান সমূহ;	١٥- وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ○ لا
১৬। এবং সম্প্রসারিত গালিচাসমূহ।	١٦- وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ○ ط

এর পূর্বে পাপী, দুষ্কৃতিকারী এবং মন্দ লোকদের বর্ণনা এবং তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে পুণ্যবান ও সৎকর্মশীলদের পরিণাম ও পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, সেইদিন এমন বহু চেহারা দেখা যাবে যাদের চেহারা থেকে তৃপ্তি ও আনন্দ উল্লাসের নিদর্শন প্রকাশ পাবে তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময় দেখে খুশী হবে। জান্নাতের উঁচু উঁচু অট্টালিকায় তারা অবস্থান করবে। সেখানে কোন প্রকারের বাজে কথা ও অশ্লীল আলাপ থাকবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ـ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ـ

"সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপ বাক্য" (৫৬ঃ ২৫-২৬) 'সালাম আর সালাম' বানী ব্যতীত।" আর এক জায়গায় বলেন ঃ

لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ

অর্থাৎ “তথায় নেই কোন অসার কথা পাপবাক্য।” (৫২ঃ ২৩)

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘সেথায় থাকবে বহমান প্রস্রবণ।’ এখানে একটি ঝর্ণার কথা বুঝানো হয়নি। বরং ঝর্ণা সমূহের কথা বুঝানো হয়েছে।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ মিশক এর পাহাড় এবং মিশকের টিলা হতে প্রবাহিত হবে।

তথায় থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা। অর্থাৎ জান্নাতীদের জন্যে জান্নাতে উঁচু উঁচু পালঙ্ক রয়েছে এবং ঐ সব পালঙ্কে উঁচু উঁচু আরামদায়ক বিছানা তোষকসমূহ রয়েছে। সেই বিছানার পাশে হুরগণ বসে আছে। এ সব বিছানাগুলো উঁচু উঁচু গদিবিশিষ্ট হলেও যখনই আল্লাহর বন্ধুরা ওগুলোতে শোবার ইচ্ছা করবে তখন ওগুলো অবনত হয়ে যাবে এবং নুয়ে পড়বে। রকমারী সুরা থাকবে, যে রকম সুরা যতটুকু পরিমাণ ইচ্ছা করবে পান করতে পারবে। সারি সারি পালঙ্ক ও বিছানা সুসজ্জিত থাকবে, যখন যেখানে খুশী উপবেশন ও শয়ন করতে পারবে।

হযরত উ[illegible]ন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কেউ আছে কি যে জান্নাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? এমন জান্নাত যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বেহিসাব। কা’বার প্রতিপালকের শপথ! সেটা এক চমকিত নূর বা জ্যোতি, সেটা এক উপচে পড়া সবুজ সৌন্দর্য, সেখানে উঁচু উঁচু মহল ও বালাখানা রয়েছে। রয়েছে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা, রেশমী পোশাক, নরম নরম গালিচা এবং পাকা পাকা উন্নত মানের ফল। সেটা চিরস্থায়ী স্থান, আরাম আয়েশ ও নিয়ামতে পরিপূর্ণ।” তখন সাহাবীগণ বলে উঠলেনঃ “আমরা সবাই এ জান্নাতের আকাংখী এবং আমরা এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবো।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের একথা শুনে বললেন! ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) বল।” তখন তাঁরা ইনশাআল্লাহ বললেন।”[1]

১৭। তবে কি তারা উষ্ট্রপালের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

١٧- اَفَـــلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ ○ وقفة

---

[1] ১. এ হাদীসটি আবূ বকর ইবনে আবী দাঊদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১৮। এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমুচ্চ করা হয়েছে?	١٨- وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ○ وقفة
১৯। এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে?	١٩- وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ○ وقفة
২০। এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?	٢٠- وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ○ وقفة
২১। অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র।	٢١- فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ○ ط
২২। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।	٢٢- لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ○ لا
২৩। তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে	٢٣- اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ○ لا
২৪। আল্লাহ তাকে কঠোর দন্ডে দণ্ডিত করবেন।	٢٤- فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ○ ط
২৫। নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।	٢٥- اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ○
২৬। অতঃপর আমার উপরই তাদের হিসাব নিকাশ (গ্রহণের ভার)।	٢٦- ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাঁর সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এবং অনুভব করে যে, ঐ সব থেকে স্রষ্টার কি অপরিসীম ক্ষমতাই না প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর কুদরত, তাঁর ক্ষমতা প্রতিটি জিনিস কিভাবে প্রকাশ করছে! তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে যে, কিভাবে ওকে

সৃষ্টি করা হয়েছে? অর্থাৎ উটের প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, ওকে অদ্ভুতভাবে এবং শক্তি ও সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এই জন্তু অতি নম্র ও সহজভাবে বোঝা বহন করে থাকে এবং অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে চলাফেলা করে। মানুষ ওর গোশত ভক্ষণ করে, ওর পশম তাদের কাজে লাগে, তারা ওর দুধ পান করে থাকে এবং ওর দ্বারা তারা আরো নানাভাবে উপকৃত হয়। সর্বাগ্রে উটের কথা বলার কারণ এই যে, আরবের লোকেরা সাধারণতঃ উটের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়ে থাকে। উট আরববাসীদের নিকট সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রাণী।[১]

কাযী শুরাইহ্ (রঃ) বলতেনঃ চলো, গিয়ে দেখি উটের সৃষ্টি নৈপুণ্য কিরূপ এবং আকাশের উচ্চতা জমীন হতে কিরূপ! যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

أَفَلَمْ يَنْظُرُوْا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۔

অর্থাৎ "তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি, আর তাতে কোন ফাটল নেই?" (৫০ ঃ ৬)

এরপর বলা হচ্ছেঃ আর তারা কি দৃষ্টিপাত করে না পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে আমি ওটাকে স্থাপন করেছি? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালাকে এমনভাবে মাটির বুকে প্রোথিত করে দিয়েছেন, যাতে জমিন নড়াচড়া করতে না পারে। আর পর্বতও যেন অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম না হয়। তারপর পৃথিবীতে যেসব উপকারী কল্যাণকর জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেদিকেও মানুষের দৃষ্টিপাত করা উচিত। আর জমিনের দিকে তাকালে তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে ওটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন! মোটকথা এখানে এমন সব জিনিসের কথা বলা হয়েছে যেগুলো কুরআনের প্রথম ও প্রধান সম্বোধন স্থল আরববাসীদের চোখের সামনে সব সময় থাকে। একজন বেদুঈন যখন তার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়ে তখন তার পায়ের তলায় থাকে জমীন, মাথার উপর থাকে আসমান, পাহাড় থাকে তার চোখের সামনে, সে নিজের উটের পিঠে আরোহীরূপে থাকে। এ সব কিছুতে স্রষ্টার সীমাহীন কুদরত, শিল্প নৈপুণ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আরো প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা ও প্রতিপালক

---

[১] উটের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করার আদেশকরণের কারণ এই যে, এই জন্তুর পানাহার পদ্ধতি, চালচলন, প্রাকৃতিক ক্রিয়া, সঙ্গম, প্রণালী, বসার নিয়ম ইত্যাদি অন্যান্য জন্তু হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই জন্তু একবার পানাহার করলে এক সপ্তাহ আর পানাহারের প্রয়োজন হয় না।

একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই যার কাছে নত হওয়া যায়, অনুনয় **বিনয় করা যায়।** আমরা যাঁকে বিপদের সময় স্মরণ করি, যাঁর নাম জপি যাঁর **কাছে মাথা**নত করি তিনি একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। হযরত যিমাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলো এরকম কসম দিয়েই করেছিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বারবার প্রশ্ন করা আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমরা মনে মনে কামনা করতাম যে, যদি বাইরে থেকে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে আমাদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন করতেন তবে তাঁর মুখের জবাব আমরাও শুনতে পেতাম (আর এটা আমাদের জন্য খুব খুশীর বিষয় হতো)! আকস্মিকভাবে একদিন এক দূরাগত বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন একথা নাকি আপনি বলেছেন?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'সে সত্য কথাই বলেছে।" লোকটি প্রশ্ন করলোঃ "আচ্ছা, বলুন তো, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "আল্লাহ।" লোকটি বললোঃ "জমীন সৃষ্টি করেছেন কে?" তিনি উত্তর দিলেনঃ 'আল্লাহ।" সে প্রশ্ন করলোঃ "এই পাহাড়গুলো কে স্থাপন করেছেন এবং তাতে যা কিছু করার তা করেছেন তিনি কে? তিনি জবাব দিলেনঃ "আল্লাহ।" লোকটি তখন বললোঃ "আসমান জমীন যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলো যিনি স্থাপন করেছেন তাঁর শপথ। ঐ আল্লাহ্ই কি আপনাকে তাঁর রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ" লোকটি প্রশ্ন করলোঃ "আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয (এটা কি সত্য)?" তিনি জবাবে বললেনঃ "হ্যাঁ", সে সত্য কথাই বলেছে।" লোকটি বললোঃ "যে আল্লাহ আপনাকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! ঐ আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?" তিনি জবাব দিলেন "হ্যাঁ"। লোকটি বললোঃ "আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত রয়েছে। (একথাও কি সত্য)?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, সে সত্যই বলেছে।" লোকটি বললোঃ "যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! তিনিই কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?" তিনি জবাবে বললেন "হ্যাঁ" লোকটি বললোঃ "আপনার দূত আমাদেরকে এখবরও দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে

তারা যেন হজ্জব্রত পালন করে (এটাও কি সত্য?)” তিনি জবাব দিলেনঃ ‘হ্যাঁ” সে সত্য কথা বলেছে।” অতঃপর লোকটি যেতে লাগলো। যাওয়ার পথে সে বললো! “যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি এগুলোর উপর কমও করবো না, বেশিও করবো না।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ! “লোকটি যদি সত্য কথা বলে থাকে তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[১]

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, লোকটি বললোঃ “আমি হলাম যিমাম ইবনে সা'লাবাহ্, বানুসা'দ ইবনে বকর (রাঃ)-এর ভাই। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে প্রায়ই বলতেনঃ “জাহেলিয়্যাতের যুগে এক পাহাড়ের চূড়ায় একটি নারী বসবাস করতো। তার সাথে তার এক ছোট সন্তান ছিল। ঐ নারী বকরী মেষ চরাতো। একদিন ছেলেটি তার মাকে বললোঃ “আম্মা! তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন?” মহিলাটি উত্তর দিলোঃ “আল্লাহ।” ছেলেটি বললোঃ “আমার আব্বাকে সৃষ্টি করেছেন কে?” মা জবাব দিলোঃ “আল্লাহ।” ছেলেটি প্রশ্ন করলোঃ “আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন?” মহিলাটি উত্তর দিলোঃ “আল্লাহ।” ছেলেটি জিজ্ঞেস করলোঃ “পাহাড়গুলো সৃষ্টি করেছেন কে?” মা জবাবে বললোঃ “আল্লাহ।” ছেলে প্রশ্ন করলোঃ “এই বকরীগুলো কে সৃষ্টি করেছেন?” মা জবাব দিলোঃ “আল্লাহ।” ছেলেটি হঠাৎ বলে ফেললোঃ “আল্লাহ কতই না মহিমাময়।” অতঃপর সে (আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার কথা চিন্তা করে নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে) পর্বত চূড়া হতে নিচে পড়ে গেল এবং টুকরো টুকরো হয়ে গেল।”[২]

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো শুধু একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তুমি মানুষের কাছে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছো। তা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া, হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।’ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তুমি তাদের উপর জোর জবরদস্তিকারী নও অর্থাৎ তাদের

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইবনে দীনার (রঃ) বলেন যে, হযরত ইবনে উমারও (রাঃ) এ হাদীসটি তাঁদের সামনে প্রায়ই বর্ণনা করতেন। এ হাদীসের সনদে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি দুর্বল।

অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করতে পারবে না।

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন "আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যখন তারা এটা বলবে তখন তারা তাদের জানমাল আমা হতে রক্ষা করতে পারবে, ইসলামের হক ব্যতীত (যেমন ইসলাম গ্রহণের পরেও কাউকে হত্যা করলে কিসাস বা প্রতিশোধ হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে)। তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর থাকবে।" অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۔

অর্থাৎ 'অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।"[১]

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۔ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۔

অর্থাৎ "সে বিশ্বাস করেনি ও নামায আদায় করেনি, বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।" (৭৫ ঃ ৩১-৩২) এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন, ' আল্লাহ তাকে দিবেন মহাশাস্তি।' মুসনাদে আহমদে হযরত আবু উমামা আল বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার (রাঃ) নিকট গমন করে তার কাছে সহজ হাদীস শুনতে চান যা তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে শুনেছেন। তখন তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলতে শুনেছেন। "তোমাদের মধ্যে সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করবে না যে ঐ দুষ্ট উটের ন্যায় যে তার মালিকের সাথে হঠকারিতা করে।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ। আমি তাদের কাছে হিসাব নিকাশ গ্রহণ করবো এবং বিনিময় প্রদান করবো। পুণ্যের জন্যে পুরস্কার দিবো এবং পাপের জন্যে দিবো শাস্তি।

সূরাঃ গা'শিয়াহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) কিতাবুল ঈমানের মধ্যে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) কিতাবুত তাফসীরের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

সূরা ঃ ফাজ্‌র, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৩০, রুকূ’ ঃ ১)

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعُهَا : ١)

সুনানে নাসাঈতে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআয (রাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন, একটি লোক এসে ঐ নামাযে শামিল হয়। হযরত মুআয (রাঃ) নামাযে কিরআত লম্বা করেন। তখন ঐ আগন্তুক জামাআত ছেড়ে দিয়ে মসজিদের এক কোণে গিয়ে একাকী নামায আদায় করে চলে যায়। হযরত মুআয (রাঃ) এ ঘটনা জেনে ফেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে অভিযোগের আকারে এ ঘটনা বিবৃত করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ লোকটিকে ডেকে নিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এছাড়া কি করবো? আমি তাঁর পিছনে নামায শুরু করেছিলাম, আর তিনি শুরু করেছিলেন লম্বা সূরা। তখন আমি জামাআত ছেড়ে দিয়ে মসজিদের এক কোণে একাকী নামায আদায় করে নিয়েছিলাম। অতঃপর মসজিদ হতে বের হয়ে এসে আমার উষ্ট্রীকে ভূষি দিয়েছিলাম।” তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মুআ’য (রাঃ)-কে বলেন যে, হে মুআয (রাঃ)! তুমি তো জনগণকে ফিৎনার মধ্যে নিক্ষেপকারী। তুমি কি وَالْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এই সূরাগুলো পড়তে পার না?”

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। শপথ ঊষার,	١- وَالْفَجْرِ ○
২। শপথ দশ রজনীর,	٢- وَلَيَالٍ عَشْرٍ ○
৩। শপথ জোড় ও বেজোড়ের	٣- وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ○
৪। এবং শপথ, রজনীর যখন ওটা গত হতে থাকে	٤- وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ○
৫। নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্যে।	٥- هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ○
৬। তুমি কি দেখো নাই তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন আদ বংশের–	٦- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ○

৭। ইরাম গোত্রের প্রতি যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?	٧- اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝
৮। যার সমতুল্য অন্য কোন নগরে নির্মিত হয়নি	٨- الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ۝
৯। এবং সামুদের প্রতি? যারা উপত্যকার পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?	٩- وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝
১০। এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের প্রতি?	١٠- وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ۝
১১। যারা নগরসমূহে উদ্ধতাচরণ করেছিল।	١١- الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ۝
১২। অনন্তর তথায় তারা বহু বিপ্লব (সংঘটিত) করেছিল।	١٢- فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝
১৩। সুতরাং তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।	١٣- فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝
১৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সবই দর্শন করেন ও সময়ের প্রতীক্ষায় থাকেন।	١٤- اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

এটা সর্বজন বিদিত যে, ফজরের অর্থ হলো সকাল বেলা। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত সুদ্দীর (রঃ) এটা উক্তি। হযরত মাসরূক (রঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাব (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বিশেষভাবে ঈদুল আযহার সকালবেলাকে বুঝানো হয়েছে। আর ওটা হলো দশ রাত্রির সমাপ্তি। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো সকাল বেলার নামায। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা পুরো দিনকেই বুঝানো হয়েছে।

দশ রজনী দ্বারা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে, যেমন এ কথা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ), হযরত মুজাহিদ

(রঃ) এবং পূর্ব ও পর যুগীয় আরো বহু গুরুজন বলেছেন। সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূরূপে বর্ণিত আছেঃ "কোন ইবাদতই এই দশ দিনের ইবাদত হতে উত্তম নয়।" রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করা হলোঃ "আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজের জান-মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তারপর ওগুলোর কিছুই নিয়ে ফিরেনি (তার কথা স্বতন্ত্র)।" কেউ কেউ বলেছেন, যে, এর দ্বারা মুহররমের প্রথম দশদিনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রমযান মাসের প্রথম দশ দিন। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন।

মুসনাদে আহমদে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ عَشْر হলো ঈদুল আযহার দিন, وَتْر হলো আরাফার দিন এবং شَفْع হলো কুরবানীর দিন।" এ হাদীসের সনদে কোন প্রকার গরমিল নেই। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

وَتْر হলো আরাফার দিন। এটা যদি নবম তারিখ হয়ে থাকে তাহলে شَفْع শব্দের অর্থ হবে দশম তারিখ অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন।

হযরত ওয়াসিল ইবনে সায়েব (রঃ) হযরত আতা (রঃ) কে জিজ্ঞেস করেনঃ وَتْر দ্বারা কি বিতরের নামায উদ্দেশ্য?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "না, বরং شَفْع হলো আরাফার দিন এবং وَتْر হলো ঈদুল আযহার রাত।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) খুৎবাহ্ দিচ্ছিলেন, এমন সময় একটি লোক দাঁড়িয়ে বললোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! شَفْع কি এবং وِتْر কি?" তিনি জবাবে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেনঃ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ (২ঃ ২০৩) এখানে দুই দিন দ্বারা شَفْع এবং وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ এখানে একদিন দ্বারা وَتْر কে বুঝানো হয়েছে।" তিনি আরো বলেছেন যে, اَيَّامِ تَشْرِيْق (১১ই, ১২ই ও ১৩ই যিলহজ্জ) এর মাঝামাঝি দিন হলো شَفْع এবং وِتْر হলো শেষ দিন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এই নামগুলো মুখস্থ করে নিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি (আল্লাহ) বেতর বা বেজোড় এবং তিনি বেতরকে ভালবাসেন।" হযরত হাসান বসরী (রঃ)

এবং হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো সমস্ত সৃষ্টি জগত। এর মধ্যে شَفْعٌ রয়েছে এবং وَتْرٌ-ও রয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, شَفْعٌ হলো ফজরের নামায এবং وَتْرٌ হলো মাগরিবের নামায। এটাও উল্লিখিত হয়েছে যে, মাখলুক বা সৃষ্টিজগত হলো شَفْعٌ এবং وَتْرٌ হলেন আল্লাহ। এ উক্তিও রয়েছে যে, شَفْعٌ এর অর্থ হলো জোড়া জোড়া এবং وَتْرٌ হলেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। যেমন আসমান-জমীন, জল-স্থল, মানুষ-জ্বিন, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি। কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ "আমি সকল জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।" (৫১ ঃ ৪৯) অর্থাৎ যেন তোমরা জানতে পার যে, সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর কোন শরীক নেই। এটাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো জোড় বেজোড়ের গণনা। একটি হাদীসে রয়েছে যে, شَفْعٌ এর অর্থ হলো দু'দিন এবং وَتْرٌ এর অর্থ হলো তৃতীয় দিন। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এর অর্থ হলো নামায, এতে জোড় রয়েছে, যেমন ফজরের দুই রাকআত এবং যুহর, আসর ও ইশার চার রাকআত। আবার বেজোড়েও রয়েছে যেমন মাগরিবের তিন রাকআত। একটি মারফূ হাদীসে শুধু নামায অর্থেও এ শব্দ দু'টির ব্যবহারের কথা রয়েছে। কোন কোন সাহাবী বলেছেন যে, এ দুটি শব্দ দ্বারা ফরয নামায উদ্দেশ্য। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে। আবার এ অর্থও করা হয়েছে যে, রাত্রি যখন আসতে থাকে। এটাই অধিক সমীচীন বলে মনে হয়। এ উক্তিটি وَالْفَجْرِ এর সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। ফজর বলা হয় যখন রাত্রি শেষ হয়ে যায় এবং দিনের আগমন ঘটে ঐ সময়কে। কাজেই এখানে দিনের বিদায় ও রাত্রির আগমন অর্থ হওয়াই যুক্তিসংগত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ـ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ـ

অর্থাৎ "শপথ রজনীর যখন ওর আগমন ঘটে এবং অন্ধকার ছড়িয়ে দেয় এবং শপথ সকালের যখন তা আসে ও আলো ছড়িয়ে দেয়।" (৮১ ঃ ১৭-১৮)

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এখানে অর্থ হলো মুযদালিফার রাত্রি। حِجْرٍ এর অর্থ হচ্ছে আকল বা বিবেক। হিজর বলা হয় প্রতিরোধ বা বিরতকরণকে। বিবেক ও

ভ্রান্তি, মিথ্যা ও মন্দ থেকে বিরত রাখে বলে ওকে আকল বা বিবেক বলা হয়। حِجْرُ الْبَيْتِ এ কারণেই বলা হয় যে, কা'বাতুল্লাহর যিয়ারতকারীদেরকে শামী দেয়াল থেকে এই حِجْر বিরত রাখে। এ থেকেই হিজরে ইয়াম মা শব্দ গৃহীত হয়েছে। এ কারণেই আরবের লোকেরা বলে থাকে حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَى فُلَانٍ অর্থাৎ শাসনকর্তা অমুককে বিরত রেখেছেন। যখন কোন লোককে বাদশাহ বাড়াবাড়ি করতে বিরত রাখেন তখন আরবরা একথা বলে থাকে।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে। কোথাও ইবাদত বন্দেগীর শপথ, কোথাও ইবাদতের সময়ের শপথ, যেমন হজ্জ, নামায ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার পুণ্যবান বান্দারা তাঁর নৈকট্য লাভ করার জন্যে সচেষ্ট থাকে এবং তাঁর সামনে নিজেদের হীনতা প্রকাশ করে অনুনয় বিনয় করতে থাকে। পুণ্যবান নেককারদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের বিনয় ও ইবাদত বন্দেগীর কথা উল্লেখ করেছেন, সাথে সাথে বিদ্রোহী, হঠকারী, পাপী ও দুর্বৃত্তদেরও বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক স্তম্ভসদৃশ আ'দ জাতির সাথে কি করে ছিলেন? কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? তারা ছিল হঠকারী এবং অহংকারী। তারা আল্লাহর নাফরমানী করতো।, রাসূলকে অবিশ্বাস করতো এবং নিজেদেরকে নানা প্রকারের পাপকর্মে নিমজ্জিত রাখতো। তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হযরত হূদ (আঃ) আগমন করেছিলেন।

এখানে প্রথম আ'দ (আ'দেউলা) এর কথা বলা হয়েছে। তারা আ'দ ইবনে ইরম ইবনে আউস ইবনে সাম ইবনে নূহের (আঃ) বংশধর ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বাকি সব বেঈমানকে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ক্রমাগত সাত রাত্র ও আট দিন পর্যন্ত ঐ সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়েছিল। তাতে আ'দ সম্প্রদায়ের সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের একজনও ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা পায়নি। মাথা ও দেহ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছিল। কুরআনের মধ্যে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সূরা আল হা'ককাহতেও এর বর্ণনা রয়েছে। সেখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ـ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ـ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ـ

অর্থাৎ “আর আ’দ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা; যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে। তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা সেথায় লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। অতঃপর তাদের কাউকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি?” (৬৯ ঃ ৬-৮) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (ইরাম গোত্রের প্রতি–যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের) তাদের অতিরিক্ত পরিচয় প্রদানের জন্যে এটা عَطْفِ بَيَان হয়েছে। তাদেরকে ذَاتِ الْعِمَاد বলার কারণ এ যে, তারা দৃঢ় ও সুউচ্চ স্তম্ভ বিশিষ্ট গৃহে বসবাস করতো। সমসাময়িক যুগের লোকদের তুলনায় তারা ছিল অধিক শক্তিশালী এবং দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। এ কারণেই হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْآ اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থাৎ “স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফল কাম হবে।” আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ـ

অর্থাৎ “আদ সম্প্রদায় অন্যায়ভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল এবং বলেছিলঃ আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি দেখে নাই যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।” (৪১ ঃ ১৫) আর এখানে আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘যার সমতুল্য (প্রাসাদ) কোন দেশে নির্মিত হয়নি।’ তারা খুবই দীর্ঘ দেহ ও অসাধারণ শক্তির

অধিকারী ছিল। সেই যুগে তাদের মত দৈহিক শক্তির অধিকারী আর কেউ ছিল না। ইরাম ছিল তাদের রাজধানী। তাদেরকে স্তম্ভের অধিকারী বলা হতো কারণ তারা ছিল খুবই দীর্ঘ দেহী। তাদের মত অন্য কেউ ছিল না।

হযরত মিকদাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ এর উল্লেখ করে বলেনঃ "তাদের এতো বেশী শক্তি ছিল যে, তাদের কেউ উঠতো এবং একটি (প্রকাণ্ড) পাথর উঠিয়ে অন্য কোন সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করতো। এ পাথরে চাপা পড়ে ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই মারা যেতো।"[১]

হযরত আনাস ইবনে আইয়ায (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাওর ইবনে যায়েদ দাইলী (রঃ) বলেনঃ "আমি একটি পাতায় দেখেছি যে, তাতে লিখিত ছিলঃ "আমি শাদ্দাদ ইবনে আদ, আমি স্তম্ভ মজবুত করেছি, আমি হাত মযবুত করেছি, আমি সাথে হাতের একটি ধনভাণ্ডার জমা করে রেখেছি। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত এটা বের করবে।"[২] অথবা এটা বলা যায় যে, তারা উৎকৃষ্ট উচ্চবিশিষ্ট গৃহে বাস করতো। অথবা বলা যায় যে, তারা ছিল উচ্চ স্তম্ভের অধিকারী। অথবা তারা ছিল উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রের মালিক। অথবা তারা দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিল। অর্থাৎ তারা এক কওম বা সম্প্রদায় ছিল যাদের কথা কুরআনে সামূদ সম্প্রদায়ের সাথে বহু জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। এখানেও আদ ও সামূদ উভয় কওমের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ হলো একটি শহর, তার নাম হয় তো দামেস্ক অথবা আলেকজান্দ্রিয়া। কিন্তু এ উক্তি সঠিক বলে অনুভূত হয় না। কারণ এতে আয়াতের অর্থে সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া এখানে এটা বুঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেক হঠকারী বিশ্বাসঘাতককে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন যাদের নাম ছিল আ'দী, কোন শহরের কথা বুঝানো হয়নি। আমি এ সব কথা এখানে এ কারণেই বর্ণনা করেছি যে, যেন কতিপয় তাফসীরকারের অপব্যাখ্যায় কেউ বিভ্রান্ত না হয়। তাঁরা লিখেছেন যে, ইরম একটি শহরের নাম যার একটি ইট সোনার ও অন্যটি রূপার, এভাবে শহরটি নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া সেই শহরের বাড়ি-ঘর, বাগবাগীচা সবই সোনা-রূপার তৈরি, কংকর

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এটাও মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

হলো মুক্তা ও জওহর এবং মাটি হলো মিশক। ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান এবং ফল ভরে বৃক্ষগুলো আনত। সেই শহরের বসবাস করার মত কোন মানুষ নেই। ঘর দুয়ার সব শূন্য। হাঁ হুঁ করার মতও কেউ নেই। এই শহর স্থানান্তরিত হতে থাকে, কখনো সিরিয়ায়, কখনো ইয়ামনে, কখনো ইরাকে এবং কখনো অন্য কোথাও। এসব অপকাহিনী বানী ইসরাইল বানিয়ে নিয়েছে। তারা এ সব মনগড়া গল্প তৈরি করে মুর্খদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে।

সালাবী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুআবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে এক বেদুঈন তার হারানো উট খোঁজ করার উদ্দেশ্যে এক জন-মানব শূন্য জঙ্গলে গিয়ে প্রবেশ করে। ঐ জঙ্গলে সে উপরোল্লিখিত গুণাবলী বিশিষ্ট একটি শহর দেখতে পায় । ঐ শহরে গিয়ে সে ঘোরাফেরা করে। তারপর ফিরে এসে জনগণের নিকট তা বর্ণনা করে। জনগণও তখন সেখানে গমন করে কিন্তু তারা সেখানে কিছুই দেখতে পায়নি।

ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) এখানে এ ধরনের কাহিনী খুব লম্বা চওড়াভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ কাহিনীও সত্য নয়। বেদুঈনের কাহিনীটি যদি সনদের দিক দিয়ে সত্য বলে ধরে নেয়াও হয় তাহলে বলতে হয় যে, বেদুঈন মনে মনে এ কাহিনী কল্পনা করেছিল, ফলে তার দৃষ্টিভ্রম ঘটেছিল। সে ভেবে বসেছিল যে, সে যা দেখেছে তা সেই কল্পিত শহর। প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই দেখতে পায়নি।

অনুরূপভাবে যে সব মূর্খ এবং কল্পনাবিশ্বাসী মনে করে যে, কোন বিশেষ স্থানে মাটির তলায় সোনা রূপা লুকানো রয়েছে, হীরাজহরত ও মণিমাণিক্য রয়েছে, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে পারে না। যেমন বলা হয়ঃ ধন-ভাণ্ডারের মুখে বড় অজগর বসে আছে অথবা তার উপর জ্বিনের পাহারা রয়েছে। এ ধরনের বাজে ও ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনা করে থাকে। কখনো ধ্যানে বসে, কখনো বা রোগ-ব্যাধির মুক্তির উপায় আছে বলে জানায়। এসব আইয়ামে জাহেলিয়াতের বা প্রাচীন মুসলিম যুগের প্রোথিত কোন ধন সম্পদ ঘটনাক্রমে কেউ পেলে পেতেও পারে, সেখানে দেও, জ্বিন, ভূত প্রেত বা সাপ বিচ্ছু ইত্যাদির আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। এসব অপকাহিনী ফন্দিবাজরা প্রচার করে বেড়ায়। আল্লাহ এদের সুবুদ্ধি দান করুন!

ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এখানে সম্প্রদায় বুঝানো হয়েছে অথবা হয়তো শহর বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক নয়। এখানে তো

সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটা একটা কওমের বর্ণনা। এটা কোন শহরের বর্ণনা নয়। এ কারণেই আদ সম্প্রদায়ের বর্ণনার পরেই সামূদ সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সামূদ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা পাহাড় কেটে কেটে গৃহ নির্মাণ করতো। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فَارِهِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা পাহাড় কেটে প্রশস্ত ও আরামদায়ক বাসগৃহ নির্মাণ করছো।" (২৬ ঃ ১৪৯)

ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, সামুদরা ছিল আরবের অধিবাসী। তারা ফুরা নামক স্থানে বসবাস করতো। আদদের কাহিনী সূরা আ'রাফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর (তুমি কি দেখোনি যে, তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন) কীলক ওয়ালা ফিরাউনের সঙ্গে? اَوْتَاد এর অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কাহিনী বা দল বলে উল্লেখ করেছেন যারা ফিরাউনের কার্যাবলী সুদৃঢ় করতো। এমনও বর্ণিত আছে যে, ফিরাউনের ক্রোধের সময় তারা লোকদের হাতে পায়ে পেরেক পুঁতে মেরে ফেলতো। উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে মাথার মগজ বের করে ফেলতো, তারপর মেরে ফেলা হতো। কেউ কেউ বলেন যে রশি এবং পেরেক নিয়ে তার সামনে খেলা করা হতো। এর একটি কারণ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর স্ত্রী (হযরত আছিয়া (রাঃ) মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে পিঠের ভরে শুইয়ে দিয়ে হাতে পায়ে পেরেক মেরে দেয়া হয়েছিল। তারপর পেটের উপর প্রকাণ্ড পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ঐ পুণ্যবতী মহিলার প্রতি অনুগ্রহ করুন!

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। অর্থাৎ যারা নগরসমূহে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার পরে অধিক মাত্রায় উপদ্রব করেছিল। যারা মানুষকে খুবই নিকৃষ্ট মনে করতো এবং নানাভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন করতো। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি শাস্তির বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। অর্থাৎ তাদের প্রতি অবশেষে এমন শাস্তি এসেছে যে, তা টলানো যায়নি। ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি প্রত্যেককে ভাল

মন্দের বিনিময় প্রদান করবেন। সমস্ত মানুষ অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যাবে এবং সবাই এককভাবে বিচারের জন্য দাঁড়াবে। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা সবারই প্রতি সুবিচার করবেন। তিনি সর্বপ্রকার অত্যাচার হতে মুক্ত ও পবিত্র। এখানে ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওটা খুবই গারীব বা দুর্বল হাদীস। ওর সনদের ব্যাপারে বক্তব্য রয়েছে এবং ওর সঠিকতার ক্ষেত্রেও চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। ঐ হাদীসটি হযরত মুআয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে মুআয (রাঃ)! (জেনে রেখো যে,) মুমিন ব্যক্তি হকের নিকট বন্দী। হে মুআয! পুলসিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত মুমিন ভয় ও উদ্বেগ হতে নিরাপত্তা লাভ করবে না। হে মুআয (রাঃ)! কুরআন মুমিনকে তার অনেক ইচ্ছা হতে বিরত রাখে।, যাতে সে ধ্বংস হতে রক্ষা পেতে পারে। কুরআন তার দলীল, ভয়ভীতি তার হুজ্জত, আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ তার বাহন, নামায তার আশ্রয়, রোযা তার ঢাল, সাদকা তার ছাড়পত্র, সততা তার আমীর এবং লজ্জা তার উযীর। এ সবের পরেও তার প্রতিপালক তার সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তিনি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন।"[১]

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমেরই অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত ইবনে আবদিল কালাঈ (রঃ) তাঁর একভাষণে বলেনঃ হে জনমণ্ডলী! জাহান্নামের সাতটি পুল রয়েছে। প্রত্যেকটির উপর সিরাত বা পথ রয়েছে। প্রথম পুলসিরাতের উপরই মানুষকে আটক করে দেয়া হবে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেনঃ

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ - অর্থাৎ "তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।" অতঃপর তাদের কাছে নামাযের হিসাব নেয়া হবে। তারপর যারা মুক্তি পাবার তারা মুক্তি পাবে এবং যারা ধ্বংস হবার তারা ধ্বংস হবে। এরপর যখন তারা দ্বিতীয় পুলসিরাতে পৌঁছবে তখন তাদের কাছে আমানতের হিসাব নেয়া হবে যে, কিভাবে তা আদায় করেছিল এবং কিভাবে খিয়ানত করেছিল। সুতরাং এখানেও যারা মুক্তি পাওয়ার তারা মুক্তি পাবে এবং যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর যখন তারা তৃতীয় পুলসিরাতে পৌঁছবে তখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে, কিভাবে তারা তা মিলিত

---

[১] এ হাদীসটি দু'জন বর্ণনাকারী ইউনুস হিযা, ও আবু হামযাহ অজ্ঞাত। এটা মুরসাল হাদীস। সম্ভবতঃ এটা আবূ হামযাহর উক্তি হবে।

রেখেছে এবং কিভাবে ছিন্ন করেছে। এখানেও যারা পরিত্রাণ লাভ করার তারা পরিত্রাণ লাভ করবে এবং যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হবে। এই আত্মীয়তা সেই দিন স্বয়ং অবয়ব ধারণ করে বলবেঃ "হে আল্লাহ! যে আমার সাথে সম্পর্ক মিলিত রেখেছে তার সাথে আপনিও সম্পর্ক মিলিত রাখুন এবং যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আপনিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন!" আল্লাহ্ তা'আলার এরশাদ করেন اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ এর ভাবার্থ এটাই।"

١٥– فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ط ○

১৫। মানুষ তো এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন, পরে তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ সম্পদ দান করেন, তখন সে বলেঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।

١٦– وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ ج ○

১৬। এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তৎপর তার রিয্‌ক সংকুচিত করেন, তখন সে বলেঃ আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন।

١٧– كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ○

১৭। না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা পিতৃহীনের সম্মান কর না।

١٨– وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ لا ○

১৮। এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

١٩– وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا لا ○

১৯। এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেলে থাকো,

٢٠– وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ط ○

২০। এবং তোমরা ধন সম্পদের অত্যধিক মায়া করে থাকো।

ভাবার্থ হচ্ছেঃ যে সব লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশস্ততা পেয়ে মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্মান করেছেন, তারা ভুল মনে করে। বরং এটা তাদের প্রতি একটা পরীক্ষা বৈ কিছু নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِينَ ـ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَّا يَشْعُرُونَ ـ

অর্থাৎ "আমি যে তাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করছি, এতে কি তারা ধারণা করছে যে, আমি তাদের কল্যাণ সাধন করছি? (না, তা কখনও নয়) বরং তারা বুঝে না।" (২৩ ঃ ৫৫-৫৬) এটা তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের দেয়া সম্মান, কল্যাণ ও পুরস্কার নয়। বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর একটা পরীক্ষা।

আবার যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালক পরীক্ষা করেন এবং তাদের রিয্ক সংকুচিত করে দেন তখন তারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে হীন করেছেন। অথচ এসব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয়। এ কারণেই كَلَّا দ্বারা উপরোক্ত উভয় ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। এটা প্রকৃত ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ্ যার মাল ধনে প্রশস্ততা দান করেছেন তার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং যার ধন সম্পদ সংকুচিত করে দিয়েছেন তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। বরং এই উভয় অবস্থায় স্বীয় চরিত্র ঠিক রেখে কাজ করে যাওয়াই তার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র উপায়। ধনী হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দরিদ্র হয়ে ধৈর্য ধারণ করাই বরং আল্লাহর প্রেমিকের পরিচয়। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় প্রকারেই তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।

অতঃপর ইয়াতীমদেরকে সম্মান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে এবং তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করা হচ্ছে সেই ঘর সবচেয়ে উত্তম ঘর। আর যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে সেই ঘর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘর।" অতঃপর নবী করীম (সঃ) স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেনঃ "আমি এবং ইয়াতীমের লালন পালনকারী এই ভাবে জান্নাতে অবস্থান করবো।" সুনানে আবি দাউদে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি এবং

ইয়াতীমদের লালন পালনকারী এভাবে জান্নাতে থাকবো।” ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে মিলিত করে ইশারা করলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান ও আদর যত্ন কর না এবং অভাব গ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে থাকো আর তোমরা ধন-দৌলতের প্রতি অতিমাত্রায় ভালবাসা রাখ (কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়)।

٢١- كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ○ لا

২১। এটা সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণচূর্ণরূপে বিচুর্ণিত করা হবে;

٢٢- وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ○ ج

২২। এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও (সমুপস্থিত হবে);

٢٣- وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ○ ط

২৩। সেই দিন নরককে আনয়ন করা হবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করবেঃ কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে?

٢٤- يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ○ ج

২৪। সে বলবেঃ হায়! আমার এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রীম পাঠাতাম!

٢٥- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ أَحَدٌ ○ لا

২৫। সেইদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না,

٢٦- وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ أَحَدٌ ○

২৬। এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না।

٢٧- يٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ق صلے

২৭। হে প্রশান্ত চিত্ত!

২৮। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে,	٢٨- ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
২৯। অনন্তর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,	٢٩- فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۝
৩০। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।	٣٠- وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۝

এখানে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেনঃ নিশ্চয়ই সেদিন জমীনকে নিচু করে দেয়া হবে, উচু নিচু জমীন সব সমান করে দেয়া হবে। সমগ্র জমীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। পাহাড় পর্বতকে মাটির সাথে সমতল করে দেয়া হবে। সকল সৃষ্ট জীব কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের বিচারের জন্যে এগিয়ে আসবেন। সকল আদম সন্তানের নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে সুপারিশের জন্যে অনুরোধ করা হবে। অবশ্য এর পূর্বে সমস্ত মাখলুক বড় বড় নবীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সুপারিশের আবেদন জানাবে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন। তারপর তারা মহানবী (সঃ)-এর কাছে এসে সুপারিশের আবেদন জানাবেন। তিনি বলবেনঃ হ্যাঁ, আমি এ জন্যে প্রস্তুত।" নবী করীম (সঃ) তখন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। তিনি বলবেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্যে আসুন।" এটাই প্রথম সুপারিশ। এ আবেদন মাকামে মাহমুদ হতে জানানো হবে। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল ইযযত ফায়সালার জন্যে এগিয়ে আসবেন। তিনি কিভাবে আসবেন সেটা তিনিই ভাল জানেন। ফেরেশতারাও তাঁর সামনে কাতারবন্দী হয়ে হাযির হবেন। জাহান্নামকেও নিয়ে আসা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে।"[১]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে এটা ইমাম তিরমিযীও (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আবদির রহমান দারিমী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

সেদিন মানুষ তার নতুন পুরাতন সকল আমল বা কার্যাবলী স্মরণ করতে থাকবে। মন্দ আমলের জন্যে অনুশোচনা করবে, ভালো কাজ না করা বা কম করার কারণে দুঃখ আফসোস করবে। পাপ কর্মের জন্যে লজ্জিত হবে।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে উমরাহ (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ কোন বান্দা যদি জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকে এবং অল্লাহ তা'আলার পূর্ণ আনুগত্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয় তবুও সে কিয়ামতের দিন তার সকল পুণ্যকে তুচ্ছ ও সামান্য মনে করবে। তার একান্ত ইচ্ছা হবে যে, যদি সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আরো অনেক পুণ্য সঞ্চয় করতে পারতো।'

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সেইদিন আল্লাহর দেয়া আযাবের মত আযাব আর কেউ দিতে পারবে না। তিনি তাঁর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে যে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করবেন ঐরূপ শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধনও কেউ করতে পারে না। ফেরেশতারা আল্লাহর আবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শিকল এবং বেড়ী পরিধান করাবেন।

পাপী ও অন্যায়কারীদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা এখন পুণ্যবানদের অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করছেন। যে সব রূহ তৃপ্ত, শান্ত, পাক পবিত্র এবং সত্যের সহচর, মৃত্যুর সময়ে এবং কবর হতে উঠার সময় তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে, তাঁর পুণ্য ও পারিশ্রমিকের কাছে, জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে ফিরে চলো। এই রূহ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও এর প্রতি সন্তুষ্ট। এই রূহকে এতো দেয়া হবে যে, সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তাকে বলা হবেঃ তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর শানে নাযিল হয়। হযরত বুরাইদাহ্ ইবনে হাসীব (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত হযরত হামযাহ্ ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ)-এর শানে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন প্রশান্ত চিত্ত আত্মাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের সাথী অর্থাৎ দেহের নিকট ফিরে যাও যে দেহ পৃথিবীতে তোমরা ধারণ করেছিলে। তোমরা একে অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত

আছে যে, তিনি فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ - وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ এই ভাবে পাঠ করতেন। অর্থাৎ **“হে প্রশান্ত** চিত্ত রুহ্! তুমি আমার বান্দার মধ্যে অর্থাৎ তার দেহে চলে যাও।” **ইকরামা** (রাঃ) এবং সাকাবী (রঃ)-ও এ কথাই বলেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও এটাই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এ উক্তিটি গারীব বা দুর্বল। প্রথম উক্তিটিই প্রকাশমান। যেহেতু আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেনঃ

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ

অর্থাৎ “অতঃপর সকলকেই তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে।” (৬ঃ ৬২) আর এক জায়গায় আছেঃ

وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ “আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র নিকট।” (৪০ঃ ৪৩) অর্থাৎ তাঁর আদেশের প্রতি এবং তাঁরই সামনে।

মুসনাদে ইবনে আবী হা'তিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ....يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তখন বলে ওঠেনঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! কি সুন্দর বাণী এটা।” তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “(হে আবূ বকর (রাঃ)!) তোমাকেও এ কথাই বলা হবে।” অন্য এক রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে হযরত সাঈদ ইবনে **জুবায়ের (রাঃ) এ আয়াত পাঠ করেছিলেন।** তখন হযরত আবূবকর (রাঃ) বলেছিলেন! **“কী** চমৎকার বাণী!” তখন নবী করীম (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন, “হে আবূবকর (রাঃ)!) তোমাকে তোমার মৃত্যুর সময় ফেরেশতা এ কথাই বলবেন।”

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফে মৃত্যুবরণ করেন। ঐ সময় এমন এক পাখি এলো যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নাই। পাখিটি এসে তাঁর মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করলো। এর পরে পাখিটিকে আর বের হতে দেখা যায় নাই। তাঁকে দাফন করা হলে তাঁর কবরের এক কোণ হতে ....يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এ আয়াতগুলির তিলাওয়াত শোনা গেল। কিন্তু কে তিলাওয়াত করেছেন তা জানা যায় নি।[১]

---

[১] এটা ইমাম ইবনু আবী হা'তিম (রঃ) ও ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবূহা'শিম (রঃ) বলেন ঃ রোম যুদ্ধে আমরা রোম রাজ্যে বন্দি হই। রোমক সম্রাট আমাদেরকে তার সামনে হাযির করে বলেঃ "তোমরা তোমাদের ধর্মমত পরিত্যাগ কর অথবা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।" তারপর একে একে প্রত্যেককে বলা হলোঃ "তোমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় আমি জল্লাদকে আদেশ দিচ্ছি, সে এক্ষুণি তোমাদের দেহ দ্বিখন্ডিত করে দিবে।" তিন জন মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। তারপর ঐ মস্তক এক পুকুরে ফেলে দেয়া হয়। মস্তক পানিতে ডুবে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ভেসে উঠে ধর্মত্যাগকারী তিন ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে তাদের নাম ধরে ধরে ডেকে বললোঃ শোনো, আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেনঃ

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ـ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ـ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ـ

এতোটুকু বলার পরেই ঐ ছিন্ন মস্তক পুনরায় পানিতে ডুবে গেল। স্বয়ং বাদশাহ্ এবং তার সভাষদবর্গ এ ঘট'না প্রত্যক্ষ করলো। খ্রিষ্টানদের উপর এ ঘট'নাটি এতো প্রভাব বিস্তার করলো যে, তারা তখনই মুসলমান হয়ে যেতে চাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ্ দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করলো। ধর্মত্যাগকারী ঐ তিন ব্যক্তি পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসলো। আমরা সবাই তখন থেকে বন্দী জীবন যাপন করছিলাম। অবশেষে খলিফা আবূজা'ফর মনসূরের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে মুক্তিপণ প্রেরণ করা হয়। ফলে আমরা মুক্তি লাভ করি।

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি লোককে নিম্নের দুআ'টি পাঠ করতে বলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضٰى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট এমন নফ্স চাচ্ছি যা আপনার সত্তার প্রতি পরিতৃপ্ত থাকে, আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং আপনার দানে তুষ্ট থাকে।"[১]

সূরা ঃ ফাজর এর তাফসীর সমাপ্ত

---

[১] এ হাদীসটি হা'ফিয ইবনু আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সূরা : বালাদ, মাক্কী

(আয়াত : ২০, রুকূ' : ১)

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٠، رُكُوْعُهَا : ١)

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। শপথ করছি এই নগরের,	١- لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ○ لا
২। আর তুমি এই নগরের বৈধ অধিকারী হবে।	٢- وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ○ لا
৩। শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে তার।	٣- وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ○ لا
৪। অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ক্লেশের মধ্যে।	٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ ○ ط
৫। সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?	٥- اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ○
৬। সে বলেঃ আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি।	٦- يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ○ ط
৭। সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউই দেখছে না?	٧- اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ ○ ط
৮। আমি কি তার জন্যে সৃষ্টি করিনি চক্ষুযুগল?	٨- اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ○ لا
৯। আর জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়?	٩- وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ○ لا
১০। এবং আমি কি তাকে দু'টি পথই দেখাইনি?	١٠- وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ○ ج

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এখানে জনবসতিপূর্ণ শান্তির সময়ের মক্কা মুআয্যমার শপথ করছেন। তিনি শপথ করে বলেছেনঃ হে নবী (সঃ) এখানে একবার তোমার জন্যে যুদ্ধ বৈধ হবে, তাতে কোন পাপ বা অন্যায় হবে না। আর ঐ যুদ্ধে যা কিছু পাওয়া যাবে সেগুলো তোমার জন্যে শুধু ঐ সময়ের জন্যে বৈধ হবে।

সহীহ্ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, এই বরকত পূর্ণ শহর মক্কাকে আল্লাহ্ তাআ'লা প্রথম দিন থেকেই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। এই সম্মান ও মর্যাদা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কতকগুলো কাজ এখানে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন তথাকার কোন গাছ কাটা যাবে না, কোন কাঁটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না। আমার জন্যে শুধুমাত্র একটি দিনের এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বৈধ করা হয়েছিল, আজ আবার আমার জন্যেও নিষিদ্ধ সম্পর্কিত আদেশ পূর্বের মতই বলবৎ থাকবে। প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তির দায়িত্ব হলো অনুপস্থিত লোকদের নিকট খবর পৌঁছিয়ে দেয়া।"

একটি হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "এখানে (মক্কায়) যুদ্ধ-বিগ্রহের বৈধতা সম্বন্ধে কেউ আমার যুদ্ধকে যুক্তি হিসেবে পেশ করলে তাকে বলে দিতে হবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জন্য অনুমতি দিয়েছেন, তোমাদের জন্যে দেননি।"

এরপর আল্লাহ্ তাআ'লা পিতা এবং সন্তানের শপথ করেছেন। কারো কারো মতে مَاوَلَدَ শব্দের مَا শব্দটি আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় مَانَافِيَة বা নেতিবাচক مَا। অর্থাৎ যার সন্তান আছে তার এবং যে নিঃসন্তান তার শপথ। আর যদি ব্যাকরণের পরিভাষায় مَا কে مَوْصُوْلَه মনে করা হয় তাহলে অর্থ হবেঃ পিতার এবং সন্তানদের শপথ। পিতা দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-কে এবং সন্তান দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এই উক্তিটিই উত্তম বলে অনুভূত হচ্ছে কেননা, এর পূর্বে মক্কাভূমির শপথ করা হয়েছে যা সমস্ত জমীন ও বস্তিসমূহের জননী। অতঃপর মক্কার অধিবাসীদের শপথ করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষের মূল বা শিকড় হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের শপথ করা হয়েছে। আবূ ইমরান (রঃ) বলেন যে, এখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে সাধারণভাবে সকল পিতা এবং সকল সন্তানের কথা বলা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ আমি মানুষকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর, সুষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছি। মায়ের পেটেই তাকে এই পবিত্র গঠন-বিন্যাস এবং উন্নত আকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ - الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ - فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ -

“হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন। যেই আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” (৮২ ঃ ৬-৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

অর্থাৎ “আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।” (৯৫ঃ ৪) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি তাকে শক্তি-সামর্থ সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি। মানুষের উচিত তার নিজের প্রতি লক্ষ্য করা,তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা, তার দাঁত বের হওয়া ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করা। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, মানুষ প্রথমে ছিল বীর্য বা শুক্র, তারপরে হয়েছে রক্তপিন্ড এবং এরপরে হয়েছে গোশতটুকরা। মোটকথা, মানুষের জন্ম খুবই বিস্ময়কর এবং কষ্টকরও বটে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا -

অর্থাৎ “তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে বহন করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে।” (৪৬ ঃ ১৫) মা সন্তানকে দুধ পান করানোতে এবং লালন-পালন করাতেও কঠিন কষ্ট স্বীকার করেছে। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ কঠিন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হলো ঃ কঠিন অবস্থায় এবং দীর্ঘ সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। দাঁড়ানো অবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এমনিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কষ্ট সহ্য করতে হয়। হযরত আদম (আঃ) যেহেতু আসমানে সৃষ্ট হয়েছিলেন এ কারণেই এটা বলা হয়েছে।

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন তারা কি মনে করে যে, তাদের উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? অর্থাৎ তারা ধারণা করে যে, তাদের ধন-মাল নিতে কেউ সক্ষম নয়? তারা কি মনে করে যে, তাদের উপর কারো কর্তৃত্ব নেই? তারা কি জিজ্ঞাসিত হবে না যে, তারা কোথা থেকে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? নিঃসন্দেহে তাদের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব রয়েছে এবং

আল্লাহ তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তারা বলে বেড়ায়ঃ আমরা বহু ধনমাল খরচ করে ফেলেছি। তারা কি মনে করে যে, তাদেরকে কেউ দেখছে না? অর্থাৎ তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য মনে করে?

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি কি মানুষকে দেখার জন্যে দুটি চক্ষু প্রদান করিনি? মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে কি আমি তাদেরকে জিহ্বা দিইনি? কথা বলার জন্যে, পানাহারের জন্যে, চেহারা ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে কি আমি তাদেরকে দুটি ওষ্ঠ প্রদান করিনি?

নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে অসংখ্য বড় বড় নিয়ামত দান করেছি যেগুলো তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। ওগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তিও তোমাদের নেই। আমি তোমাদেরকে দেখার জন্যে দুটি চক্ষু দান করেছি। তারপর সেই চোখের উপর গিলাফ সৃষ্টি করেছি। কাজেই হালাল জিনিসের প্রতি সেই চোখ দ্বারা তাকাও এবং হারাম বা নিষিদ্ধ জিনিস সামনে এলে চক্ষু বন্ধ করে ফেলো। আমি তোমাদেরকে জিহ্বা দিয়েছি এবং ওর গিলাফও দিয়েছি। সুতরাং আমার সন্তুষ্টিমূলক কথা মুখ থেকে বের কর এবং অসন্তুষ্টিমূলক কথা থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখো। আমি তোমাদেরকে লজ্জাস্থান দিয়েছি এবং ওর মধ্যে পর্দা দিয়েছি। কাজেই বৈধ ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করো, কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রে পর্দা স্থাপন করো। হে আদম সন্তান! আমার অসন্তুষ্টি সহ্য করার মত শক্তি তোমাদের নেই। আমার শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই।"[১]

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ আমি তাদেরকে ভালো মন্দ দুটি পথই দেখিয়েছি। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "(ভালো ও মন্দ) এ দু'টি পথ, মন্দ পথকে তোমাদের নিকট তিনি ভালো পথ হতে পছন্দনীয় ও প্রিয় করেননি।" কিন্তু এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। তবে মুরসালরূপেও এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দুই নাজদ দ্বারা দুই স্তনকে বুঝানো হয়েছে। আরও কতিপয় তাফসীরকার এ কথাই বলেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) বলেন যে, প্রথম উক্তিটিই সঠিক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

---

১. এ হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا - إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

অর্থাৎ “আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্র বিন্দু হতে, তাকে **পরীক্ষা** করবার জন্যে, এ জন্যে আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।” (৭৬ ঃ ২-৩)

১১। কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করলো না।	١١- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ○ زصلے
১২। তুমি কি জান যে, গিরিসংকট কি?	١٢- وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ○ ط
১৩। এটা হচ্ছেঃ দাসকে মুক্তি প্রদান;	١٣- فَكُّ رَقَبَةٍ ○ لا
১৪। অথবা, দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান;	١٤- أَوْ إِطْعٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ○ لا
১৫। পিতৃহীন, আত্মীয়কে,	١٥- يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ○ لا
১৬। অথবা ধুলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে,	١٦- أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ○ ط
১৭। তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া মুমিনদেরকে এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের;	١٧- ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ○ ط
১৮। তারাই সৌভাগ্যশালী।	١٨- أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ○ ط
১৯। এবং যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য।	١٩- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ○ ط
২০। তাদের উপরই অবরুদ্ধ নরকাগ্নি রয়েছে।	٢٠- عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ○ ع ١ ٢٠ ١٥

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, আকাবা হলো জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম। হযরত কাব আহবার (রাঃ) বলেন যে, ওটা হলো জাহান্নামের সত্তরটি সোপান। কাতাদা (রঃ) বলেনঃ এটা প্রবেশ করার শক্ত ঘাঁটি, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমে তাতে প্রবেশ কর। এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ তোমার কি জানা আছে, এ ঘাঁটি কি? অতঃপর বলেনঃ গোলাম আযাদ করা এবং আল্লাহর নামে অন্নদান করা।

ইবনে যায়েদ বলেনঃ অর্থাৎ ওরা মুক্তি ও কল্যাণের পথে চলেনি কেন? তারপর মানুষকে সর্তক করতে গিয়ে বলা হচ্ছেঃ তোমরা কি জান আকাবা' কি? কোন গর্দানকে মুক্ত করা বা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা। আয়াতাংশ فَكُّ رَقَبَةٍ অথবা فَكَّ رَقَبَةً দু'ভাবে পড়াই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ اِضَافَتْ এর সাথেও পড়া হয়েছে, আবার فَكَّ -কে فِعل এবং هُوَ সর্বনামকে فَاعِل এবং رَقَبَةً কে مَفْعُول করেও পড়া হয়েছে। এই দু'টো কিরআতই বিশুদ্ধ।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিন গর্দান কে অর্থাৎ কোন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ তা'আলা ঐ গোলামের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তি দান করে থাকেন। এমন কি, হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা এবং লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান।"

হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) এ হাদীসটি শোনার পর এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত সাঈদ ইবনে মারজানা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কি স্বয়ং হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর মুখে এ হাদীসটি শুনেছেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ।" তখন হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) তাঁর গোলাম মাতরাফকে ডেকে বলেনঃ "যাও, তুমি আল্লাহ্র নামে মুক্ত।"[১]

হযরত আবূ নাজীহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যে মুসলমান কোন মুসলমান (দাস) কে মুক্ত করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার এক একটি হাড়ের বিনিময়ে ঐ মুক্তকারীর এক একটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করেন। আর যে মুসলমান নারী কোন মুসলমান

---

১. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, জা'মে" তিরমিযী এবং সুনানে নাসায়ীতেও বর্ণিত আছে। সহীহ্ মুসলিমে এ কথাও রয়েছে যে ঐ গোলামটিকে দশ হাজার দিরহামে ক্রয় করা হয়েছিল।

নারী (দাসী) কে আযাদ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার এক একটি হাড়কে ঐ মুক্তি **প্রাপ্তা** দাসীর এক একটি হাড়ের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা **করেন**।”১

মুসনাদে আহমদে হযরত আমর ইবনে আবাসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিক্রের উদ্দেশ্যে মসজিদ বানিয়ে দেয়, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতে ঘর বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে মুক্ত করে, আল্লাহ্ ওটাকে ঐ মুক্তকারীর ফিদইয়া (মুক্তিপণ) হিসেবে গণ্য করেন এবং তাকে জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তি দান করে থাকেন। যে ব্যক্তি ইসলামে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাকে কিয়ামতের দিন নূর দেয়া হবে।”

অন্য এক রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে তীর নিক্ষেপ করবে, ঐ তীর (লক্ষ্য স্থলে) লাগুক বা নাই লাগুক, সে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরের মধ্য হতে একটি দাস মুক্ত করার সওয়াব লাভ করবে।”

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ “যে মুসলমানের তিনটি সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, আল্লাহ্ তাকে স্বীয় রহমতের গুণে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে দুই জোড়া দান করবে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দিবেন, যে দরজা দিয়ে সে খুশি প্রবেশ করবে।”২

সুনানে আবী দাউদে হযরত আ'রীফ ইবনে আইয়াশে দাইলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা হযরত ওয়ায়েলা' ইবনে আশকা'র (রাঃ) কাছে গিয়ে বললামঃ আমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনিয়ে দিন যাতে বেশি কম কিছু না থাকে। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ঘরে রক্ষিত কুরআন মাজীদ পাঠ করে তবে সে কি তাতে কম-বেশী করে? আমরা বললামঃ জনাব! আমরা এরূপ বলতে চাইনি, বরং আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হতে যে হাদীস শুনেছেন তা আমাদেরকে শুনান। তিনি তখন বললেনঃ একবার আমি আমার এক সঙ্গীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে আগমন করি। আমার ঐ সঙ্গী হত্যার মাধ্যমে নিজের উপর জাহান্নাম ওয়াজীব করে নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ “তার পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দাসের এক

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসগুলো মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সনদ খুবই উত্তম।

একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে মুক্তকারীর একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবেন।"[১]

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি কারো গর্দান মুক্ত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কাজকে তার জন্যে ফিদিয়া' রূপে গণ্য করবেন। এ ধরনের আরও বহু হাদীস রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত বারা' ইবনে আ'যিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ "অল্প কথায় তুমি খুব বড় প্রশ্ন করে বসেছো। দাস মুক্ত কর, গর্দান মুক্ত কর।" বেদুইন বললোঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! এ দু'টি কি একার্থবোধক নয়?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "না। দাস মুক্ত করার অর্থ হলো এই যে, তুমি একাকী একটি দাস মুক্ত করে দিবে। আর فَكُّ رَقَبَةٍ এর অর্থ হলোঃ দাসমুক্ত করার ব্যাপারে কম বেশী সাহায্য করা, দুধেল পশু দুধ পানের জন্যে কোন মিসকীনকে দেয়া, অত্যাচারী আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, এসবই হলো জান্নাতে প্রবিষ্ট করার মত কাজ। যদি তুমি এসব করতে সক্ষম না হও তবে ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, পিপাসার্তকে পানি দাও, ন্যায়ের আদেশ কর এবং অন্যায় হতে বিরত রাখো। যদি তুমি এতেও সক্ষম না হও তবে পুণ্য ও ন্যায়ের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা মুখ হতে বের করো না।"

ذِىْ مَسْغَبَةٍ এর অর্থ হলো ক্ষুধাতুর। অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে খাদ্য খাওয়ানো। এটাও আবার ঐ শিশুকে যে ইয়াতীম বা পিতৃহীন হয়েছে। আর তার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদে হযরত সালমান ইবনে আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "মিসকীনকে সাদকা দেয়া হলো শুধু সাদকা আর আত্মীয় স্বজনকে সাদকা করলে একই সাথে দু'টি কাজের সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো সাদকার সওয়াব এবং আর একটি হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক মিলিত রাখার সওয়াব।"

অথবা এমন মিসকিনকে আহার্যদান করা যে ধূলালুণ্ঠিত, পথের উপর পড়ে আছে, বাড়িঘর নেই, বিছানাপত্র নেই। ক্ষুধার জ্বালায় পেট মাটির সাথে লেগে আছে। যে নিজের গৃহ হতে দূরে রয়েছে। যে মুসাফির, ফকীর, মিসকীন, পরমুখাপেক্ষী, ঋণী, কপর্দকহীন, খবরাখবর নেয়ার মত যার কেউ নেই। যার পরিবার-সদস্য অনেক অথচ সম্পদ কিছুই নেই। এসবই প্রায় একই অর্থবোধক।

---

[১] এ হাদীসটি সুনানে নাসায়ীতেও বর্ণিত হয়েছে।

তদুপরি এই ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেইসব কাজের জন্যে আল্লাহ্র কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করে। সেই পুরস্কৃত হবে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ ....وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আখেরাতের ইচ্ছা রাখে এবং সে জন্য চেষ্টা করে, আর আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হয়, তার প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا

অর্থাৎ, "বিশ্বাসীদের মধ্যে যে নারী-পুরুষ পুণ্য কাজ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে জান্নাতের রিয্ক লাভ করবে।" (৪০ঃ ৪০)

তারপর তাদের আরো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তারা লোকদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার এবং তাদের প্রতি পরস্পর সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ করার জন্যে একে অপরকে নসীহত করে। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছেঃ "তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।" অন্য এক হাদীসে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয় না।"

সুনানে আবি দাউদে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে না এবং আমাদের বড়দের অধিকার উপলব্ধি করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ এ সব লোক তারাই যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। আর আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলে অবিশ্বাস করেছে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তারা অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে। ঐ অগ্নি হতে কোন দিন মুক্তিও পাওয়া যাবে না এবং অব্যাহতিও মিলবে না। ঐ আগুনের দরজা তাদের উপর অবরুদ্ধ থাকবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা সূরা وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এর মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তার মধ্যে কোন জানালা থাকবে না, ছিদ্র থাকবে না। সেই জায়গা হতে কখনো বের হওয়া সম্ভব হবে না।

হযরত আবূ ইমরান আলী জূদী (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ্রোহীকে, প্রত্যেক শয়তানকে এবং ঐ ব্যক্তিকে, যাদের অত্যাচারে পৃথিবীতে মানুষ ভীত ও অতিষ্ঠ থাকতো, তাদের প্রত্যেককে লোহার শিকলে শক্ত করে বেঁধে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন। তারপর জাহান্নামকে অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে। আল্লাহর কসম! তারা তা থেকে কখনো স্থানান্তরিত হবে না। আল্লাহর কসম! তারা কখনো আকাশ দেখতে পাবে না। আল্লাহর কসম! কিছুটা আরামে কখনো তাদের দু'চোখের পাতা বন্ধ হবে না (অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্যেও তারা এমন শান্তি লাভ করবে না যার ফলে তাদের নিদ্রা আসতে পারে।) আল্লাহর শপথ! তারা কখনো সুস্বাদু খাবার খেতে পাবে না।

সূরা ঃ বালাদ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ আশ্‌শামসি, মাক্কী

(আয়াত ঃ ১৫, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٥، رُكُوْعُهَا : ١)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতিপূর্বে গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মুআ'য(রাঃ)কে বলেনঃ "তুমি কি وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا - سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এসব সূরা দ্বারা নামায পড়তে পার না?

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। শপথ সূর্যের এবং ওর কিরণের,	١- وَالشَّمْسِ وَضُحٰـهَا ○ صلے
২। শপথ চন্দ্রের, যখন ওটা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,	٢- وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰـهَا ○ صلے
৩। শপথ দিবসের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে,	٣- وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰـهَا ○ صلے
৪। শপথ রজনীর, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে,	٤- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰـهَا ○ صلے
৫। শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তাঁর,	٥- وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰـهَا ○ صلے
৬। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি ওকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর,	٦- وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰـهَا ○ صلے
৭। শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন,	٧- وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىـهَا ○
৮। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন,	٨- فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىـهَا ○ صلے
৯। সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।	٩- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰـهَا ○

١٠- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○

১০। এবং সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ضُحٰهَا শব্দের অর্থ হলো আলোক। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণদিন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও দিবসের শপথ করেছেন। আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে চাঁদ চমকায় তার শপথ করেছেন। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, মাসের মধ্যে প্রথম পনেরো দিন চন্দ্র সূর্যের পিছনে থাকে এবং শেষের পনেরো দিন সূর্যের আগে থাকে। যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ লাইলাতুল কদরের চাঁদ। তারপর দিবসের শপথ করা হয়েছে যখন তা আলোকিত হয়। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ দিন যখন অন্ধকারকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, দিগদিগন্তকে যখন সেই সূর্য চমকিত, আলোক উদ্ভাসিত করে দেয়, তাহলে বেশি মানানসই হয় এবং يَغْشٰهَا এর অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ কারণে হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ দিনের শপথ, যখন সূর্য তাকে আলোকিত করে দেয়। এখানে সূর্যের কথাই বলা হয়েছে।

রাত্রি যখন সূর্যকে ঢেকে দেয় এবং চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ইয়াযীদ ইবনে যী হামামাহ (রঃ) বলেন যে, যখন রাত্রি আসে তখন আল্লাহ জাল্লাজালালুহু বলেনঃ আমার বান্দাদেরকে আমার এক বিপুলাকার মাখলুক ঢেকে দিয়েছে। কাজেই মাখলুক বা সৃষ্টিজগত যখন রাত্রিকে ভয় করে তখন রাত্রির স্রষ্টাকে আরো বেশী ভয় করা উচিত।[১]

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের শপথ করেছেন। এখানে যে مَا ব্যবহার করা হয়েছে, আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় এটাকে মা মাসদারিয়্যাহও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আসমান ও তার সৃষ্টি কৌশলের শপথ। হযরত কাতাদা (রঃ) এ কথাই বলেন। আর এই مَا - مَنْ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাহলে অর্থ হবেঃ আসমানের শপথ এবং তার স্রষ্টা অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার শপথ। মুজাহিদও (রঃ) এ কথাই বলেন। এ দু'টি অর্থ একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। بَنٰى এর অর্থ হচ্ছে উচ্চ করা যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

---

[১] এটা মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ـ وَ الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আসমানকে আমি প্রশস্ততা সম্পন্ন করে সৃষ্টিকারী। আর জমীনকে **আমি বিছিয়ে** দিয়েছি এবং আমি কতইনা উত্তমরূপে বিছিয়ে থাকি।" (৫১ ঃ ৪৭-৪৮) এখানে বলা হয়েছেঃ জমীনের, ওকে সমতলকরণের, ওর বিছানোর, ওকে প্রশস্তকরণের, ওর বন্টনের এবং ওর মধ্যকার সৃষ্ট জীবসমূহের শপথ। এর তাফসীরে একে প্রশস্তকরণের উক্তিটিই বেশী প্রসিদ্ধ। ভাষাবিদদের নিকটেও এটাই পরিচিত। জাওহারী (রঃ) বলেন যে, طَحُوْنَةً শব্দটি دَحُوْنَةً শব্দের মত, যার অর্থ হলো বিস্তৃত করা। অধিকাংশ তাফসীরকারের উক্তি এটাই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তাকে সুঠাম করেছেন অর্থাৎ যখন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন সে ঠিকঠাক অবস্থায় অর্থাৎ ফিতরাতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "তুমি একাগ্রতার সাথে স্বীয় চেহারাকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো, এটা হলো আল্লাহর ফিতরাত যার উপর তিনি লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।" (৩০ঃ ৩০)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা মাজুসীরূপে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তোমরা তাদের কাউকেও কান কাটা অবস্থায় দেখতে পাও কি?"[১]

সহীহ মুসলিমে হযরত আইয়াম ইবনে হাম্মাদ মাজাশেঈ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি আমার বান্দাদেরকে একাগ্রচিত্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শয়তানরা এসে ধর্মপথ থেকে সরিয়ে তাদেরকে বিপথে নিয়ে গেছে।"

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তিনি তাকে তার অসৎকর্ম এবং তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন আর তার ভাগ্যে যা কিছু ছিল সে দিকে তাকে পথ নির্দেশ করেছেন।

---

[১] এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তিনি ভালমন্দ প্রকাশ করে দিয়েছেন। হযরত আবুল আসওয়াদ (রঃ) বলেনঃ আমাকে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ মানুষ যা কিছু আমল করে এবং কষ্ট সহ্য করে এসব কি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে? তাদের ভাগ্যে কি এরকমই লিপিবদ্ধ আছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের স্বভাবগতভাবে আগামীর জন্যে করে যাচ্ছে? যেহেতু তাদের কাছে নবী এসেছেন এবং আল্লাহর হুজ্জত তাদের উপর পূর্ণ হয়েছে এবং এজন্যে এ সব কিছু এভাবে করছে? আমি জবাবে বললামঃ না, না। বরং এসবই পূর্বহতে নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হয়ে আছে। হযরত ইমরান (রঃ) তখন বললেনঃ তা হলে কি এটা জুলুম হবে না? এ কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। আতঙ্কিত স্বরে বললামঃ সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক তো সেই আল্লাহ। সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁরই হাতে রয়েছে। তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে কারো কিছু জিজ্ঞেস করার শক্তি নেই। তিনিই বরং সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আমার এ জবাব শুনে হযরত ইমরান খুবই খুশী হলেন। তারপর বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সুস্থতা দান করুন। আমি পরীক্ষামূলকভাবেই তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। শোন, মুযাইনা অথবা জুহাইনা গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করে যে প্রশ্ন আমি তোমাকে করেছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে তোমার মতই উত্তর দিয়েছিলেন। লোকটি তখন বলেছিলঃ "তা হলে আর আমাদের আমলে কি হবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেছিলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা যাকে যে জায়গার জন্যে সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সেই সেই জায়গার অনুরূপ আমলই প্রকাশ পাবে। যদি আল্লাহ তাকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করে থাকেন তবে জান্নাতের কার্যাবলীই তার জন্যে সহজ হবে। আর যদি জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করে থাকেন তবে জাহান্নামের কার্যাবলীই তার জন্যে সহজ হবে। এই কথার সত্যতা আল্লাহর কিতাবের নিম্নের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۔ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۔

অর্থাৎ "শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।"[১]

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র রাখবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। অর্থাৎ যে নিজেকে আল্লাহর

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবে সে কৃতকার্য হবে যেমন **আল্লাহ** তা'আলা অন্য **জায়গায় বলেনঃ**

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ـ وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

অর্থাৎ "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে।" আর সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে, এ ভাবে যে, সে নিজেকে হিদায়াত থেকে সরিয়ে নিবে, ফলে সে নাফরমানীতে নিয়োজিত থাকবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিবে। পরিণামে সে ব্যর্থ ও নিরাশ হবে। আর এও অর্থ হতে পারেঃ যে নফ্‌সকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র করেছেন সে সফলকাম হয়েছে। আর যে নফ্‌সকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিচে নিক্ষেপ করেছেন সে বরবাদ, ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরুপায় হয়েছে। আওফী (রঃ) এবং আলী ইবনে আবী তালহা (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন।[১]

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম (সঃ)কে قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এ আয়াতের তাফসীরে বলতে শুনেছেনঃ "যে নফ্‌সকে আল্লাহ পবিত্র করেছেন সেই নফ্‌স নিষ্কৃতি লাভ করেছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ـ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا পাঠ করতেন তখন তিনি থেমে যেতেন। অতঃপর বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا ، اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا وَخَيْرُمَنْ زَكّٰهَا ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার নফ্‌সকে আপনি ধর্মানুরাগ দান করুন! আপনিই ওর অভিভাবক ও প্রভু এবং ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী।"[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا পাঠ করার পর বলতে শুনেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُمَنْ زَكّٰهَا ، اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ـ

---

[১] এ হাদীসের একটি ত্রুটি এই যে, জুওয়াইবির (ইবনে সাঈদ) হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিত্যক্ত অর্থাৎ উসূলে হাদীসের পরিভাষায় 'মাতরূকুল হাদীস'। দ্বিতীয় ত্রুটি এ যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনাকারী যহহাকের (রঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয়।

[২] এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমার নফ্‌সকে আপনি সংযমশীলতা দান করুন। এবং ওকে পবিত্র করুন! আপনি তো ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী! আপনিই ওর ওয়ালী ও মাওলা।”[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি দেখি যে, নবী করীম (সঃ) বিছানায় নেই। আমি তখন অন্ধকারে হাতরাতে লাগলাম। হঠাৎ তাঁর উপর আমার হাত পড়ে গেল। ঐ সময় তিনি সিজদায় ছিলেন এবং পাঠ করছিলেনঃ

رَبِّ اَعْطِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ـ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমার নফ্‌সকে আপনি সংযমশীলতা দান করুন! এবং ওকে পবিত্র করুন! আপনি তো ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী। আপনি ওর ওয়ালী ও মাওলা।”[২]

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا، اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا ـ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, এবং বার্ধক্য, ভীরুতা,কৃপণতা ও কবরের আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া দান করুন এবং ওকে পবিত্র করে দিন! আপনিই তো ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী। আপনিই ওর ওয়ালী ও মাওলা। হে আল্লাহ! আপনার ভয় নেই এমন অন্তরের অধিকারী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং এমন নফ্‌স হতে রক্ষা করুন যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। এমন ইলম হতে রক্ষা করুন যা কোন উপকারে আসে না। আর এমন দু'আ হতে রক্ষা করুন যা কবুল হয় না।”

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি শুধু ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এ দু'আ শিখাতেন এবং আমরা তোমাদেরকে তা শিখাচ্ছি।"[১]

١١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ ۝

১১। সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করলো।

١٢- اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝

১২। সুতরাং তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠলো,

١٣- فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝

১৩। তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললোঃ আল্লাহর উষ্ট্রী ও, ওকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও।

١٤- فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۝

১৪। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো, অতঃপর ঐ উষ্ট্রীকে কেটে ফেললো। সুতরাং তাদের পাপের জন্যে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন, অনন্তর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন।

١٥- وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

১৫। আর তিনি ওর পরিণামকে ভয় করলেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সামূদ গোত্রের লোকেরা হঠকারিতা করে এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের রাসূল (আঃ)কে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে। মুহাম্মদ ইবনে কাব (রঃ) বলেন, بِطَغْوٰهَا এর ভাবার্থ হলোঃ তারা সবাই মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই অধিক উত্তম। হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত কাতাদা ও (রঃ) এ কথাই বলেছেন। এ হঠকারিতা এবং মিথ্যাচারের কারণে তারা এমন দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার নাম ছিল কিদার ইবনে সা'লিফ। সে হযরত সালিহ্‌র (আঃ) উষ্ট্রীকে কেটে ফেলে। এ সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হয়েছেঃ

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ـ

অর্থাৎ "তারা তাদের সঙ্গীকে আহ্বান করলো, তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে এসে গেল এবং উষ্ট্রীকে মেরে ফেললো।" (৫৪ ঃ ২৯) এ লোকটিও তার কওমের মধ্যে সম্মানিত ছিল। সে ছিল সদ্বংশজাত, সম্ভ্রান্ত এবং কওমের নেতা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআ'হ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার তাঁর ভাষণে ঐ উষ্ট্রীর এবং ওর হত্যাকারীর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর বলেনঃ "ঠিক যেন আবু যামআ'হ। এ লোকটিও কিদারের মতই নিজের কওমের নিকট প্রিয়, সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত ছিল।"[১]

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলীকে (সঃ) বলেনঃ "আমি তোমাকে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে পাপী ও নিকৃষ্ট দু'টি লোকের কথা বলছি। এক ব্যক্তি হলো সামূদ জাতির সেই নরাধম যে হযরত সালিহ্‌র (আঃ) উষ্ট্রীকে হত্যা করেছে, আর দ্বিতীয় হলো ঐ ব্যক্তি যে তোমার কপালে যখম করবে। তাতে তোমার শ্মশ্রু রক্ত রঞ্জিত হয়ে যাবে।"

আল্লাহর রাসূল হযরত সালিহ্ (আঃ) তাঁর কওমকে বললেনঃ 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর উস্ট্রীর কোন ক্ষতি করা হতে বিরত থাকো। তার পানি পান করার নির্ধারিত দিনে জুলুম করে তার পানি বন্ধ করো না। তোমাদের এবং তার পানি পানের দিন তারিখ এবং সময় নির্ধারিত রয়েছে।' কিন্তু ঐ দুর্বৃত্তরা নবীর (আঃ) কথা মোটেই গ্রাহ্য করলো না। এই পাপের কারণে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল। তারপর তারা তাদের প্রকাশ্য মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল এবং ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করলো, যাকে আল্লাহ পিতা মাতা ছাড়াই পাথরের একটা টুকরোর মধ্য হতে সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ উষ্ট্রীটি ছিল হযরত সালিহ্‌র

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় তাফসীরে, ইমাম মুসলিম (রঃ) সিফাতুন্নারের মধ্যে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) তাফসীরের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

(আঃ) একটি মু'জিযা। এবং আল্লাহর কুদরতের পূর্ণ নিদর্শন। ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং পাইকারী হারে আযাব দিয়ে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেন। নবী (আঃ)-এর উষ্ট্রী হত্যাকারী ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের ছোট বড় নারী পুরুষ সবাই এ ব্যাপারে সমর্থন করেছিল এবং সবারই পরামর্শক্রমেই সেই নরাধম উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। এ কারণে আল্লাহর আযাবে সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

وَلَايَخَافُ শব্দটি فَلَايَخَافُ রূপেও পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে শাস্তি দিয়ে তার পরিণাম কি হবে তা চিন্তা করেন না। তারা বিগড়ে বসে কিনা সেটারও আল্লাহ তাবারাকাওয়া তা'আলা কোন পরোয়া করেন না। এখানে এও অর্থ হতে পারে যে ঐ দুর্বৃত্ত উষ্ট্রীকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু এর পরিণামকে ভয় করেনি। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই উত্তম। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা ঃ আশ্‌শাম্‌স এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ লাইল মাক্কী

(আয়াতঃ ২১, রুকূ'ঃ ১)

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢١، رُكُوْعُهَا : ١)

নবী করীম (সঃ) হযরত মুআ'যের (রঃ) প্রতি যে উক্তিটি করেছিলেন তা পূর্বেই গত হয়েছে। তাহলো "কেন তুমি নামাযে وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এই সূরাগুলো পাঠ কর না?"

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। শপথ রজনীর, যখন ওটা আচ্ছন্ন করে	١- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ○ لا
২। শপথ দিবসের, যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়	٢- وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ○ لا
৩। এবং শপথ নর ও নারীর যা তিনি সৃষ্টি করেছেন–	٣- وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ○ لا
৪। অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন মুখী।	٤- اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ○ ط
৫। সুতরাং কেউ দান করলে, সংযত হলে	٥- فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ○ لا
৬। এবং সদ্বিষয়কে সত্য জ্ঞান করলে,	٦- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ○ لا
৭। অচিরেই আমি তার জন্যে সুগম করে দিবো সহজ পথ	٧- فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ○ ط
৮। পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে,	٨- وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ○ لا
৯। আর সদ্বিষয়ে অসত্যারোপ করলে,	٩- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ○ لا

১০। অচিরেই তার জন্যে আমি সুগম করে দিবো কঠোর পরিণামের পথ।	١٠- فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ○
১১। এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।	١١- وَمَـا يُغْنِىْ عَنْهُ مَـالُهٗ اِذَا تَرَدّٰى ○

মুসনাদে আহমদে হযরত আলকামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিরিয়ায় আগমন করেন এবং দামেস্কের মসজিদে গিয়ে দুই রাকআ'ত নামায পড়েন। অতঃপর দুআ' করেনঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে একজন উত্তম সাথী দান করুন!" এরপর হযরত আবুদ দারদা'র (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত আবুদ দারদা' (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কোথাকার লোক? তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি একজন কুফার অধিবাসী।" হযরত আবুদ দারদা' (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ "আপনি ইবনে উম্মি আব্দ (রাঃ)-কে وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى এ সূরাটি কিভাবে পড়তে শুনেছেন?" জবাবে হযরত আলকামা (রাঃ) বলেনঃ "তিনি وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى পড়তেন।" তখন হযরত আবুদ দারদা' (রাঃ) বললেনঃ "আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এ সূরাটি এ ভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ জনগণ আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।" অতঃপর তিনি বললেনঃ "আপনাদের মধ্যে কি বালিশ ওয়ালা (অর্থাৎ সফরে যার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিছানাপত্র থাকতো) এবং যিনি এমন কিছু গোপনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে জ্ঞান অন্য কারো ছিল না এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভাষায় যিনি শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নেই?"

হযরত ইবরাহীম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর সঙ্গী-সাথীগণ হযরত আবুদ দারদা (রাঃ)-এর খোঁজে আগমন করেন। হযরত আবুদ দারদা (রাঃ)ও তাদেরকে খোঁজ করতে করতে পেয়ে যান। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-এর কিরআত অনুযায়ী কুরআন পাঠকারী কেউ আছেন কি? উত্তরে তাঁরা বললেনঃ "আমরা সবাই (তাঁর কিরআতের অনুসারী)।" তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ

“আপনাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহর কিরআত অধিক স্মরণকারী কে আছেন?” তাঁরা জবাবে হযরত আলকামা (রাঃ)–এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন হযরত আবুদ দারদা’ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “আপনি হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-কে وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এ সূরাটি কিভাবে পড়তে শুনেছেন?” তিনি উত্তরে বললেন, “তিনি وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى পাঠ করতেন।” হযরত আবুদ দারদা’ (রাঃ) একথা শুনে বললেনঃ “আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ জনগণ চায় যে, আমি যেন وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পাঠ করি। আল্লাহ্র কসম! তাদের কথা আমি মানবো না”[১] মোট কথা, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবুদ দারদা (রাঃ)-এর কিরআত এরূপ। হযরত আবুদ দারদা এ বর্ণনাকে উসূলে হাদীসের পরিভাষায় মারফূ বলেও উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য জমহূরের কিরআত বর্তমানে কুরআনে উল্লিখিত কিরআতের অনুরূপ।

আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ছেয়ে যাওয়া রাত্রির শপথ করছেন, সব কিছুকে আলোকমণ্ডিত করে দেয়া দিবসের শপথ করেছেন এবং সমস্ত নর-নারী, নর ও মাদী জীবসমূহের স্রষ্টা হিসেবে নিজের সত্ত্বার শপথ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ـ অর্থাৎ “আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।” (৭৮ ঃ ৮) আরো বলেছেনঃ وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ـ অর্থাৎ “আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করেছি।” (৫১ঃ ৪৯) এই শপথ করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলছেনঃ অবশ্যই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টা এবং আমলসমূহ পরস্পরবিরোধী, একটি অন্যটির বিপরীত। যারা ভাল কাজ করছে তারাও আছে এবং যারা মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে তারাও আছে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি দান করলো ও মুত্তাকী হলো অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করলো, মেপে মেপে পা বাড়ালো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ভয় রাখলো আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কারকে সত্য বলে জানলো এবং তাঁর পুণ্যের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস করলো, আর যা উত্তম তা গ্রহণ করলো, আমি তার জন্যে সহজ পথ সুগম করে দিবো।

حُسْنٰى শব্দের অর্থ ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, করা হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ ‘নিয়ামত’ করেছেন। আবার কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ নামায, রোযা, যাকাত, সাদকা, সাদকায়ে ফিৎর এবং জান্নাত।

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তার জন্যে সহজ পথ সুগম করে দিবো। অর্থাৎ **কল্যাণ, জান্নাত এবং উত্তম বিনিময়ের পথ।**

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করলো এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলো **এবং 'হুসন' অর্থাৎ কিয়ামতের বিনিময়কে অবিশ্বাস করলো,** তার জন্যে আমি **সুগম করে** দিবো কঠোর পরিণামের পথ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি তাদের অন্তঃকরণ ও তাদের চক্ষু উল্টিয়ে দিবো, যেমন তারা প্রথমবার কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তাদেরকে আমি অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিবো।" (৬ঃ১১০) প্রত্যেক আমলের বিনিময় যে সেই আমলের অনুরূপ হয়ে থাকে এ সম্পর্কিত আয়াত কুরআন কারীমের মধ্যে বহু রয়েছে। যে ভাল কাজ করতে চায় তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করতে চায় তাকে মন্দ কাজ করার সামর্থ্য প্রদান করা হয়। এ অর্থের সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে। একটি হাদীস এই যে, একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের আমলসমূহ কি তকদীরের লিখন অনুযায়ী হয়ে থাকে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ তকদীরের লিখন অনুযায়ীই আমল হয়ে থাকে।" একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) তাহলে আমলের প্রয়োজন কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেই আমল সহজ হবে যে জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১]

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা বাকী' গারকাদে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। তিনি বললেনঃ "জেনে রেখো যে তোমাদের প্রত্যেকের স্থানই জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ রয়েছে।" একথা শুনে জনগণ বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আমরা তো সেই ভরসায় নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকলেই পারি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তোমরা আমল করে যাও, কারণ প্রত্যেক লোকের জন্য সেই আমলই সহজ করা হবে যে জন্যে তাকে

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে।

সৃষ্টি করা হয়েছে।” অতঃপর তিনি فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى হতে لِلْعُسْرٰى পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করলেন।”[১]

এ বর্ণনাটিই অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে এক টুকরো কাঠি ছিল এবং মাথা নীচু করে তিনি তা এদিক ওদিক করছিলেন। শব্দের মধ্যে কিছু কম বেশীও রয়েছে। উপরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর প্রশ্ন সম্বলিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর একই ধরনের প্রশ্ন সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং নবী করীমের (সঃ) উত্তরও প্রায় একই রকমের রয়েছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হযরত জাবির (রাঃ) হতেও একই ধরনের বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে জারীরেরই (রঃ) অন্য একটি বর্ণনায় দু'জন যুবকের একই রকম প্রশ্ন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর একই রকম উত্তর বর্ণিত রয়েছে। তারপর সেই দুই যুবকের নিম্নের উক্তিও উল্লিখিত রয়েছেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সৎ আমল করতে থাকবো।” হযরত আবুদ দারদা' (রাঃ) হতেও একইভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম (সঃ) বলেনঃ “প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় সূর্যের উভয় পাশে দু'জন ফেরেশতা উপস্থিত হন এবং উচ্চস্বরে দু'আ করেন, যে দু'আ মানুষ ও জ্বিন ছাড়া সকল সৃষ্টি জীবই শুনতে পায়। তাঁরা দু'আ করেনঃ “হে আল্লাহ! দানশীলকে পূর্ণ বিনিময় প্রদান করুন এবং কৃপণের মাল ধ্বংস করে দিন।” কুরআনে এ চারটি আয়াতের অর্থ এটাই।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোকের একটি খেজুরের বাগান ছিল। ঐ বাগানের একটি খেজুর গাছের শাখা একটি দরিদ্রলোকের ঘরের উপর ঝুঁকেছিল। ঐ দরিদ্র লোকটি ছিল পুণ্যবান। তার সন্তান সন্ততিও ছিল। বাগানের মালিক খেজুর নামাতে এসে ঝুঁকে থাকা শাখার খেজুরও নির্দ্বিধায় নামিয়ে নিতো। নীচে দরিদ্র লোকটির আঙ্গিনায় পড়া খেজুরও সে কুড়িয়ে নিতো। এমনকি দরিদ্র লোকটির ছেলে মেয়েদের কেউ দু' একটা খেজুর মুখে দিলে বাগানের ঐ মালিক তার মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ঐ খেজুর বের করে নিতো। দরিদ্র লোকটি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “আচ্ছা, তুমি যাও (আমি এর সুব্যবস্থা

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করছি)।" অতঃপর তিনি বাগানের মালিকের সাথে দেখা করে বললেনঃ "তোমার যেই খেজুর গাছের শাখা অমুক দরিদ্রলোকের ঘরের উপর ঝুঁকে আছে সেই খেজুর গাছটি আমাকে দিয়ে দাও, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সেই গাছের বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ দিবেন।" বাগানের মালিক বললোঃ "ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম। কিন্তু উক্ত গাছের খেজুর আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। আমার বাগানে বহু গাছ আছে, কিন্তু ঐ গাছের মত সুস্বাদু খেজুর গাছ আর একটিও নেই।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) চুপচাপ ফিরে আসলেন। একটি লোক গোপনে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)এবং ঐ লোকটির কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট এসে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ গাছটি যদি আমার হয়ে যায় এবং আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দিই তবে কি ঐ গাছের বিনিময়ে আমিও জান্নাতে একটি গাছ পেতে পারি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ (অবশ্যই)।" লোকটি তখন বাগান মালিকের কাছে গেলেন। তাঁর নিজেরও একটি বাগান ছিল। প্রথমোক্ত বাগান-মালিক তাঁকে বললোঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আমার অমুক খেজুর গাছের বিনিময়ে জান্নাতের একটি গাছ দিতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে এই জবাব দিয়েছি।" তার একথা শুনে আগন্তুক লোকটি তাকে বললেনঃ "তুমি কি গাছটি বিক্রি করতে চাও?" উত্তরে লোকটি বললোঃ "না। তবে হ্যাঁ, ইপ্সিত মূল্য কেউ যদি দেয় তবে ভেবে দেখতে পারি। কিন্তু কে দিবে সেই মূল্য?" তখন আগন্তুক লোকটি জিজ্ঞেস করলেনঃ "কত মূল্য তুমি চাও?"বাগান মালিক জবাব দিলোঃ "এর বিনিময়ে আমি চল্লিশটি খেজুর গাছ চাই।" আগন্তুক বললেনঃ "এটা তো খুব বেশী হয়ে যায়? একটি গাছের বিনিময়ে চল্লিশটি গাছ।" তারপর উভয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর আগন্তুক তাকে বললেনঃ "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার ইপ্সিত মূল্যেই তোমার খেজুর গাছ ক্রয় করলাম।" মালিক বললোঃ "যদি তাই হয় তবে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে কথা পাকাপাকি করে নাও।" সুতরাং কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হলো এবং এইভাবে ক্রয় বিক্রয়ের কাজ পাকাপাকি হয়ে গেল। কিন্তু এতেও বাগান-মালিকের খুঁৎ খুঁৎ মনোভাব কাটলো না। সে বললোঃ "দেখো ভাই, আমরা এখান হতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু বেচা কেনা সিদ্ধ হবে না?" ক্রেতা বললেনঃ "ঠিক আছে, তাই হবে।"বাগানের মালিক বললোঃ "আমি সম্মত হয়ে গেলাম যে তুমি আমাকে আমার এই খেজুর গাছের বিনিময়ে তোমার চল্লিশটি খেজুর গাছ প্রদান করবে। কিন্তু ভাই গাছগুলো ঘনশাখা বিশিষ্ট হওয়া

চাই।” ক্রেতা বললেনঃ “আচ্ছা তা দিবো।” তারপর সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে এ বেচাকেনা সম্পন্ন হলো। তারপর তারা দুজন পৃথক হয়ে গেল (ক্রেতা লোকটি তখন আনন্দিত চিত্তে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)। আমি ঐ বৃক্ষের মালিকানা লাভ করেছি এবং ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ দরিদ্র লোকটির নিকট গিয়ে বললেনঃ “এই খেজুর গাছ তোমার এবং তোমার সন্তানদের মালিকানাভুক্ত হয়ে গেল।” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সম্পর্কেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।[১]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতসমূহ হযরত আবূ বকর (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল দাস-দাসীদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর আযাদ করে দিতেন। এ ব্যাপারে একবার তাঁর পিতা আবূ কাহাফা (তিনি তখনো মুসলমান হননি) বলেনঃ “তুমি দুর্বল ও বৃদ্ধদেরকে মুক্ত করছো, অথচ যদি সকল যুবকদেরকে মুক্ত করতে তবে তারা তোমার কাজে আসতো। তারা তোমাকে সাহায্য করতে পারতো এবং শত্রুদের সাথে লড়াই করতে পারতো।” একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন “আব্বাজান! ইহলৌকিক লাভালাভ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি।” এরপর এখান হতে সূরা শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

تَرَدّٰى শব্দের অর্থ হলো মৃত্যুবরণ করা এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া, এই উভয় অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। আমার কাজ তো শুধু পথ নির্দেশ করা	١٢- اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ○
১৩। আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।	١٣- وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ○
১৪। আমি তোমাদেরকে লেলিহান নরকাগ্নি হতে সতর্ক করে দিয়েছি;	١٤- فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ○

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হাদীস।

১৫। **তাতে প্রবেশ** করবে সে-ই, **যে নিতান্ত** হতভাগা,	١٥- لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝
১৬। যে অসত্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়;	١٦- الَّذِىْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ۝
১৭। আর ওটা হতে রক্ষা পাবে সেই পরমসংযমী,	١٧- وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝
১৮। যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে,	١٨- الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝
১৯। এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়,	١٩- وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى ۝
২০। বরং শুধু তার মহান প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায়;	٢٠- اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝
২১। সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।	٢١- وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى ۝

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ان علينا للهدى এর ভাবার্থ হলোঃ আমার কাজ তো শুধু হালাল হারাম প্রকাশ করে দেয়া। এটাও অর্থ হয় যে, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলেছে নিশ্চয়ই তার আল্লাহর সঙ্গে মিলন ঘটবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তো পরলোকের ও ইহলোকের মালিক। আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।

মুসনাদে আহমদে হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে ভাষণে বলতে শুনেনঃ “(হে জনমণ্ডলী!) আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি।” তিনি একথা এতো উচ্চস্বরে বলছিলেন যে, বাজার থেকেও লোক তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিল। তিনি একথা বারবার বলছিলেন এমন কি তাঁর চাদর মুবারক তাঁর কাঁধ থেকে লুটিয়ে পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে।

হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন যে জাহান্নামী ব্যক্তি সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত হবে

তার পদদ্বয়ের নিচে দু'টুকরো অগ্নি স্ফুলিঙ্গ রাখা হবে, ঐ আগুনের তাপে লোকটির মগজ ফুটতে থাকবে।"[১]

সহীহ মুসলিমে হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যেই জাহান্নামীকে সবচেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া হবে তার পদদ্বয়ে আগুনের এক জোড়া ফিতাযুক্ত সেণ্ডেল পরিয়ে দেয়া হবে, সেই আগুনের তাপে তার মাথার মগজ উনুনের উপরের হাঁড়ির পানির মত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যদিও তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তবুও সে মনে করবে যে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কাউকেও দেয়া হচ্ছে না।" মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, তাতে প্রবেশ করবে সেই নিতান্ত যে হতভাগা। অর্থাৎ এই জাহান্নামে শুধু ঐ লোকদেরকে পরিবেষ্টিত করে শাস্তি দেয়া হবে যারা অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমল করে না।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ শুধু শকী বা বদকার লোক ছাড়া কেউ জাহান্নামে যাবে না।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ "শকী বা বদকার লোক কে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ যে আনুগত্যপরায়ণ নয় এবং আল্লাহর ভয়ে যে পাপ কাজ হতে বিরত থাকে না।"

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু তারা প্রবেশ করবে না যারা অস্বীকার করে।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ "আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অস্বীকারকারী কারা?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "যারা আমার আনুগত্য করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার নাফরমানী করেছে তারাই অস্বীকারকারী।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর জাহান্নাম হতে বহু দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। যে নিজেকে ও নিজের ধন সম্পদকে পবিত্র করার জন্যে, দ্বীন দুনিয়ার পবিত্রতা লাভের জন্যে নিজের ধন মালকে আল্লাহর পথে দান করে। আর সে কারো সাথে এই জন্যে সদ্ব্যবহার করে না যে, তার উপর তার অনুগ্রহ রয়েছে, বরং ঐ ক্ষেত্রেও সে পরকালে জান্নাত লাভের আশা পোষণ করে এবং সেখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে।

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম বুখারীও (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "অচিরেই এই ধরনের গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি সন্তোষ লাভ করবে।" অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই আয়াত হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর শানে নাযিল হয়। এমনকি কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এ ব্যাপারে সবারই মতৈক্য রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) অবশ্যই রয়েছেন। কিন্তু এখানে সাধারণভাবে সকল উম্মতের কথা বলা হয়েছে। তবে হযরত আবূ বকর (রাঃ) সবারই প্রথমে রয়েছেন। কেননা, তিনি ছিলেন সিদ্দীক, পরহেযগার ও দানশীল। নিজের ধন মাল তিনি মহান প্রতিপালকের আনুগত্যে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহায্যার্থে মন খুলে দান করতেন। প্রত্যেকের সাথে তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার আশা করতেন না। কোন বিনিময় তিনি চাইতেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য। ছোট হোক আর বড় হোক প্রত্যেকেরই উপর হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর অনুগ্রহের ছোঁয়া ছিল। শকীফ গোত্রপতি উরওয়া ইবনে মাসউদকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ) কিছু কড়া কথা শুনিয়ে ছিলেন। এবং ধমকিয়ে ছিলেন। তখন উরওয়া বলেছিলঃ "আমার উপর আপনার এমন কিছু অনুগ্রহ রয়েছে যার প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তা না হতো তবে আপনাকে অবশ্যই আমি জবাব দিতাম।" একজন বিশিষ্ট গোত্রপতির উপরও যখন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর এমন অনুগ্রহ ছিল যে, তাঁর সামনে তার মাথা উঁচু করে কথা বলার ক্ষমতা ছিল না, তখন অন্যদের কথা আর কি বলা যাবে? এজন্যেই বলা হয়েছে যে, কারো প্রতি অনুগ্রহের বিনিময়ে পার্থিব কোন উপকার বা প্রতিদান তিনি চাইতেন না। শুধু আল্লাহর দীদার লাভই ছিল তাঁর কাম্য।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জোড়া দান করবে তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের রক্ষক ডাক দিয়ে বলবেনঃ "হে আল্লাহর বান্দা! এ দিকে আসুন। এই দরজা সবচেয়ে উত্তম।" তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) কোন ব্যক্তিকে কি সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, আর আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, তুমিও হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত।'

সূরা ঃ লাইল এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ দুহা মাক্কী

(আয়াতঃ ১১, রুকূ'ঃ ১)

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا: ١١، رُكُوْعُهَا: ١)

হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইসমাঈল ইবনে কুসতুনতীন (রঃ) এবং হযরত শবল ইবনে ইবাদের (রঃ) সামনে কুরআন পাঠ করছিলেন। যখন তিনি وَالضُّحٰى পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাঁরা উভয়েই বলেনঃ এখান হতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শেষে তাকবীর পাঠ করবেন। আমরা ইবনে কাসীর (রঃ)এর সামনে পাঠ করছিলাম, তিনি মুজাহিদ (রঃ)-এর সামনে পাঠ করলে তিনিও তাঁকে এই নির্দেশ দেন। তিনি আমাদেরকে অনুরূপ কথা বলেছিলেন। তিনি পাঠ করেছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সামনে। তিনিও তাঁকে এই হুকুম করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পাঠ করেছিলেন হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রাঃ) সামনে। তিনিও তাঁকে এটারই আদেশ করেছিলেন। আর হযরত উবাই (রাঃ) পাঠ করেছিলেন রাসুলুল্লাহর সামনে এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এরই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমামুল কিরআত হযরত আবূ হাসানও (রঃ) এই সুন্নাতের বর্ণনাকারী। হযরত আবূ হাতিম রাযী (রঃ) এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। কারণ আবুল হাসান বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। আবূ হাতিম (রঃ) তাঁর নিকট হতে কোন হাদীসই নিতেন না। অনুরূপভাবে হযরত আবূ জাফর উকাইলীও (রঃ) তাঁকে মুনকারুল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শায়েখ শিহাবুদ্দীন আবূ শা'মাহ (রঃ) শারহি শা'তিবিয়্যায় হযরত ইমাম শাফিয়ী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজন লোককে নামাযের মধ্যে এ তাকবীর বলতে শুনে বলেনঃ "তুমি ভাল কাজই করেছো এবং সুন্নাত পালন করেছো।" এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, এ হাদীস সহীহ বা বিশুদ্ধ। এখন এ তাকবীর কোথায় ও কিভাবে পাঠ করতে হবে এ ব্যাপারে কারীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এই সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর হতে এ তাকবীর পাঠ করতে হবে। অন্যেরা বলেছেন, وَالضُّحٰى সমাপ্ত হওয়ার পর হতে পড়তে হবে। আর কারো কারো মতে এটা পাঠের নিয়ম এই যে, শুধু আল্লাহু আকবার বলতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলতে হবে।

কোন কোন কারী সূরা আদ্দোহা হতে এই তাকবীর পাঠ করার কারণ এই বলে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট অহী আসা কিছু দিনের জন্যে বন্ধ ছিল। তারপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এই সূরা নিয়ে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আনন্দের আতিশয্যে তাকবীর পাঠ করেন। কিন্তু এই বর্ণনা এমন কোন সনদের সাথে বর্ণিত হয়নি যেটা দ্বারা এটাকে বিশুদ্ধ অথবা দুর্বল বলা যেতে পারে। এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- وَ الضُّحٰى ○

১। শপথ পূর্বাহ্নের,

٢- وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى ○

২। শপথ রজনীর যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে ফেলে;

٣- مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى ○

৩। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।

٤- وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ○

৪। তোমার জন্যে পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয় বা কল্যাণকর।

٥- وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ○

৫। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

٦- اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ○

৬। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয়দান করেন নি?

٧- وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ○

৭। তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

٨- وَ وَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ○

৮। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন;

৯। অতএব, তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না,	٩- فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ط ○
১০। আর প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না।	١٠- وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ط ○
১১। তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাকো।	(١ ع ١١ ١٨) ١١- وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ع ○

হযরত জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে তিনি একদিন বা দুদিন রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যে উঠতে পারেননি। এটা জেনে একটি মহিলা এসে বলেঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমাকে তোমার শয়তান পরিত্যাগ করেছে।" তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَالضُّحٰى - وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।[১]

হযরত জুনদুব (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর আসতে কয়েকদিন বিলম্ব হয়েছিল, এতে মুশরিকরা বলাবলি করতে শুরু করে যে, মুহাম্মদ(সঃ)কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আঙ্গুলে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে তিনি বলেনঃ

هَلْ اَنْتَ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتَ * وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَالَقِيْتَ

অর্থাৎ "তুমি শুধু একটি আঙ্গুল বৈ তো নও, আর আল্লাহর পথে তোমার এ যখম হয়েছে।" শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুই তিন দিন উঠতে পারেননি, এতেই ঐ মহিলাটি উপরোক্ত অশালীন উক্তি করেছিল। অতঃপর উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। জানা যায় যে, ঐ দুষ্টা মহিলাটি ছিল আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল। তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত নাযিল হোক। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আঙ্গুল আহত হওয়া এবং তাতে উপরোক্ত পংক্তি

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আকস্মিকভাবে তাঁর মুখে উচ্চারিত হওয়ার কথা তো সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে, কিন্তু তাহাজ্জুদ আদায়ে অসমর্থতা যে সেই কারণে হয়েছিল এবং এই আয়াতগুলো যে ঐ উপলক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল এ উক্তি উসূলে হাদীসের পরিভাষায় গারীব বলে উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলেনঃ "আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট তো হননি?" তখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর আসতে বিলম্ব হওয়ায় রাসূলুল্লাহ শংকিত হয়ে পড়েন। এ কারণে হযরত খাদীজা (রাঃ) উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এ দুটি বর্ণনাকে উসূলে হাদীসের পরিভাষায় মুরসাল বলা হয়েছে। তবে খাদীজা (রাঃ)-এর নাম ও উক্তি উল্লেখ এ ক্ষেত্রে সমীচীন মনে হয় না। হ্যাঁ, তবে হয় তো দুঃখ ও বেদনার বশবর্তী হয়েই তিনি এ ধরনের উক্তি করে থাকবেন। এটা অসম্ভব নয়। তবে এ সব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

ইবনে ইসহাক (রঃ) এবং পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) যে সময় তাঁর স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং খুবই কাছাকাছি হয়েছিলেন সে সময় এই ধরনের অহী অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে মুশরিকদের অবাঞ্ছিত উক্তির অসারতা প্রমাণের জন্যেই এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রোদ্র ওঠার সময়ের দিনের আলো, রাত্রির নীরবতা এবং অন্ধকারের শপথ করেছেন। এগুলো মহান স্রষ্টার কুদরতের এবং সৃষ্টির ঐশ্বর্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى

অর্থাৎঃ "শপথ রজনীর যখন ওটা আচ্ছন্ন করে এবং শপথ দিবসের যখন ওটা আবির্ভূত হয়।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়েও দেননি। এবং তোমার সাথে শত্রুতাও করেননি। তোমার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ইবাদত করতেন এবং দুনিয়া বিমুখ জীবন যাপন করতেন। নবী করীম (সঃ)-এর জীবনী যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি খেজুর পাতার চাটাইর উপর শুয়েছিলেন। ফলে তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে চাটাইর দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর আমি তাঁর দেহে হাত বুলিয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! চাটাইর উপর আমাকে কিছু বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন! তিনি আমার এ কথা শুনে বললেনঃ “পৃথিবীর সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কোথায় এবং দুনিয়া কোথায়? আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো সেই পথচারী পথিকের মত যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে, তারপর গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে চলে যায়।”[১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমার প্রতিপালক তোমাকে আখেরাতে তোমার উম্মতের জন্যে এতো নিয়ামত দিবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে। তোমাকে বিশেষ সম্মান দান করা হবে। বিশেষভাবে হাউযে কাওসার দান করা হবে। সেই হাউযে কাওসারের কিনারায় খাঁটি মুক্তার তাঁবু থাকবে। ওর মাটি হবে নির্ভেজাল মিশক। এ সম্পর্কিত হাদীস অচিরেই বর্ণনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যে সব ধনাগার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মতের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলো একে একে তাঁর উপর প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। জান্নাতে তাঁকে এক হাজার মহল দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক মহলে পবিত্র স্ত্রী এবং উৎকৃষ্ট মানের খাদেম রয়েছে।”[২]

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্র (সঃ) সন্তুষ্টির এটাও একটা কারণ যে, তাঁকে জানানো হয়ঃ তাঁর আহ্লে বাইতের মধ্য থেকে কেউ জাহান্নামে যাবে না। হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা তাঁর শাফা'আত বুঝানো হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমরা এমন আহলে বায়েত যাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মুকাবিলায় আখেরাতকে পছন্দ করেছেন।” তারপর তিনি وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى পাঠ করেন।”[৩]

---

১. এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে এবং উসূলে হাদীসের পরিভাষায় হাদীসটি হাসান।

২. এ হাদীসটি ইবনে আমর আওযায়ী (রঃ) ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। আল্লাহর নবী (সঃ) হতে না শুনে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

৩. এ হাদীসটি ইবনে আবী শায়বা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি ইয়াতীম থাকা অবস্থায় আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন, হিফাযত করেছেন, প্রতিপালন করেছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। নবী করিম (সঃ)-এর জন্ম লাভের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর জন্ম লাভের পর তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ছয় বছর বয়সের সময় তাঁর স্নেহময়ী মাতা এই নশ্বর জগত হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তারপর তিনি তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তাঁর দাদাও পরপারে চলে যান। অতঃপর তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। আবূ তালিব তাঁকে সর্বাত্মক দেখাশুনা এবং সাহায্য করেন। তিনি তাঁর স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে খুবই সম্মান করতেন, মর্যাদা দিতেন এবং স্বজাতির বিরোধিতার ঝড়ে মুকাবিলা করতেন। নিজেকে তিনি ঢাল হিসেবে উপস্থাপন করতেন। চল্লিশ বছর বয়সের সময় নবী করীম (সঃ) নবুওয়াত লাভ করেন। কুরায়েশরা তখন তাঁর ভীষণ বিরোধী এমনকি প্রাণের দুশমন হয়ে গেল। আবু তালিব মুশরিক মূর্তিপূজক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে সহায়তা দান করতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে লড়াই করতেন। এই সুব্যবস্থা আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতেই হয়েছিল। নবী করীম (সঃ)-এর ইয়াতীমী অবস্থা এভাবেই কেটে যায়। আল্লাহ তা'আলা বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হতে এভাবেই নবী করীমের (সঃ)-এর খিদমত নেন। হিজরতের কিছুদিনের পূর্বে আবূ তালিবও ইন্তেকাল করেন। এবার কাফির মুশরিকরা কঠিনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আল্লাহ তা'আলা তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন এবং মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে তাঁর সাহায্যকারী বানিয়ে দেন। ঐ বুর্যগ আনসার ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ) আশ্রয় দিয়েছেন, জায়গা দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। আর শত্রুদের মুকাবিলায় বীরের মত সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! এ সবই আল্লাহর মেহেরবানী, অনুগ্রহ এবং রহম করমের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)কে বলেনঃ তোমাকে আল্লাহ তা'আলা পথহারা দেখতে পেয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ
وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ـ

অর্থাৎ "এ ভাবেই আমি নিজের আদেশে তোমার প্রতি রুহ্ অর্থাৎ জিবরাইল (আঃ)কে অথবা কুরআনকে অহী হিসেবে পাঠিয়েছি। ঈমান কি জিনিস তাও তোমার জানা ছিল না, কিতাব কাকে বলে তাও জানতে না তুমি। আমি এ কিতাবকে নুর বা জ্যোতি বানিয়ে এর দ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেছি।" (৪২ ঃ ৫২) কেউ কেউ বলেন, এখানে ভাবার্থ হলো এই যে, নবী করীম (সঃ) শৈশবে মক্কার গলিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে সিরিয়া যাওয়ার পতে রাত্রিকালে শয়তান তাঁর উটের লাগাম ধরে চলার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। তারপর জিবরাঈল (আঃ) এসে শয়তানকে ফুঁদিয়ে আবিসিনিয়ায় রেখে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীকে সঠিক পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।"[১]

আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তিনি (আল্লাহ) তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করলেন ফলে ধৈর্যধারণকারী দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধনীর মর্যাদা তুমি লাভ করেছো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন!

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এসব অবস্থা নবুওয়াতের পূর্বে হয়েছিল। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন "ধন সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত ধনশীলতা নয়, বরং প্রকৃত ধনশীলতা হচ্ছে মনের ধনশীলতা বা মনের সন্তুষ্টি।"

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তা যথেষ্ট মনে করেছে এবং তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে সে সাফল্য লাভ করেছে।"

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)কে সম্বোধন করে বলেনঃ সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না, তাকে ধমক দিয়ো না এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করো না, বরং তার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিজের ইয়াতীম হওয়ার কথা ভুলে যেয়ো না।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ইয়াতীমের সাথে ঠিক এমনই ব্যবহার করতে হবে যেমন ব্যবহার পিতা নিজের সন্তানের সাথে করে থাকেন।

---

১. এই উভয় উক্তিই বাগাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)কে আরো বলেনঃ প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না। তুমি যেমন পথহারা ছিলে, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত বা পথের দিশা দিয়েছেন, তেমনি কেউ তোমাকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে রূঢ় ব্যবহার দ্বারা সরিয়ে দিয়ো না। গরীব, মিসকীন, এবং দুর্বল লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করো না। তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করো না। তাদেরকে কড়া কথা বলো না। ইয়াতীম মিসকীনদেরকে যদি কিছু না দিতে পার তবে ভাল ও নরম কথা বলে তাদেরকে বিদায় করো এবং ভালভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দাও।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ নিজের প্রতিপালকের নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করতে থাকো। অর্থাৎ যেমন আমি তোমার দারিদ্রকে ঐশ্বর্যে পরিবর্তিত করেছি, তেমনই তুমিও আমার এ সব নিয়ামতের কথা বর্ণনা করতে থাকো। যেমন নবী করীম (সঃ)এর দু'আও ছিলঃ

وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا ـ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী করুন, ঐ নিয়ামতের কারণে আমাদেরকে আপনার প্রশংসাকারী করুন, ঐ নিয়ামত স্বীকারকারী করুন এবং পরিপূর্ণভাবে ঐ নিয়ামত আমাদেরকে দান করুন।”

আবূ নায্রা (রঃ) বলেনঃ “মুসলমানরা মনে করতেন যে, নিয়ামতের বর্ণনা দেয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শামিল।”[১]

হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেনঃ “ যে ব্যক্তি অল্প পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। সে বেশী পেয়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না সে আল্লাহ তা'আলার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না। নিয়ামত স্বীকার ও বর্ণনা করাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শামিল, আর নিয়ামত অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। দলবদ্ধভাবে থাকা রহমত লাভের কারণ এবং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শাস্তির কারণ।”[২]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুহাজিরগণ বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আনসারগণ সমস্ত প্রতিদান

---

[১] এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এহাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

নিয়ে গেছেন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ “না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্যে দু'আ করতে থাকবে এবং তাদের প্রশংসা করতে থাকবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ “যারা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না তারা আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।”[১]

হযরত জাবির (রাঃ)হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন নিয়ামত লাভ করার পর তার বর্ণনা করেছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, আর যে তা গোপন করেছে সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।”[২] হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ “কাউকে কোন অনুগ্রহ করা হলে তার উচিত সম্ভব হলে ঐ অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়া, আর যদি সম্ভব না হয় তবে উচিত অন্ততঃপক্ষে ঐ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা এবং তার প্রশংসা করা। যে ব্যক্তি এই প্রশংসা করেছে সে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি প্রশংসাও করেনি এবং নিয়ামতের কথা প্রকাশও করেনি সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।”[৩]

কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এখানে নিয়ামত দ্বারা নবুওয়াতকে বুঝানো হয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এখানে নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলো কল্যাণকর যে সব কথা নিজে জান, সে সব তাদের কাছেও বর্ণনা কর। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ নবুওয়াতের যে নিয়ামত ও কারামত তুমি লাভ করেছো সেটা বর্ণনা কর। ঐ কথা আলোচনা কর। আর সেইদিকে জনগণকে দাওয়াত দাও।

কাজেই নবী করীম (সঃ) নিজের লোকদের কাছে অর্থাৎ যাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল তাদের কাছে প্রথমদিকে চুপি চুপি দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তাঁর উপর নামায ফরয হয়েছিল, তিনি সেই নামায আদায় করতেন।

সূরা ঃ দুহা এর তাফসীর সমাপ্ত

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটিও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[৩] এ হাদীসটিও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا: ٨، رُكُوْعُهَا: ١)

সূরাঃ আলাম নাশরাহ্,মাক্কী
(আয়াত ঃ ৮, রুকূ 'ঃ ১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ ○

১। আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে উন্মুক্ত করে দিইনি?

٢- وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ ○

২। আমি তোমা হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার,

٣- الَّذِيْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ ○

৩। যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করেছিল;

٤- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ ○

৪। এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি।

٥- فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ ○

৫। কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে।

٦- اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ ○

৬। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।

٧- فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ ○

৭। অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা করো,

٨- وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ع ○ (١ ع ٨ ١٧)

৮। এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতিই মনোনিবেশ করো।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমার কল্যাণার্থে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছি, দয়ামায়াপূর্ণ এবং অনুগ্রহপুষ্ট করে দিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ যাকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষ তিনি ইসলামের জন্যে খুলে দেন।" (৬ ঃ ১২৫) মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমার বক্ষ যেমন প্রশস্ত ও প্রসারিত করে দেয়া হয়েছে, তেমনই তোমার শরীয়তও

প্রশস্ততা সম্পন্ন, সহজ সরল ও নম্রতাপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তাতে কোন জটিলতা নেই এবং নেই কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা। এটাও বলা হয়েছে যে, এখানে মিরাজের রাত্রের বক্ষ বিদারণ সম্বলিত ঘটনার কথা বুঝানো হয়েছে। মিরাজের রাত্রে বক্ষ বিদীর্ণ করা এবং বক্ষকে আল্লাহর রহস্যের আধারে পরিণত করা, এই দুই অর্থই নেয়া যেতে পারে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বেশ সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে এমন সব কথা জিজ্ঞাসা করতেন যে সব কথা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করতে পারতেন না। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে প্রশ্ন করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নবুওয়াতের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম আপনি কি প্রত্যক্ষ করেছেন?" তখন রাসূলুল্লাহ(সঃ) ভালভাবে বসে বললেনঃ "হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! তা হলে শুনো! আমার বয়স যখন দশ বছর কয়েক মাস। একজন লোক অন্য একজন লোককে বলছেঃ "ইনিই কি তিনি?" তারপর দু'জন লোক আমার সামনে এলেন। তাঁদের চেহারা এমন নূরানী বা আলোকোজ্জ্বল ছিল যে, আমি এর পূর্বে ঐ রকম চেহারা কখনো দেখিনি। তাঁদের দেহ হতে এমন সুগন্ধি বেরুচ্ছিল যে, এর পূর্বে ঐ রকম সুগন্ধি কখনো আমার নাকে আসেনি। তাঁরা এমন পোশাক পরিহিত ছিলেন যে, ঐ রকম পোশাক পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। তাঁরা এসে আমার উভয় বাহু আঁকড়ে ধরলেন। কিন্তু কেউ আমার বাহু ধরেছে বলে আমার মনে হলো না। তারপর একজন অপরজনকে বললেনঃ "এঁকে শুইয়ে দাও।" অতঃপর আমাকে শুইয়ে দেয়া হলো। কিন্তু তাতেও আমার কোন প্রকার কষ্ট হয়নি। তাঁরা একজন অন্য জনকে বললেনঃ "এঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে দাও।" অতঃপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো। কিন্তু তাতেও আমি মোটেই কষ্ট অনুভব করিনি। বিন্দুমাত্র রক্তও তাতে বের হয়নি। তারপর তাঁদের একজন অপরজনকে বললেনঃ "হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতা এঁর বুক থেকে বের করে দাও।" যাঁকে আদেশ করা হলো তিনি রক্ত পিণ্ডের মত কি একটা জিনিষ বের করলেন এবং ওটা ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর আবার একজন অপরজনকে আদেশ করলেনঃ "বক্ষের মধ্যে দয়া মায়া, স্নেহ, অনুগ্রহ প্রবণতা ঢুকিয়ে দাও।" এই আদেশ মূলে বক্ষ হতে যে পরিমাণ জিনিষ বের করে ফেলা হয়েছিল সেই পরিমাণ রূপার মত কি একটা জিনিস বক্ষের মধ্যে ভরে দেয়া হলো। তারপর আমার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নেড়ে তাঁরা আমাকে বললেনঃ

“যান, এবার শান্তিতে জীবন যাপন করুন।” তারপর চলতে গিয়ে আমি অনুভব করলাম যে, প্রত্যেক ছোট ছেলের প্রতি আমার অন্তরের স্নেহ মমতা রয়েছে এবং প্রত্যেক বড় মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রয়েছে।”[১]

এরপর আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)কে সম্বোধন করে বলেনঃ “আমি তোমার বোঝা অপসারণ করেছি।” এর ভাবার্থ হলোঃ আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)-এর পূর্বাপর সমস্ত পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমার উপর থেকে তোমার সেই ভার অপসারিত করেছি যা তোমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে রেখেছিল।

“আর আমি তোমার জন্যে তোমার খ্যাতি সমুন্নত করেছি। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ যেখানে আমার (আল্লাহর) আলোচনা হবে সেখানে তোমারও আলোচনা হবে। যেমনঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল।” হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)-এর আলোচনা বুলন্দ করেছেন। কোন খতীব, কোন বক্তা, কোন বাগ্মী এবং কোন নামাযী এমন নেই যিনি আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর রিসালাতের কথা উচ্চারণ করেন না। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে এসে বলেনঃ “আমার এবং আপনার প্রতিপালক আপনার আলোচনাকে কি করে সমুন্নত করবেন তা তিনি জানতে চান।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “সেটা আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন।” তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) জানিয়ে দেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ আমার কথা যখন আলোচনা করা হবে তখন আমার রাসূল (সঃ)-এর কথাও আলোচিত হবে।”

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি আমার প্রতিপালককে একটি প্রশ্ন করেছি, কিন্তু প্রশ্নটি না করাই ভাল ছিল। প্রশ্নটি হলোঃ হে আল্লাহ! আমার পূর্ববর্তী কোন নবীর জন্যে কি আপনি বাতাসকে তাবেদার বানিয়েছিলেন? কারো হাতে মৃতকে

---

[১] এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে।

কি জীবিত করিয়েছেন? আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে বলেনঃ "আমি কি তোমাকে ইয়াতীম পেয়ে আশ্রয় দিইনি?" আমি জবাবে বললামঃ হ্যাঁ, অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক আবার প্রশ্ন করেনঃ "আমি কি তোমাকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়েও পথ নির্দেশ প্রদান করিনি?" উত্তর দিলামঃ হ্যাঁ, অবশ্যই করেছেন। আল্লাহ্ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আমি কি তোমাকে দরিদ্রাবস্থায় পেয়েও বিত্তশালী করিনি?" আমি জবাবে বললামঃ হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! অবশ্যই করেছেন। তিনি আবারও প্রশ্ন করলেনঃ "আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি?" উত্তর দিলামঃ হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ, অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহ্ পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "আমি কি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিনি?" আমি জবাবে বললামঃ হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! অবশ্যই করেছেন।"

হযরত আবূ নাঈম লিখিত 'দালাইলুন নুবুওয়াহ্ নামক গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার মহান প্রতিপালক আমাকে আকাশ ও জমীনের কাজের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই কাজ হতে অব্যাহতি লাভ করার পর আমি তাঁকে বললামঃ হে আমার প্রতিপালক আমার পূর্বে যত নবী গত হয়েছেন তাঁদের সবাইকে আপনি সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে বন্ধু বানিয়েছেন, হযরত মূসা (আঃ)কে কালীম বানিয়েছেন অর্থাৎ তাঁর সাথে বাক বিনিময় করেছেন, হযরত দাঊদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়কে বিদীর্ণ করেছেন, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর জন্যে বাতাস এবং শয়তানকে অনুগত করেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাতে মৃতকে জীবন দান করেছেন। সুতরাং আমার জন্যে কি করেছেন? আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে বলেনঃ আমি কি তোমাকে তাদের সবার চেয়ে উত্তম জিনিস প্রদান করিনি? আমার যিকির বা আলোচনার সাথে তোমার আলোচনাও করা হয়ে থাকে, এবং আমি তোমার উম্মতের বক্ষকে এমন করে দিয়েছি যে, তারা প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করে। এটা আমি পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কাউকেও দিইনি। আর আমি তোমাকে আরশের ধনাগার হতে ধন দিয়েছি। সেই ধন হলোঃ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ পাপকার্য হতে ফিরবার এবং ভাল কাজ করবার ক্ষমতা সমুন্নত ও মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো নেই।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এখানে আযানকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হযরত হাসসান ইবনে সাবিতের (রাঃ) নিম্নের কবিতায় রয়েছেঃ

اَغَرَّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتِمِ * مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ يَلُوْحُ وَيَشْهَدُ
وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَ النَّبِيِّ اِلٰى اِسْمِهٖ * اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ
وَشَقَّ لَهٗ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهٗ * فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَّهٰذَا مُحَمَّدٌ

অর্থাৎ “আল্লাহ তা‘আলা মুহরে নুবুওয়াতকে নিজের নিকটের একটি নুর বানিয়ে তাঁর (নবী সঃ)-এর উপর চমকিত করেছেন, যা তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ নবী (সঃ)-এর নামকে নিজের নামের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, যখন মুআযযিন পাঁচবার (পাঁচওয়াক্ত নামাযের মধ্যে) ‘আশহাদু’ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি) বলে। আর আল্লাহর নবী (সঃ)-এর নামকে স্বীয় নাম হতে বের করেছেন, সুতরাং আরশের মালিক (আল্লাহ) হলেন মাহমুদ এবং ইনি (নবী করীম (সঃ) হলেন মুহাম্মদ (সঃ)।” অন্যেরা বলেন যে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)-এর নাম মর্যাদায়ে উন্নীত করেছেন। সকল নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের দিনে আল্লাহ তা‘আলা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁর প্রিয় নবীর (সঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন এবং নিজ নিজ উম্মতকেও বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিবেন। তা ছাড়া প্রিয় নবী (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যেও আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আলোচনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর আলোচনার সাথে সাথে নবী করীম (সঃ)-এরও আলোচনা করে। সরসরি (রঃ) একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেনঃ

لَا يَصِحُّ الْاَذَانُ فِى الْفَرْضِ اِلَّا * بِاسْمِهِ الْعَذْبِ فِى الْفَمِ الرِّضٰى
اَلَمْ تَرَانَا لَا يَصِحُّ اَذَانُنَا * وَلَا فَرْضُنَا اِنْ لَّمْ نُكَرِّرْهُ فِيْهِمَا

অর্থাৎ “আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সঃ)-এর মিষ্টি নাম পছন্দনীয় এবং সুন্দর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার পূর্বে আমাদের কর্তব্যজনিত আযান বিশুদ্ধ হয় না। তুমি কি দেখো না যে, আমাদের আযান এবং আমাদের কর্তব্য বিশুদ্ধ হয় না যতক্ষণ না বারবার নবী করীম (সঃ)-এর নাম উচ্চারিত হয়।”

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ ‘কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।” আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, কষ্ট ও দুঃখের পরেই শান্তি ও সুখ রয়েছে। অতঃপর খবরের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্যে এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম (সঃ) বসেছিলেন, তাঁর সামনে একটা পাথর ছিল। তখন তিনি বললেনঃ যদি মুশকিল বা কষ্টকর অবস্থা আসে এবং এ পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে আসানী ও আসবে এবং পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে তার ভিতর থেকে মুশকিল ও কষ্টকর অবস্থাকে বের করে আনবে।"[১]

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, লোকেরা বলেঃ একটি মুশকিল দুটি আসানীর উপর জয়যুক্ত হতে পারে না।

হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম (সঃ) খুবই স্মিত মুখে এলেন এবং হাসতে হাসতে বললেনঃ "কিছুতেই একটি মুশকিল দুইটি আসানীর উপর জয়যুক্ত হতে পারে না।" তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন।[২]

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আমাদের কাছে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেনঃ "দুটি আসানীর উপর একটি মুশকিল জয়যুক্ত হতে পারে না।" এখানে عُسْر শব্দকে উভয় স্থানে মা'রিফাহ বা নির্দিষ্ট রূপে আনা হয়েছে, পক্ষান্তরে يُسْر শব্দকে উভয় স্থানে নাকিরাহ বা অনির্দিষ্টরূপে আনয়ন করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, মুশকিল মাত্র একটি, আর আসানী অনেক।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, معونه অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য কষ্ট অনুপাতে আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং তা ধৈর্য ও সহনশীলতা অনুযায়ী আসমান হতে নাযিল হয়। হযরত ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বলেনঃ

صَبْرًا جَمِيْلاً مَا اَقْرَبُ الْفَرْجَا * مَنْ رَاقَبَ اللّٰهَ فِى الْاُمُوْرِ نَجَا
مَنْ صَدَّقَ اللّٰهَ لَمْ يَنَلْهُ اَذًى * وَمَنْ رَجَاهُ يَكُوْنُ حَيْثُ رَجَا

অর্থাৎ " উত্তম ধৈর্য প্রশস্ততার কতই না নিকটবর্তী। নিজের কাজে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি খেয়াল রাখে সে মুক্তি লাভ করে। যে আল্লাহর কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কষ্ট তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি কল্যাণ প্রত্যাশা করে, সে আশা অনুযায়ীই তা লাভ করে।"

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম ইবনু আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি ইমাম ইবনু আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটি মুরসাল হাদীস। অর্থাৎ এখানে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। বুঝা যায় যে, মুশকিল মাত্র একটি, আর আসানী অনেক।

হযরত আবূ হাতিম সিজিস্তানী (রঃ) বলেনঃ

إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَأْسِ الْقُلُوْبُ * وَضَاقَ لَمَّا بِهِ الصَّدْرُ الرَّجُبُ
وَاَوْطَأَتِ الْمَكَارِهُ وَاطْمَأَنَّتْ * وَاَرْسَتْ فِيْ اَمَاكِنِهَا الْخُطُوْبُ
وَلَمْ تَرَ لِانْكِشَافِ الضُّرِّ وَجْهًا * وَلَا اَغْنٰى بِحِيْلَتِهِ الْاَرِيْبُ
اَتَاكَ عَلٰى قُنُوْطٍ مِنْكَ غَوْثٌ * بِمَنْ بِهِ اللَّطِيْفُ الْمُسْتَجِيْبُ
وَكُلُّ الْحَادِثَاتِ اِذَا تَنَاهَتْ * فَمَوْصُوْلٌ بِهَا الْفَرَجُ الْقَرِيْبُ

অর্থাৎ “হতাশা যখন অন্তর দখল করে নেয়, বুক যখন প্রশস্ততা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে যায়, দুঃখ কষ্ট যখন ঘিরে ধরে, বিপদ এসে বাসা বাঁধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার সৃষ্টি করে, মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, মুক্তির কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় না, সেই সময় হঠাৎ আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছে। আল্লাহ তা'আলা দু'আ শ্রবণকারী। সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ মুশকিলকে আসানীতে রূপান্তরিত করেন এবং যন্ত্রণাকে, অশান্তিকে সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশে পরিণত করেন। সংকীর্ণতা পুরোপুরি এসে পড়লে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততা অবতীর্ণ করতঃ ক্ষতিকে লাভে রূপান্তরিত করে দেন।” অন্য এক কবি বলেন

وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيْقُ بِهِ الْفَتٰى * ذَرْعًا وَعِنْدَ اللّٰهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ
كَمُلَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ حَلْقَاتُهَا * فُرِجَتْ وَكَانَ يَظُنُّهَا لَا تُفْرَجُ

অর্থাৎ “মানুষের উপর এমন বহু বিপদ আপতিত হয় যাতে সে সংকীর্ণ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, অথচ আল্লাহর কাছে সে সব বিপদে নিমিত্ত নিষ্কৃতিও রয়েছে। এসব বিপদ যখন পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিপদের বন্ধন লাভ করে, মানুষ তখন ভাবতে থাকে যে, এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে তো? তখন হঠাৎ করুণাময় আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়ে যায় এবং তিনিই সেই বিপদ এমনভাবে দূর করে দেন যে, মনে হয় যেন বিপদ আসেইনি।”

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ অতএব, হে নবী (সঃ) যখনই তুমি অবসর পাও সাধনা করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেলেই আমার ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি

মনোনিবেশ করো, নিয়ত পরিষ্কার করো, পরিপূর্ণ আগ্রহ্ সহকারে আমার প্রতি আকৃষ্ট হও। এই অর্থ বিশিষ্ট একটি সহীহ্ হাদীসও রয়েছে। হাদীসটির মর্ম হলোঃ খাবার সামনে থাকা অথবা পায়খানা প্রস্রাবের বেগ থাকা অবস্থায় নামায পড়তে নেই। অন্য এক হাদীসে রয়েছেঃ "সবাই নামাযে দাঁড়িয়ে গেছে এমতাবস্থায় যদি রাতের খাবার তোমার সামনে থাকে তা হলে প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।"

হযরত মুজাহিদ (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ দুনিয়ার কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে নামাযে দাঁড়াও। অতঃপর আল্লাহর নিকট মনোযোগ সহকারে দু'আ কর এবং নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত কর ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি আকৃষ্ট হও।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ ফরয নামায থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ নামায আদায় শেষ করে বসে বসে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হও অর্থাৎ তাঁর যিক্র করো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ অর্থাৎ, দু'আ করো। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) এবং যহহাক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ জিহাদ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতে লেগে যাও। সাওরী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো নিজের নিয়ত ও মনোযোগ আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করো।

সূরা ঃ আলাম নাশরাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ তীন মাক্কী

(আয়াত ঃ ৮, রুকু’ ঃ ১)

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعُهَا : ١)

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “নবী করীম (সঃ) তাঁর এক সফরে দু’রাকআ’ত নামাযের কোন এক রাকআ’তে সূরা তীন পাঠ করছিলেন। আমি তাঁর চেয়ে মধুর ও উত্তম কণ্ঠস্বর অথবা কিরআত আর কারো শুনিনি।

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

১। শপথ ‘তীন’ ও ‘যায়তূন’ এর,

২। শপথ ‘সিনাই’ পর্বতের

৩। এবং শপথ এই নিরাপদ বা শান্তিময় নগরীর,

৪। আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,

৫। অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি।

৬। কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু’মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্যে তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৭। সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?

৮। আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ ۙ○

٢- وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ○

٣- وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ○

٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۙ○

٥- ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ○

٦- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ○

٧- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ؕ○

٨- اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ع○ (١ ع ٨ ٢٠)

এখানে তাফসীরকারগণ বহু উক্তির উপর মতভেদ করেছেন। কারো কারো মতে 'তীন' দ্বারা দামেস্কের মসজিদকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, 'তীন' হলো সরাসরি দামেস্ক শহর। অন্য কেউ বলেন যে, ওটা হলো জূদী পাহাড়ে অবস্থিত হযরত নূহের (আঃ) মসজিদ। হযরত মুজাহিদের (রঃ) মতে এটা হলো সাধারণ আনজীর বা ডুমুর জাতীয় ফল।

যায়তুনের অর্থ ও বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, ওটা হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ। অন্য কারো মতে যায়তুন হলো ঐ ফল যাকে চিপে রস অর্থাৎ তৈল বের করা হয়।

তূরে সীনীন হলো ঐ পাহাড় যেখানে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেছিলেন।

بَلَدِ الْاَمِيْنِ দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেউ কেউ বলেন যে, এই তিন জায়গায় তিনজন বিশিষ্ট নবীকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল। তুরে সীনীন এর অর্থ হলো তুরে সায়না অর্থাৎ সিনাই পাহাড়। এই পাহাড়ে আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে বাক্য বিনিময় করেছেন। বালাদুল আমীন হলো মক্কা মুআয্যামা, যেখানে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) পাঠানো হয়েছে। তাওরাতের শেষেও এ তিনটি জায়গার নাম উল্লিখিত রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, তূরে সায়না থেকে আল্লাহ তা'আলা এসেছেন অর্থাৎ তিনি হযরত মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছেন আর সা'ঈর অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের পাহাড় থেকে তিনি নুর চমকিত করেছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)কে সেখানে প্রেরণ করেছেন এবং ফারানের শীর্ষে তিনি উন্নীত হয়েছেন অর্থাৎ মক্কার পাহাড় থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর এই তিনজন বিশিষ্ট নবীর ভাষা এবং সত্তা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এইসব শপথের পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর ছাঁচে ঢালাই করেছি, অতঃপর তাকে আমি অধঃপতিত হীন অবস্থার লোকদের চেয়েও হীনতম করে দিই। অর্থাৎ জাহান্নামের অধিবাসী করে দিই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য না করে থাকে। এ কারণেই যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা অতি বৃদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন জমা করেছে সে বার্ধক্য ও হীন অবস্থায় উপনীত হবে না। ইবনে জারীর (রঃ) এ কথা পছন্দ

করেছেন। কিন্তু অনেক ঈমানদারও তো বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন। কাজেই সঠিক কথা হলো ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالْعَصْرِ ـ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ـ

অর্থাৎ "মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।" (১০৩ ঃ ১-৩) ইতিপূর্বেও এরূপ উক্তি উল্লিখিত হয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে মানুষ! তুমি যখন তোমার প্রথমবারের সৃষ্টি সম্পর্কে জানো তখন শাস্তি ও পুরস্কারের দিনের আগমনের কথা শুনে এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার অর্থাৎ পুনরুত্থানের কথা শুনে এটাকে বিশ্বাস করছো না কেন? এ অবিশ্বাসের কারণ কি? কোন্ বস্তু তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবিশ্বাসী করেছে? যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ?

হযরত মুজাহিদ (রঃ) একবার হযরত ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন "এখানে কি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে বুঝানো হয়েছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি! এখানে শুধু সাধারণ মানুষকেই বুঝানো হয়েছে।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? তিনি কারো প্রতি কোন প্রকার যুলুম বা অত্যাচার করেন না। তিনি অবিচার করেন না। এ কারণেই তিনি কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিনকে অবশ্যই আনয়ন করবেন এবং সেই দিন তিনি প্রত্যেক যালিম, অত্যাচারীর নিকট থেকে যুলুম-অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

ইতিপূর্বে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে একটি হাদীস গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ সূরাটি পাঠ করবে এবং সূরার শেষের اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ـ পর্যন্ত পৌঁছবে তখন যেন সে বলেঃ

بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হ্যাঁ, এবং আমিও এর উপর সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে একজন।"

সূরা ঃ তীন এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ আ'লাক্ মাক্কী

(আয়াত ঃ ১৯, রুকু' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعُهَا : ١)

কুরআনের এই সূরাটিরই নিম্নের আয়াতগুলো সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	١- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ ○
২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে।	٢- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ ○
৩। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত,	٣- اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ ○
৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন–	٤- الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ ○
৫। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।	٥- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ ○

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি অহীর প্রথম সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা প্রভাতের প্রকাশের ন্যায় সঠিকরূপে প্রকাশ পেয়ে যেতো। তারপর তিনি হেরাগিরি গুহায় ধ্যান করতে শুরু করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রাঃ) নিকট থেকে খাদ্য পানীয় নিয়ে তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং কয়েকদিন সেখানে ইবাদত বন্দেগী করে কাটিয়ে দিতেন। তারপর বাসায় এসে খাদ্য পানীয় নিয়ে পুনরায় গমন করতেন। একদিন হঠাৎ সেখানেই প্রথম অহী অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বলেনঃ اِقْرَأْ অর্থাৎ "আপনি পড়ুন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আমি তো পড়তে জানি না।" ফেরেশতা তখন তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তাতে তাঁর কষ্ট হলো। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ "পাঠ করুন।" এবারও তিনি বললেনঃ "আমি তো পড়তে জানি না।"

ফেরেশতা পুনরায় তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এবারও তিনি কষ্ট পেলেন। তারপর ফেরেশতা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ "পড়ুন।" তিনি পূর্বেরই মত জবাব দিলেনঃ "আমি তো পড়তে জানি না।" ফেরেশতা তাঁকে তৃতীয়বার জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং তিনি কষ্ট পেলেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন! "পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন–সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন–শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)কাঁপতে কাঁপতে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে এলেন এবং বললেনঃ "আমাকে চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত কর।" তখন তাঁকে চাদর দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি হযরত খাদীজাকে (রাঃ) সব কথা খুলে বললেন এবং তাঁকে জানালেন যে, তিনি তাঁর জীবনের আশংকা করছেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) তখন তাঁকে (সান্ত্বনার সুরে) বললেনঃ "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করে থাকেন, সদা সত্য কথা বলেন, অপরের বোঝা বহন করেন, অতিথি সেবা করেন এবং সত্যের পথে অন্যদেরকে সাহায্য করেন।" তারপর হযরত খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই অরাকা ইবনে নওফিল ইবনে আসাদ ইবনে আবদিল উয্যা ইবনে কুসাই এর নিকট গেলেন। আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের সময়ে তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবীতে কিতাব লিখতেন এবং আরবী ভাষায় ইঞ্জিলের অনুবাদ করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘটনা শুনুন।" অরাকা নবী করীম (সঃ)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে ভাতিজা! আপনি কি দেখেছেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। অরাকা ঘটনাটি শুনে বললেনঃ "ইনিই সেই রহস্যময় ফেরেশতা যিনি আল্লাহর প্রেরিত বার্তা নিয়ে হযরত মূসার (আঃ) কাছেও আসতেন। আপনার স্বজাতিরা যখন আপনাকে বের করে দিবে তখন যদি যুবক থাকতাম! হায়, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম (তবে কতই না ভাল হতো)!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর একথা শুনে বললেনঃ "তারা আমাকে বের করে দিবে?" অরাকা উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ তবে শুধু আপনাকেই নয়, বরং আপনার মত যাঁরাই নবুওয়াত লাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের

সাথেই এরূপ শত্রুতা করা হয়েছিল। ঠিক আছে, আমি যদি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।" এই ঘটনার পর অরাকা অতি অল্পদিনই বেঁচে ছিলেন। আর এদিকে অহী আসাও বন্ধ হয়ে যায়। তাই নবী করীম (সঃ) মানসিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। কয়েকবার তিনি পর্বত চূড়া থেকে নিজেকে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে বলতেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী।" এতে নবী করীম (সঃ) আশ্বস্ত হতেন এবং তাঁর মানসিক অস্থিরতা অনেকটা কেটে যেতো। তিনি প্রশান্ত চিত্তে বাড়িতে ফিরতেন।'[১]

কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে এই আয়াতগুলোই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। নিজের বান্দার উপর এটাই ছিল আল্লাহর প্রথম নিয়ামত এবং রহমানুর রাহীমের প্রথম রহমত। এখানে মানুষের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন যে, তিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

অর্থাৎ জমাট রক্তের মধ্যে নিজের অসীম রহমতে সুন্দর চেহারা দান করেছেন। তারপর নিজের বিশেষ রহমতে জ্ঞান দান করেছেন এবং বান্দা যা জানতো না তা শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞানের কারণেই আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) সমস্ত ফেরেশতার মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। জ্ঞান কখনো মনের মধ্যে থাকে, কখনো মুখের মধ্যে থাকে এবং কখনো কিতাবের মধ্যে লিখিতভাবে বিদ্যমান থাকে। কাজেই জ্ঞান যে তিন প্রকার তা প্রতীয়মান হয়েছে। অর্থাৎ মানসিক জ্ঞান, শাব্দিক জ্ঞান এবং রসমী জ্ঞান। মানসিক এবং শাব্দিক জ্ঞানের জন্য রসমী জ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু রসমী জ্ঞানের জন্যে এ দুটি জ্ঞান না হলেও চলে। এ কারণেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)কে বলেন, তুমি পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।

একটি আসারে রয়েছেঃ "জ্ঞানকে লিখে নাও। যে ব্যক্তি নিজের অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাকেই সেই জ্ঞানেরও ওয়ারিস করেন যা তার জানা ছিল না।"

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও যুহরী (রঃ) হতে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٦- كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ○

৬। বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে,

٧- اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ○

৭। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী মনে করে।

٨- اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ○

৮। তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।

٩- اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ○

৯। তুমি কি তাকে দেখেছো, যে বাধা দেয় বা বারণ করে

١٠- عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ○

১০। এক বান্দাকে যখন সে নামায আদায় করে?

١١- اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰىٓ ○

১১। তুমি লক্ষ্য করেছো কি, যদি সে সৎপথে থাকে।

١٢- اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ○

১২। অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়,

١٣- اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

১৩। তুমি লক্ষ্য করেছো কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়,

١٤- اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ○

১৪। তবে সে কি অবগত নয় যে, আল্লাহ দেখছেন?

١٥- كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ○

১৫। সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয় তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবো, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে।

١٦- نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ○

১৬। মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।

١٧- فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ○

১৭। অতএব সে তার পরিষদ আহ্বান করুক।

١٨- سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝

১৮। আমিও অচিরে আহ্বান করবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে

١٩- كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ السجدة ع

১৯। সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না, সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ সত্য সত্যই মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পর সে মনে অহংকার পোষণ করে। অথচ তার ভয় করা উচিত যে, একদিন তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে! সেখানে কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে! অর্থ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবেঃ অর্থসম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছো এবং কোথায় ব্যয় করেছো?

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "দু'জন এমন লোভী রয়েছে যাদের পেট কখনো ভরে না। একজন হলো জ্ঞান অনুসন্ধানকারী এবং অপরজন হলো দুনিয়াদার বা তালেবে দুনিয়া। তবে এ দু'জনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জ্ঞান অনুসন্ধানী শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, আর দুনিয়াদার লোভ,হঠকারিতা এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।" তারপর তিনি إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى - أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى এ আয়াত দু'টি পাঠ করেন। এর পর জ্ঞান অন্বেষণকারীর ব্যাপারে পাঠ করেন আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তিটিঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহকে তাঁর জ্ঞানী বা বিদ্বান বান্দারাই ভয় করে।"[১] (৩৫ঃ ২৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তুমি কি তাকে দেখেছো, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে যখন সে নামায আদায় করে?' এই আয়াত অভিশপ্ত আবূ জাহলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে কাবাগৃহে নামায আদায় করতে বাধা প্রদান করতো। প্রথমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাকে বুঝানোর জন্যে নরম সুরে বলেন যে, যাঁকে বাধা দিচ্ছে তিনি যদি সৎপথে থেকে থাকেন,

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মারফূ'রূপে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্তও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ "দুই লোভী ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। একজন হলো জ্ঞান অনুসন্ধানকারী এবং অপরজন হলো দুনিয়া অন্বেষণকারী।"

লোকদেরকে তাকওয়ার দিকে আহ্বান করেন অর্থাৎ পরহেযগারী শিক্ষা দেন, আর সে (আবূ জাহল) তাঁকে ডাঁট ডাপট দেখায়, আল্লাহর ঘর থেকে ফিরিয়ে রাখে, তবে কি তার দুর্ভাগ্যের কোন শেষ আছে? এই হতভাগা কি জানে না যে, যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বিমুখ হয়, আল্লাহ তা দেখছেন? তার কথা শুনছেন? তার কথা এবং কাজের জন্যে তাকে যে আল্লাহ শাস্তি দিবেন তাও কি সে জানে না? এভাবে বুঝানোর পর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাকে ভয় প্রদর্শন করে ধমকের সুরে বলছেনঃ যদি সে এ ধরনের বাধাদান, বিরোধিতা, হঠকারিতা এবং কষ্টদান হতে বিরত না হয় তবে আমি তার মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে হেচড়াবো। কারণ সে হলো মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠ। অতঃপর সে তার পার্শ্বচরদেরকে বা পরিষদকে আহ্বান করুক, আমিও আহ্বান করবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। তারপর কে হারে ও কে জিতে তা দেখা যাবে।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহল বললোঃ "যদি আমি মুহাম্মদকে (সঃ) কাবাঘরে নামায পড়তে দেখি তবে আমি তার ঘাড়ে আঘাত হানবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ খবর পেয়ে বললেনঃ "যদি সে এরূপ করে তবে আল্লাহর আযাবের ফেরেশতা তাকে পাকড়াও করবেন।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহ শরীফে মাকামে ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে নামায পড়ছিলেন, এমন সময় অভিশপ্ত আবূ জাহল এসে বললোঃ "আমি তোমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি বিরত হলে না? এবার যদি আমি তোমাকে কাবা ঘরে নামায পড়তে দেখি তবে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন কঠোর ভাষায় তার হুমকির জবাব দিলেন এবং তার হুমকিকে মোটেই গ্রাহ্য করলেন না। বরং তাকে সতর্ক করে দিলেন। তখন ঐ অভিশপ্ত বলতে লাগলোঃ "তুমি আমাকে সতর্ক করছো? আল্লাহর কসম! আমার এক আওয়াযে সমগ্র প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে।" তখন আল্লাহ তা'আলা فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আবূ জাহল তার পার্শ্বচরদেরকে ডাকতো তবে তখনই আযাবের ফেরেশতারা তাকে ঘিরে ফেলতেন।[১]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রাঃ), নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সাহীহ বলেছেন।

মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহ্ল বললোঃ "আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে কাবাগৃহে নামায পড়তে দেখি তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দিবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "যদি সে এরূপ করতো তবে জনগণের চোখের সামনেই আযাবের ফেরেশতারা তাকে পাকড়াও করতেন।" ঠিক এমনিভাবেই কুরআন কারীমে ইয়াহুদীদেরকে বলা হয়েছেঃ "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে মৃত্যু কামনা কর!" যদি তারা মৃত্যু কামনা করতো তবে অবশ্যই তারা মৃত্যুবরণ করতো এবং তাদের বাসস্থান জাহান্নাম দেখতে পেতো। অনুরূপভাবে নাজরানের খ্রিষ্টানদেরকে মুবাহালার জন্যে ডাক দেয়া হয়েছিল। তারা যদি মুবাহালার জন্যে বের হতো তবে তারা ফিরে এসে তাদের জানমাল এবং সন্তান সন্ততি কিছুই পেতো না।

ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ জাহ্ল বলেছিলঃ "যদি আমি মুহাম্মদ (সঃ)কে পুনরায় মাকামে ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে নামায পড়তে দেখি তবে অবশ্যই তাকে হত্যা করবো!" তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। নবী করীম (সঃ) মাকামে ইবরাহীম (আঃ)এর কাছে গমন করেন। সেখানে আবূ জাহ্লও উপস্থিত ছিল। নবী করীম (সঃ) নামায আদায় করলেন, জনগণ আবূ জাহ্লকে বললোঃ "কি হলো, বসে রইলে যে?" সে উত্তরে বললোঃ "কি আর বলবো! দেখি যে, কে যেন আমার এবং তার মধ্যে পর্দা হয়ে গেল। (অর্থাৎ কে যেন মুহাম্মদকে (সঃ) আড়াল করে দাঁড়ালো।)" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আবু জাহ্ল একটুখানিও নড়াচড়া করতো তবে জনগণের চোখের সামনেই ফেরেশতারা তাকে ধ্বংস করে দিতেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ জাহ্ল (জনগণকে) জিজ্ঞেস করলোঃ "মুহাম্মদ (সঃ) কি তোমাদের সামনে সিজদাহ করে?" জনগণ উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ তখনই ঐ দুর্বৃত্ত বললোঃ আল্লাহর কসম! সে যদি আমার সামনে ঐভাবে সিজদাহ করে তবে আমি অবশ্যই তার ঘাড় ভেঙ্গে দিবো। এবং তার মুখে মাটি ফেলে দিবো।" একদিকে আবূ জাহ্ল এই ঘৃণ্য উক্তি করলো আর অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায শুরু করলেন। তিনি সিজদায় যাওয়ার পর আবূ জাহ্ল সামনের দিকে অগ্রসর হলো বটে কিন্তু সাথে সাথেই ভয়ার্তচিত্তে আত্মরক্ষামূলকভাবে পিছনের দিকে সরে আসলো। জনগণ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললোঃ "আমার এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাঝে আগুনের পরিখা এবং ভয়াবহ

সব জিনিস ও ফেরেশতাদের পালক রয়েছে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “আবূ জাহল যদি আরো কিছু অগ্রসর হতো তবে ফেরেশতারা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক করে দিতেন।” অতঃপর كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى، হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না, বরং তুমি নামায পড়তে থাকো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাকো। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ইবাদত কর এবং যেখানে খুশী নামায পড়তে থাকো। তাকে পরোয়া করার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী রয়েছেন। তিনি তোমাকে শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করবেন। তুমি সিজদাহ কর এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাকো। সিজদার মধ্যে বেশী বেশী করে দু'আ কর।

হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এবং এই اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ সূরায় সিজদাহ করতেন।

সূরাঃ আ'লাক্ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ কাদ্‌র, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৫, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعُهَا : ١)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। নিশ্চয়ই আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে;

١- اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

২। আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?

٢- وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○

৩। মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।

٣- لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○

৪। ঐ রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।

٤- تَنَزَّلُ الْمَلٰۤئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ○

৫। শান্তিই শান্তি, সেই রজনী ঊষার অভ্যুদয় পর্যন্ত।

٥- سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○ ع (١ ع ٥ ٢٢)

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন লায়লাতুল কাদরে কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেন। এই রাত্রিকে লায়লাতুল মুবারকও বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে।" (৪৪ ঃ ৩) কুরআন কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, এ রাত্রি রামাযানুল মুবারক মাসে রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ -

অর্থাৎ "রমযান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (২ ঃ ১৮৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, লায়লাতুল কাদরে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুয হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ঘটনা অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা লায়লাতুল কাদরের শান শওকত ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেনঃ এই রাত্রির এক বিরাট বরকত হলো এই যে, এ রাত্রে কুরআন মজীদের মত মহান নিয়ামত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ) লায়লাতুল কাদর যে কি তা কি তোমার জানা আছে? লায়লাতুল কাদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রঃ) তাঁর জামে গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) আমীর মুআ'বিয়ার (রাঃ) সঙ্গে সন্ধি করার পর এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাঃ)কে বললেনঃ "আপনি ঈমানদারদের মুখ কালো করে দিয়েছেন।" অথবা এভাবে বলেছিলেনঃ "হে মু'মিনদের মুখ কালোকারী।" একথা শুনে হযরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন! তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে দেখানো হয়েছে যে, তাঁর মিম্বরে যেন বানূ উমাইয়া অধিষ্ঠিত হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুটা মনক্ষুন্ন হন। আল্লাহ তা'আলা তখন إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে জান্নাতে হাউযে কাওসার দান করার সুসংবাদ প্রদান করেন। এছাড়া إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ সূরাটিও অবতীর্ণ করেন।

হাজার মাস দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরে বানূ উমাইয়ার রাজত্ব হাজার মাস টিকে থাকাকে বুঝানো হয়েছে। কাসিম ইবনে ফযল (রঃ) বলেনঃ "আমি হিসাব করে দেখেছি।, পুরো এক হাজার মাসই হয়েছে, একদিনও কম বেশী হয়নি।"[১]

কিন্তু কাসিম ইবনে ফযলের (রঃ) এ কথা সঠিক নয়। কেননা, হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর স্বতন্ত্র রাজত্ব ৪০ (চল্লিশ) হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইমাম হাসান (রাঃ) ঐ সময় হযরত মুআ'বিয়ার (রাঃ) হাতে বায়আ'ত গ্রহণ করেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত করেন। অন্যসব লোকও মুআ'বিয়ার (রাঃ) হাতে বায়আ'ত নেন। একত্রিত ভাবে সবাই মুআ'বিয়ার (রাঃ) হাতে বায়আ'ত গ্রহণ করেছিলেন বলে ঐ বছরটি 'আমুল জামাআই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তারপর সিরিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে বানী উমাইয়া সাম্রাজ্য অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তবে নয় বছর পর্যন্ত হারামাইন শারীফাইন অর্থাৎ মক্কা-মদীনা, আহওয়ায এবং আরো কতিপয় শহরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি এই সময়ের মধ্যেও বানূ উমাইয়ার হাত হতে সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে চলে যায়নি বরং কয়েকটি শহর শুধু তাদের হাত ছাড়া হয়েছিল।

---

[১] ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। এর একজন বর্ণনাকারী ইউসুফ মাজহূল বা অজ্ঞাত। শুধু ঐ একটি সনদ হতেই এটা বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৩২ হিজরীতের বানূ আব্বাস বানূ উমাইয়ার হাত হতে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেয়। কাজেই বানূ উমাইয়ার সাম্রাজ্য ৯২ বছর টিকেছিল। এটা এক হাজার মাসের চেয়ে অনেক বেশী। কেননা, এক হাজার মাসে হয় ৮৩ বছর ৪ মাস । হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর শাসনকাল যদি ৯২ বছর হতে বাদ দেয়া যায় তাহলে কাসিম ইবনে ফযলের হিসাব মোটামুটিভাবে নির্ভুল হয়। এ সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এই বর্ণনাটি যঈফ বা দুর্বল হওয়ার আরেকটি কারণ এই যে, বানূ উমাইয়ার শাসনামলে নিন্দে করা ও মন্দ অবস্থা তুলে ধরা এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হলেও ঐ যুগের উপর লায়লাতুল কাদরের ফযীলত প্রমাণিত হওয়া ঐ যুগ নিন্দনীয় হওয়ার প্রমাণ নয়। লায়লাতুল কাদর আপনা আপনিই সকল প্রকার মর্যাদার অধিকারী। এই সূরার সমগ্র অংশেই উক্ত মুবারক রাত্রির মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং বানূ উমাইয়া যুগের নিন্দা প্রকাশের মাধ্যমে লায়লাতুল কাদরের ফযীলত প্রমাণিত হবে কি করে? এটা তো ঠিক কোন ব্যক্তির তরবারীর প্রশংসা করতে গিয়ে ওর হাতলের কাষ্ঠখণ্ডের প্রশংসা করার মত ব্যাপার। উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে নিকৃষ্টমানের কোন ব্যক্তির উপর মর্যাদা দিয়ে তুলনা করলে ঐ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির অসম্মানই করা হবে। এই বর্ণনার ভিত্তিতে এক হাজার বছরের যে উল্লেখ রয়েছে তাতে বানী উমাইয়া খিলাফাতের অধিষ্ঠানের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কা শরীফে, সুতরাং এতে বানূ উমাইয়া যুগের মাসের বরাত দেয়া যায় কি করে? শব্দ বা ভাষাগত কোন ব্যাপারেই সে রকম কিছু বুঝা যায় না। মিম্বর স্থাপিত হয়েছে মদীনায়। হিজরতের বেশ কিছু দিন পর একটি মিম্বর তৈরি করে মদীনায় স্থাপন করা হয়েছিল। এ সব কারণে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই বর্ণনাটি দুর্বল এবং মুনকারও বটে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাণী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেনঃ "ঐ লোকটি এক হাজার মাস পর্যন্ত আল্লাহর পথে অস্ত্র ধারণ করেছিল অর্থাৎ জিহাদে অংশ নিয়েছিল।" মুসলমানরা এ কথা শুনে বিস্মিত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, লায়লাতুল কাদরের ইবাদত ঐ ব্যক্তির এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাঈলের একটি লোক সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং দিনের বেলায় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতেন। এক হাজার মাস পর্যন্ত তিনি এই ভাবে কাটিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এই সুরা অবতীর্ণ করে তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)-এর উম্মতকে সুসংবাদ দেন যে, এই উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি লায়লাতুল কাদরে ইবাদত করে তবে সে বানী ইসরাঈলের ঐ ইবাদতকারীর চেয়ে অধিক পুণ্য লাভ করবে।

মুসনাদে ইবনে আবী হা'তিমে হযরত আলী ইবনে উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাণী ইসরাঈলের চারজন আ'বেদের কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা আশি বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে তাঁরা আল্লাহর নাফরমানী করেননি। তাঁরা হলেন হযরত আইউব (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত হাযকীল ইবনে আ'জূয (আঃ) এবং হযরত ইউশা ইবনে নুন (আঃ)। সাহাবীগণ (রাঃ) এ ঘটনা শুনে খুবই অবাক হলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনার উম্মত এই ঘটনায় বিস্ময়বোধ করেছেন, জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর এর চেয়েও উত্তম জিনিষ দান করেছেন। আপনার উম্মত যে ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছে এটা তার চেয়েও উত্তম।" তারপর তিনি তাঁর কাছে এই সূরাটি পাঠ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত খুশী হলেন।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ লায়লাতুল কাদরের ইবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি পুণ্যকর্ম এক হাজার মাসের লায়লাতুল কাদর বিহীন সময়কালের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। তাফসীরকারগণও এরকমই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) লায়লাতুল কাদর বিহীন সময়ের এক হাজার মাসের চেয়ে একটি লায়লাতুল কাদর উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। একথাই যথার্থ, অন্য কোন কথা সঠিক নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এক রাতের জিহাদের প্রস্তুতি সেই রাত ছাড়া অন্য এক হাজার রাতের চেয়ে উত্তম।"[১] অনুরূপভাবে অন্য একটি হাদীসে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সৎ নিয়তে এবং ভালো অবস্থায় জুমআর নামায আদায়ের জন্যে যায় তার

---

১. এহাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমলনামায় এক বছরের রোযা ও নামাযের সওয়াব লিখা হয়।” এ ধরনের আরো বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। মোটকথা, এক হাজার মাস বলতে এমন এক হাজার মাসের কথা বুঝানো হয়েছে যে সময়ের মধ্যে লায়লাতুল কাদর থাকবে না। যেমন এক হাজার রাত বলতে সেই সব রাতের কথাই বলা হয়েছে যে সব রাতে সেই ইবাদতের রাত থাকবে না। একইভাবে জুমআ'র নামাযে যাওয়ার সওয়াবের যে কথা বলা হয়েছে তাতে এমন এক বছরের পুণ্যের বা সওয়াবের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে জুমআ' থাকবে না।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রমাযান মাস এসে গেলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন “(হে জনমণ্ডলীঃ) তোমাদের উপর রমাযান মাস এসে পড়েছে। এ মাস খুবই বরকত পূর্ণ বা কল্যাণময়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এ মাসের রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যে রাত্রি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের কল্যাণ হতে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয় সে প্রকৃতই হতভাগ্য।”[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রিতে ইবাদত করে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দেয়া হয়।”[২]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ রাত্রির বরকতের আধিক্যের কারণে এ রাত্রে বহু সংখ্যক ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। এমনিতেই ফেরেশতারা সকল বরকত ও রহমতের সাথেই অবর্তীণ হন। যেমন কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে অবতীর্ণ হন, জিক্‌রের মজলিস ঘিরে ফেলেন এবং দ্বীনী ইলম বা বিদ্যা শিক্ষার্থীদের জন্যে সানন্দে নিজেদের পালক বিছিয়ে দেন ও তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

রূহ্ দ্বারা এখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, রূহ্ নামে এক ধরনের ফেরেশতা রয়েছেন। সূরা عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ এর তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

[১] সুনানে নাসাঈতেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

[২] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ কদরের রাত্রি আগাগোড়াই শান্তির রাত্রি। এ রাত্রে শয়তান কোন অনিষ্ট করতে পারে না, কাউকে কোন কষ্ট দিতে পারে না। হযরত কাতাদা (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এই রাত্রে সমস্ত কাজের ফায়সালা করা হয়, বয়স ও রিয্‌ক নির্ধারণ করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ -

অর্থাৎ, "এই রাত্রে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।" (৪৪ ঃ ৪) হযরত শাবী (রঃ) বলেন যে, এই রাত্রে ফেরেশতারা মসজিদে অবস্থানকারীদের প্রতি সকাল পর্যন্ত সালাম প্রেরণ করতে থাকেন। ইমাম বায়হাকী (রঃ) তাঁর 'ফাযায়েলে আকওয়াত' নামক গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি খুবই গারীব বা দুর্বল রিওয়াইয়াত আনয়ন করেছেন, তাতে রয়েছে যে, ফেরেশতারা অবতীর্ণ হন, নামায আদায়কারীদের মধ্যে গমন করেন এবং এতে নামায আদায়কারীরা বরকত লাভ করেন।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত কাব আহবার (রাঃ) হতে একটি বিস্ময়কর দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে, তাতে বহু কিছুর সাথে এও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা সিদরাতুল মুনতাহা থেকে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং মুসলিম নারী পুরুষের জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। আবূ দাউদ তায়ালেসী (রাঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ লায়লাতুল কাদর সাতাশতম অথবা উনত্রিশতম রাত্রি। এই রাত্রে ফেরেশতারা পৃথিবীতে প্রস্তর খণ্ডের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যায় অবস্থান করেন। এ রাত্রে নতুন কোন কিছু (বিদআত) হয় না। হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এ রাত্রে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। কোন অকল্যাণ বা অনিষ্ট সকাল পর্যন্ত এ রাত্রিকে স্পর্শ করতে পারে না।

মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "(রমযান মাসের) শেষ দশ রাত্রির মধ্যে লায়লাতুল কাদর রয়েছে। যে ব্যক্তি এই রাত্রে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দেন। এটা হলো বেজোড় রাত্রি। অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও উনত্রিশতম রাত্রি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেনঃ "লায়লাতুল কাদরের নিদর্শন এই যে, এটা সম্পূর্ণ

স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং এমন উজ্জ্বল হয় যে, যেন চন্দ্রোদয় ঘটেছে। এ রাত্রে শান্তি ও শৈত্য বিরাজ করে। ঠাণ্ডা ও গরম কোনটাই বেশী থাকে না। সকাল পর্যন্ত নক্ষত্র আকাশে জ্বল জ্বল করে। এ রাত্রির আর একটি নিদর্শন এই যে, এর শেষ প্রভাতে সূর্য প্রখর কিরণের সাথে উদিত হয় না। বরং চতুর্দশ রাত্রির চন্দ্রের মত উদিত হয়। সেদিন ওর সাথে শয়তানও আত্মপ্রকাশ করে না।”[১]

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “লায়লাতুল কাদর পরিষ্কার, স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ এবং শীত গরম হতে মুক্ত রাত্রি। এ রাত্রি শেষে সূর্য স্নিগ্ধ আলোকআভায় রক্তিম বর্ণে উদিত হয়।”

হযরত আবূ আসিম নুবায়েল (রঃ) স্বীয় সনদে হযরত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার বলেছিলেনঃ “আমাকে লায়লাতুল কাদর দেখানো হয়েছে। তারপর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে এটা রয়েছে। এ রাত্রি খুবই শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এ রাত্রে শীতও বেশী থাকে না এবং গরমও বেশি থাকে না। এ রাত্রি এতো বেশি রওশন ও উজ্জ্বল থাকে যে, মনে হয় যেন চাঁদ হাসছে। রৌদ্রের তাপ ছড়িয়ে পড়ার আগে সূর্যের সাথে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।”

লায়লাতুল কাদর পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও ছিল, না শুধু উম্মতে মুহাম্মদীকেই (সঃ) বিশেষভাবে এটি দান করা হয়েছে এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত মালিক (রঃ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের বয়স খুব বেশী হতো এবং উম্মতে মুহাম্মদীর (সঃ) আয়ু খুব কম, এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) লক্ষ্য করলেন। তুলনামূলকভাবে তাঁর উম্মত পুণ্য কাজ করার সুযোগ খুব কম পায়। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই লায়লাতুল কাদর দান করেন এবং এ রাত্রির ইবাদতের সওয়াব এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে অধিক দেয়ার অঙ্গীকার করেন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এই লায়লাতুল কাদর শুধু মাত্র উম্মতে মুহাম্মদীকেই (সঃ) প্রদান করা হয়েছে।

শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ‘ইদ্দাহ’ গ্রন্থের রচয়িতা একজন ইমাম জমহূর উলামার এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহপাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

১. এ হাদীসটির সনদ সহীহ বা বিশুদ্ধ, কিন্তু মতন গারীব। কিছু কিছু শব্দের মধ্যে নাকারাত রয়েছে।

খাত্তাবী (রঃ) বলেন যে, এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা রয়েছে। কিন্তু একটি হাদীস দৃষ্টে মনে হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ)-এর মতই পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও লায়লাতুল কাদর বিদ্যমান ছিল।

হযরত মুরসিদ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবূ যারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ লায়লাতুল কাদর সম্পর্কে আপনি নবী কারীম (সঃ)কে কি প্রশ্ন করেছিলেন? হযরত আবূ যার (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ জেনে রেখো যে, আমি নবী করীম (সঃ)-কে প্রায়ই নানা কথা জিজ্ঞেস করতাম। একবার আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আচ্ছা, লায়লাতুল কাদর কি রমযান মাসেই রয়েছে, না অন্য মাসে রয়েছে? নবী করীম (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "লায়লাতুল কাদর রমযান মাসেই রয়েছে।" আমি আবার প্রশ্ন করলামঃ এ রাত্রি কি নবীদের (আঃ) জীবদ্দশা পর্যন্তই থাকে, না কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে? রাসুলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেন, "কিয়ামত পর্যন্তই অবশিষ্ট থাকবে।" আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এ রাত্রি রমযানের কোন্ অংশে রয়েছে? তিনি জবাবে বললেনঃ "এ রাত্রি রমযানের প্রথম দশকে ও শেষ দশকে অনুসন্ধান কর।" আমি তখন নীরব হয়ে গেলাম। নবী করীম (সঃ) অন্য দিকে মনোনিবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আপনার উপর আমার যে হক রয়েছে এ কারণে আপনাকে কসম দিচ্ছি, দয়া করে আমাকে সংবাদ দিন, কদরের নির্দিষ্ট রাত্রি কোনটি? তিনি একথা শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন, তাঁকে আমার উপর এরকম রাগতে এর পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেনঃ "শেষ দশ রাত্রে তালাশ কর, আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।"[১] এতে প্রমাণিত হয় যে, কদরের রাত্রি পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও ছিল। হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরেও কিয়ামত পর্যন্ত প্রতি বছর আসতে থাকবে। শিয়া পন্থী কতকগুলো লোকের অভিমত এই যে, এ রাত্রি সম্পূর্ণরূপে উঠে গেছে। কিন্তু তাদের এ অভিমত সঠিক নয়। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার কারণ এই যে, একটি হাদীসে রয়েছেঃ "কদরের রাত্রি উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তোমাদের জন্য এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ উক্তির তাৎপর্য এই যে, এ রাত্রির নির্দিষ্টতা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, এ রাত্রি উঠিয়ে নেয়া হয়নি। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কদরের রাত্রি রমযান মাসেই আসে, অন্য কোন মাসে নয়।

---

[১] এহাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও কূফার আলেমদের মতে সারা বছর একটি রাত্রি রয়েছে এবং প্রতি মাসেই তা থাকার সম্ভাবনা আছে। এ হাদীস উপরে উল্লিখিত হাদীসের পরিপন্থী। যিনি বলেন যে, সারা রমযান মাসে লায়লাতুল কাদর রয়েছে, তাঁর দলীলরূপে সুনানে আবী দাউদে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। তাতে এই হাদীস আনয়ন করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে লায়লাতুল কাদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "এটা সারা রমযান মাসে রয়েছে।" এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। এটা মাওকুফ রূপেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হতে একটি রিওয়াইয়াত রয়েছে যে, রমযানুল মুবারকের পুরো মাসে লায়লাতুল কাদর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। 'রমযানের প্রথম রাত্রিই কদরের রাত্রি।' এ কথার উপরও একটি রিওয়াইয়াত রয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ইদ্‌রীস আশ্‌শাফিয়ীর (রঃ) মতে রমযান মাসের সপ্তদশ রাত্রিই হলো কদরের রাত্রি। হযরত হাসান বসরীর (রঃ) মাযহাবও এটাই। রমযানের সপ্তদশ রাত্রিকে কদরের রাত্রি বলার স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, রমযানের এই সপ্তদশ রাত্রি ছিল জুমআ'র রাত্রি এবং বদরের যুদ্ধের রাত্রি। সতরই রমযান বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কুরআনে কারীমে ঐ দিনকে 'ইয়াওমূল ফুরকান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রমযানের ঊনিশতম রাত্রি হলো কদরের রাত্রি। আবার একুশতম রাত্রিকেও কদরের রাত্রি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসের প্রথম দশদিনে ই'তেফাক করেন, আমরাও তাঁর সাথে ই'তেকাফ করতে থাকি। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেনঃ "আপনি যেটাকে খুঁজছেন সেটাতো এখনো সামনে রয়েছে। অর্থাৎ কদরের রাত্রি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মধ্যভাগের দশদিন ই'তেকাফ করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ই'তেকাফ করি। আবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেনঃ "আপনি যেটা খুঁজছেন সেটাতো এখনো সামনে রয়েছে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) রযমানের বিশ তারিখের সকালে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দেন এবং বলেনঃ "আমার সাথে ই'তেকাফকারীদের পুনরায় ই'তেকাফে বসে পড়া উচিত। আমি কদরের রাত্রি দেখেছি, কিন্তু এরপর ভুলে গেছি। কদরের রাত্রি রমযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাত্রিতে রয়েছে। আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আমি যেন কাদা ও

পানির মধ্যে সিজদা করছি।" মসজিদে নববী (সঃ)-এর ছাদ ছিল খেজুর পাতার তৈরি। আকাশে তখন মেঘের কোন চিহ্নই ছিল না। হঠাৎ মেঘ উঠলো এবং বৃষ্টি হলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হলো। আমি দেখেছি যে, তাঁর কপালে ভেজা মাটি লেগে রয়েছে।"[১] এ ঘটনা রমযান মাসের একুশ তারিখের রাত্রির ঘটনা বলে এ ধরনের রিওয়াইয়াতে উল্লিখিত রয়েছে।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, রমযান মাসের তেইশতম রাত্রি হলো কদরের রাত্রি। সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসের মাধ্যমে এটা জানা গেছে। রমযান মাসের চব্বিশতম রাত্রি হলো কদরের রাত্রি। এ কথাও একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কদরের রাত্রি হলো চব্বিশতম রাত্রি।"[২] সহীহ বুখারীতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) মুআযযিন হযরত বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির প্রথম সাত রাত্রির মধ্যে কদরের রাত্রি রয়েছে। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এ রিওয়াইয়াতটি মাওকুফ। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত জাবির (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে অহাব (রাঃ) এবং হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, চব্বিশতম রাত্রি হলো কদরের রাত্রি। এক হাদীসের **মর্মানুযায়ী কুরআন কারীম রমযান মাসের চব্বিশ তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, পঁচিশতম রাত্রিই কদরের রাত্রি।** এঁদের যুক্তি হলো এই যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "কদরের রাত্রিকে রমযানের শেষ দশকে খোঁজ কর। প্রথমে নয়, তারপর সাত, তারপর পাঁচ বাকি থাকে।" অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এর দ্বারা বেজোড় রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে। এটাই সর্বাধিক সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ উক্তি। তবে কারো কারো মতে লায়লাতুল কাদর জোড় রাত্রিতে রয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এবং তাঁর জ্ঞানই পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত।

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বলেন যে, হাদীসসমূহের মধ্যে এ হাদীসটি সবচেয়ে বেশী সহীহ বা বিশুদ্ধ।

২. আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদও বিশুদ্ধ। মুসনাদে আহমাদেও এটা রয়েছে কিন্তু এর বর্ণনাকারীর মধ্যে ইবনে লাহিয়া রয়েছেন এবং তিনি যইফ বা দুর্বল।

কদরের রাত্রি রমযানের সাতাশতম রাত্রি বলেও উল্লেখ রয়েছে। সহীহ মুসলিমে সংকলিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এটা সাতাশতম রাত্রি।”

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ)কে বলা হলোঃ আপনার ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলতেনঃ যে ব্যক্তি বছরের প্রত্যেক রাত্রে জেগে থাকবে সে কদরের রাত্রি পেয়ে যাবে। এ কথা শুনে উবাই (রাঃ) বললেনঃ ‘আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, তিনি জানতেন যে, এ রাত্রি রমযান মাসের মধ্যে রয়েছে। আমি কসম করে বলছি যে, কদরের রাত্রি যে রমযানের সাতাইশতম রাত্রি এটাও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) জানতেন। হযরত কা’বকে (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনি এটা কি করে জানলেন? জবাবে তিনি বললেনঃ আমাদের যে সব নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে সে সব দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি। যেমন, ঐ দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময় কিরণহীন অবস্থায় উদিত হয়।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত উবাই (রাঃ) বললেনঃ যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই তাঁর কসম! কদরের রাত্রি রমযানের মধ্যেই রয়েছে। এ কথার উপরে হযরত উবাই (রাঃ) ইনশাআল্লাহ বলেননি, বরং সরাসরি কসম খেয়েছেন। তারপর বলেছেনঃ আমি বিলক্ষণ জানি সেই রাত কোনটি। সেই রাতে রাসূলুল্লাহ ইবাদতের জন্যে খুবই তাগীদ করতেন। সেই রাত্রি হলো রমযানের সাতাশতম রাত্রি। তার নিদর্শন এই যে, সেই দিন সূর্য কিরণহীন অবস্থায় উদিত হয়। তার রঙ থাকে সাদা ও স্বচ্ছ। তাছাড়া সূর্যের তেজ বেশী থাকে না। হযরত মুআ’বিয়া (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কদরের রাত্রি হলো রমযানের সাতাশতম রাত্রি।” পূর্ব যুগীয় গুরুজনদের একটি জামাআতও এ কথা বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রঃ) স্বীকৃত মতও এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হতেও অনুরূপ একটি রিওয়াইয়াত বর্ণিত হয়েছে। পূর্বযুগীয় কোন কোন মণীষী এই কুরআন কারীমের শব্দ দ্বারাও এই উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন তাঁরা বলেন যে, هِيَ (এটা) শব্দটি এই সূরার সাতাশতম শব্দ। অবশ্য আল্লাহ তা’আলাই সবকিছু ভাল জানেন।

হাফিয আবুল কাসিম তিবরাণী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) সমবেত করে কদরের রাত্রি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন সবাই ঐক্যমত প্রকাশ করলেন যে, এ রাত্রি রমযান মাসের শেষ দশকে রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তখন বললেনঃ "ঐ রাত্রি কোন্ রাত্রি সেটাও আমি জানি।" হযরত উমার (রাঃ) তখন প্রশ্ন করলেনঃ 'ওটা কোন্ রাত্রি?" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জবাবে বললেনঃ "শেষ দশকের সাত দিন অতীত হবার পর অথবা সাত দিন বাকি থাকার পূর্বে।" "এটা কি করে জানলেন?" জিজ্ঞেস করলেন হযরত উমার (রাঃ)। উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ "দেখুন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশ ও সৃষ্টি করেছেন সাতটি জমীনও সৃষ্টি করেছেন সাতটি এবং মাস ও সপ্তাহ হিসেবে অর্থাৎ সাতদিনে আবর্তিত হয়। মানুষের জন্ম সাত থেকে, মানুষ সাত বস্তু থেকে খায়, সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সিজদাহ করে, কাবাগৃহের তাওয়াফের সংখ্যা সাত এবং মিনা বাজারে শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করার প্রস্তর খণ্ডের সংখ্যাও সাত। সাত সংখ্যা এ ধরনের আরো বহু কিছু রয়েছে।"

একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "আমাদের বিবেক বুদ্ধি যেখানে পৌঁছেনি, আপনার বিবেক বুদ্ধি সেখানে পৌঁছেছে।" খাদ্য দ্রব্যের সংখ্যা যে সাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াত দ্বারাঃ

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۔ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۔ وَّ زَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۔ وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا ۔ وَّفَاكِهَةً

وَّ اَبًّا ۔ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ۔

অর্থাৎ "আমি ওতে উৎপন্ন করি শস্য, দ্রাক্ষা, শাক-সবজি, যয়তুন, খর্জুর বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য, এটা তোমাদের ও তোমাদের গৃহ পালিত পশুর ভোগের জন্যে।" (৮০ ঃ ২৭-৩২) এ আয়াতে খাদ্য বস্তু হিসেবে সাতটি বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

লায়লাতুল কাদর রমযান মাসের ঊনত্রিশতম রাত্রি বলেও উল্লেখ রয়েছে। হযরত উবাদা ইবনে সামিতের (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এ রাত্রিটিকে রমযান মাসের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রিসমূহে অনুসন্ধান কর অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, ঊনত্রিশ অথবা শেষ রাত্রে।"[২] মুসনাদে আহমাদে

---

১. এ হাদীসটি সনদও উসূলে হাদীসের পরিভাষায় কাভী অর্থাৎ সবল কিন্তু মতন বা ভাষা শব্দ গারীব বা দুর্বল। অবশ্য আল্লাহ তা'আলাই এসম্পর্কে ভাল জানেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "লায়লাতুল কাদর হলো সাতাশতম অথবা উনত্রিশতম রাত্রি। ঐ রাত্রে ফেরেশতারা প্রস্তর খণ্ডের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়।"[১]

'রমযানের সর্বশেষ রাত্রিও কদরের রাত্রি' এর উপরও একটি বর্ণনা রয়েছে। জামে' তিরমিযী এবং সুনানে নাসাঈতে রয়েছেঃ "নয়টি রাত যখন বাকী থাকে বা সাত পাঁচ বা তিন অথবা শেষ রাত অর্থাৎ এ রাতগুলোতে কদরের রাত তালাশ করো।"[২]

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "কদরের রাত্রি হলো রমযানের শেষ রাত্রি।" হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেনঃ এ সব বিভিন্ন প্রকারের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় এই যে, এসব ছিল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর। আসল কথা হলো এই যে, কদরের রাত্রি নির্ধারিত, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। ইমাম তিরমিযী (রঃ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর এ ধরনের অর্থবোধক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। আবূ কালাবা (রঃ) বলেন যে, রমযানের শেষ দশদিনের রাত্রির মধ্যে এ রদবদল হয়ে থাকে। ইমাম মালিক (রঃ) ইমাম সাওরী (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ), ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রঃ), ইমাম আবু সাওর মুযানী (রঃ), ইমাম আবূ বকর ইবনে খুযাইমা (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও এ কথাই বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে ভাল জানেন। এ উক্তির কম বেশী সমর্থন এতেও পাওয়া যায় যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত হয়েছেঃ কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, রযমানের শেষ সাত রাতে নবী করীম (সঃ)-কে 'লায়লাতুল কদর' দেখানো হয়েছে। তিনি বলেনঃ "আমি দেখছি যে, তোমাদের স্বপ্নেও শেষ সাত রাত্রির ইঙ্গিত রয়েছে। কদরের রাত্রি অনুসন্ধানকারীর এ সাত রাত্রেই তা সন্ধান করা উচিত।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লায়লাতুল কাদর তালাশ করো।" ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন যে, কদরের রাত্রি প্রত্যেক রমযানের একটি নির্দিষ্ট রাত্রি। তার কোন রদ বদল হয় না। এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত

---

[১] এ হাদীসের সনদও উত্তম।

[২] ইমাম তিরমিযী (রঃ) এই বর্ণনাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

একটি হাদীসের স্বপক্ষে যুক্তি বলে প্রমাণিত হতে পারে। ঐ হাদীসটি হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে লায়লাতুল কাদরের খবর দেয়ার জন্যে বের হন। কিন্তু দেখলেন যে, দু'জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "আমি তোমাদেরকে কদরের রাত্রির খবর দিতে এসেছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের ঝগড়ার কারণে ঐ রাত্রির বিষয়টি আমার স্মৃতি থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তোমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত হয়েছে। এখন ওটাকে রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম এবং পঞ্চম রাত্রে তালাশ করো।" এ রাত্রি সব সময়ের জন্যে নির্ধারিত না হলে প্রতি বছরের কদরের রাত্রি কবে তা জানা যেতো না। এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে। লায়লাতুল কাদরের মধ্যে যদি রদবদল হতো তাহলে সেই বছরের কদরের রাত্রি কবে তা জানা যেতো না। এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য বছরের জন্যে এ নির্ধারণ কাজে আসতো না। তবে হ্যাঁ, একটা জবাব এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ বছরের লায়লাতুল কাদরের সংবাদ দেয়ার জন্যেই এসেছিলেন। এ হাদীসটি থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, ঝগড়া বিবাদ, কল্যাণ, বরকত এবং ফলপ্রসূ জ্ঞান বিনষ্ট করে দেয়। অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, বান্দা নিজের পাপের কারণে, আল্লাহর দেয়া রিয্‌ক থেকে বঞ্চিত হয়।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, কাদরের রাত্রি তুলে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলোঃ কদরের রাত নির্ধারণের জ্ঞান তুলে নেয়া হয়েছে। কদরের রাত্রিই যে তুলে নেয়া হয়েছে এমন নয়, কিন্তু অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় বলে যে, কদরের রাত্রিই তুলে নেয়া হয়েছে। কদরের রাত্রি যে তুলে নেয়া হয়নি তার বড় প্রমাণ হলো এই যে, উপরোক্ত কথার পরই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম এবং পঞ্চম রাত্রে তালাশ করো।" নবী করিম (সঃ) যে বলেছেনঃ "লায়লাতুল কদরের নির্ধারণ সম্পর্কিত জ্ঞান তুলে নেয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ তোমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" এর ভাবার্থ হলো এই যে, এই রাত্রি সন্ধানকারী সম্ভাব্য সমস্ত রাত্রে ভক্তি বিনয়ের সাথে ইবাদত করবে। আর এই রাত্রি নির্ধারিত হয়ে গেলে শুধু ঐ রাত্রেই ইবাদত করবে। আর এই রাত্রি নির্ধারণ না করার মধ্যে বিজ্ঞানময় আল্লাহর হিকমত এই যে, এর ফলে এই রাত্রি পাওয়ার আশায় পবিত্র রযমান মাসে বান্দা মন দিয়ে ইবাদত করবে এবং রমযানের শেষ দশকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ইবাদতের কাজেই নিয়োজিত করবে। নবী করীম (সঃ)ও ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রত্যেক রমযান মাসের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সহধর্মীরা

উক্ত সময়ে ই'তেকাফ করতেন।[১] হযরত ইবনে উমারের (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রমযানের দশদিন বাকি থাকার সময়েই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা রাত্রি জেগে কাটাতেন এবং গৃহবাসীদেরকেও জাগাতেন এবং কোমর কষে নিতেন (অর্থাৎ ইবাদতের জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেতেন।)[২]

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই সময়ে যেরূপ পরিশ্রমের সাথে ইবাদত করতেন অন্য কোন সময়ে সেরূপ পরিশ্রমের সাথে ইবাদত করতেন না। কোমর বেঁধে নিতেন বা কোমরে তহবন্দ বাঁধতেন এর ভাবার্থ এই যে,ইবাদতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। এর অর্থ এও হতে পারে যে, তিনি ঐ সময়ে স্ত্রী সহবাস করতেন না। আবার উভয় অর্থও হতে পারে। অর্থাৎ ঐ সময়ে তিনি স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন না। এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ইবাদত করতেন।

মুসনাদে আহমদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রমযান মাসের দশ দিন বাকী থাকতো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তহবন্দ বেঁধে নিতেন এবং স্ত্রীদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকতেন।

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, রমযানের শেষ দশ রাতে লায়লাতুল কাদরকে সমান গুরুত্বের সাথে তালাশ করতে হবে। কোন রাতকে কোন রাত্রের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সব সময়েই তো দূআর আধিক্য মুসতাহাব, তবে রমযান মাসে দু'আ আরো বেশী করে করতে হবে, বিশেষ করে রমযানের শেষ দশকে এবং বেজোড় রাত্রে। নিম্নের দু'আটি খুব বেশী পাঠ করতে হবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন!"

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আমি কদরের রাত্রি পেয়ে যাই তবে আমি কি

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দু'আ পাঠ করবো? উত্তরে তিনি বললেনঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ এই দু'আটি পাঠ করবে।"[১]

ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতিম (রঃ) এই সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর রিওয়াইয়াত আনয়ন করেছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, সপ্তম আকাশের শেষ সীমায় জান্নাতের সাথে সংযুক্ত রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা, যা দুনিয়া ও আখেরাতের দূরত্বের উপর অবস্থিত। এর উচ্চতা জান্নাতে এবং এর শিকড় ও শাখা প্রশাখাগুলো কুরসীর নিচে প্রসারিত। তাতে এতো ফেরেশতা অবস্থান করেন যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা আল্লাহপাক ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি কোন চুল পরিমাণও জায়গা নেই যেখানে ফেরেশতা নেই। ঐ বৃক্ষের মধ্যভাগে হযরত জিবরাঈল (আঃ)! অবস্থান করেন।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে ডাক দিয়ে বলা হয়, হে জিবরাঈল (আঃ) কদরের রাত্রিতে সমস্ত ফেরেশতাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও।" এই ফেরেশতাদের সবারই অন্তর স্নেহ ও দয়ায় ভরপুর। প্রত্যেক মুমিনের জন্যে তাঁদের মনে অনুগ্রহের প্রেরণা রয়েছে। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই কদরের রাত্রিতে এসব ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে নেমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং সব জায়গায় সিজদায় পড়ে যান। তাঁরা সকল ঈমানদার নারী পুরুষের জন্যে দু'আ করেন। কিন্তু তাঁরা গীর্জায় মন্দিরে, অগ্নি পূঁজার জায়গায়, মূর্তি পূজার জায়গায়, আবর্জনা ফেলার জায়গায়, নেশা খোরের অবস্থান স্থলে, নেশাজাত দ্রব্যাদি রাখার জায়গায়, মূর্তি রাখার জায়গায়, গান বাজনার সাজ সরঞ্জাম রাখার জায়গায় এবং প্রস্রাব পায়খানার জায়গায় গমন করেন না। বাকি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁরা ঈমানদার নারীপুরুষদের জন্য দু'আ করে থাকেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) সকল ঈমানদারের সাথে করমর্দন করেন। তাঁর কর মর্দনের সময় মুমিন ব্যক্তির শরীরের লোমকুপ খাড়া হয়ে যায়।, মন নরম হয় এবং চোখে অশ্রু ধারা নেমে আসে। এসব নিদর্শন দেখা দিলে বুঝতে হবে তার হাত হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর হাতের মধ্যে রয়েছে। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ঐ রাত্রে যে ব্যক্তি তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তার প্রথমবারের পাঠের সাথে সাথেই সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার পড়ার সাথে সাথেই আগুন থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এবং

---

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসায়ীও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়বারের পাঠের সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ সুনিশ্চিত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেনঃ হে আবূ ইসহাক (রঃ)! যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের সাথে এ কালেমা উচ্চারণ করে তার কি হয়? জবাবে তিনি বলেনঃ সত্য বিশ্বাসীর মুখ হতেই তো এ কালেমা উচ্চারিত হবে। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! লায়লাতুল কাদর কাফির ও মুনাফিকদের উপর এতো ভারী বোধ হয় যে, যেন তাদের পিঠে পাহাড় পতিত হয়েছে। ফজর পর্যন্ত ফেরেশতারা এভাবে রাত্রি কাটিয়ে দেন। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে উঠে যান এবং অনেক উপরে উঠে স্বীয় পালক ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেই বিশেষ দুটি সবুজ পালক প্রসারিত করেন যা অন্য কোন সময় প্রসারিত করেন না। এর ফলে সূর্যের কিরণ মলিন ও স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর তিনি সমস্ত ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যান। সব ফেরেশতা উপরে উঠে গেলে তাদের নূর এবং জিবরাঈল (আঃ)-এর পালকের নুর মিলিত হয়ে সূর্যের কিরণকে নিষ্প্রভ করে দেয়। ঐ দিন সূর্য অবাক হয়ে যায়। সমস্ত ফেরেশতা সে দিন আকাশ ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ঈমানদার নারী পুরুষের জন্য রহমত কামনা করে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তাঁরা ঐ সব লোকের জন্যেও দু'আ করেন যারা সৎ নিয়তে রোযা রাখে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী রমযান মাসেও আল্লাহর ইবাদত করার মনোভাব পোষণ করে। সন্ধ্যায় সবাই প্রথম আসমানে পৌঁছে যান। সেখানে অবস্থানকারী ফেরেশতারা এসে তখন পৃথিবীতে অবস্থানকারী ঈমানদারকে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক, বলে বলে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ফেরেশতারা বলেনঃ তাকে আমরা গত বছর ইবাদতে লিপ্ত দেখে ছিলাম, কিন্তু এবার সে বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আবার অমুককে গত বছর বিদআতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার তাকে ইবাদতে লিপ্ত দেখে এসেছি। প্রশ্নকারী ফেরেশতারা তখন শেষোক্ত ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত, রহমতের দুআ' করেন। ফেরেশতারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাদেরকে আরো জানান যে, তাঁরা অমুক অমুককে আল্লাহর যিক্‌র করতে দেখেছেন, অমুক অমুককে রুকূ'তে, অমুক অমুককে সিজদায় পেয়েছেন। এবং অমুক অমুককে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছেন। একরাত একদিন প্রথম আসমানে কাটিয়ে তাঁরা দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন। সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনি করে তাঁরা নিজেদের জায়গা সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌঁছেন। সিদরাতুল মুনতাহা তাঁদেরকে বলেঃ আমাতে অবস্থানকারী হিসেবে তোমাদের প্রতি আমার দাবী রয়েছে। আল্লাহকে যারা ভালবাসে আমিও তাদেরকে ভালবাসি। আমাকে তাদের

অবস্থার কথা একটু শোনাও, তাদের নাম শোনাও। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেনঃ ফেরেশতারা তখন আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের নামও পিতার নাম জানাতে শুরু করেন। তারপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে সম্বোধন করে বলেঃ তোমাতে অবস্থানকারীরা তোমাকে যে সব খবর শুনিয়েছে সে সব আমাকেও একটু শোনাও। তখন সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সব কথা শুনিয়ে দেয়। শোনার পর জান্নাত বলেঃ অমুক পুরুষ ও নারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! অতি শীঘ্রই তাদেরকে আমার সাথে মিলিত করুন।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম নিজের জায়গায় পৌঁছে যান। তাঁর উপর তখন ইলহাম হয় এবং তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার অমুক অমুক বান্দাকে সিজদারত অবস্থায় দেখেছি। আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন বলেনঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দেন। তখন ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, অমুক অমুক নারী পুরুষের উপর আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত হয়েছে। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ হে আল্লাহ“ গত বছর আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং আপনার ইবাদতকারী হিসেবে দেখেছি কিন্তু এবার সে বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এবং আপনার বিধিবিধানের অবাধ্যতা করেছে। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! সে যদি মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেও তাওবা করে নেয় তাহলে আমি তাকে মাফ করে দিবো। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন হঠাৎ করে বলেনঃ হে আল্লাহ আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। আপনি সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার সৃষ্ট জীবের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবান। বান্দা তার নিজের উপর যেরূপ মেহেরবানী করে থাকে আপনার মেহেরবানী তাদের প্রতি তার চেয়েও অধিক। ঐ সময় আরশ এবং ওর চার পাশের পর্দাসমূহ এবং আকাশ ও ওর মধ্যস্থিত সবকিছুই কেঁপে ওঠে বলেঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ “করুণাময় আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা” হযরত কাব (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পূর্ণ করে রমযানের পরেও পাপমুক্ত জীবন যাপনের মনোভাব পোষণ করে সে বিনা প্রশ্নে ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সূরা ঃ কাদ্‌র এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ বাইয়্যিনাহ্, মাদানী

(আয়াত ঃ ৮, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعُهَا: ١)

মুসনাদে আহমাদে হযরত আমর ইবনু সাবিত আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ যখন لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ۔ সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এ সূরাটি হযরত উবাই (রাঃ)-এর নিকট পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উবাই (রাঃ)-কে এ কথা জানানোর পর হযরত উবাই (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! সেখানে কি আমার কথা আলোচিত হয়েছে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ।" হযরত উবাই (রাঃ) তখন কেঁদে ফেললেন।

মুসনাদেরই অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উবাই (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আল্লাহ্ তা'আলা কি আমার নাম উচ্চারণ করেছেন?" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তরে 'হ্যাঁ' বললেন। তখন হযরত উবাই (রাঃ) কেঁদে ফেললেন।[১]

মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, যে সময় হযরত উবাই (রাঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন সে সময় বর্ণনাকারী হযরত উবাই (রাঃ)-কে বলেনঃ "হে আবূ মুন্যির (রাঃ)! তাহলে তো আপনি খুবই আনন্দিত হয়েছেন?" উত্তরে হযরত উবাই (রাঃ) বলেনঃ কেন আনন্দিত হবো না? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং বলেনঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْاؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ۔

অর্থাৎ "তুমি বলে দাওঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করে যেন তারা আনন্দিত হয়। এটা তারা যা পুঞ্জীভূত করে তার চেয়ে বহুগুণে উত্তম।" (১০ ঃ ৫৮)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উবাই (রাঃ)-এর সামনে এ সূরাটি পড়ার পর পাঠ করেনঃ

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ)ও বর্ণনা করেছেন।

لَوْ اَنَّ اِبْنَ اٰدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَاُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَاُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ اِبْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ وَاِنَّ ذَاتَ الدِّيْنِ عِنْدَ اللّٰهِ الْحَنِيْفِيَّةُ غَيْرِ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُوْدِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ وَمَنْ يَّفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُّكْفَرَهُ ۔

অর্থাৎ “আদম সন্তান যদি একটা উপত্যকা পূর্ণ মাল যাঞ্চা করে, অতঃপর তাকে তা দেয়া হয় তবে অবশ্যই সে দ্বিতীয়টির জন্যে প্রার্থনা করবে, সেটাও যদি তাকে প্রদান করা হয় তবে সে তৃতীয়টির জন্যে প্রার্থনা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না। তবে যে তাওবা’ করবে আল্লাহ্ তার তাওবা’ কবুল করবেন। আল্লাহ্র কাছে ঐ ব্যক্তিই দ্বীনদার যে একাগ্রচিত্তে তাঁর ইবাদত করে। তবে সে মুশ্রিক, ইয়াহুদী এবং নাসারা হতে পারবে না। যে ব্যক্তি কোন পুণ্য কাজ করবে তার অমর্যাদা করা হবে না।”[১]

হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “হে আবুল মুনযির (রাঃ)! আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন তোমার সামনে কুরআন পাঠ করি।” হযরত উবাই (রাঃ) তখন বলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছি।” নবী করীম (সঃ) ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। হযরত উবাই (রাঃ) তখন আরয করলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমার কথা কি সেখানে আলোচনা করা হয়েছে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ “হ্যাঁ, তোমার নাম ও নসব এ সবই মালায়ে আ’লায় আলোচিত হয়েছে।” হযরত উবাই (রাঃ) তখন বললেনঃ “তা হলে পাঠ করুন!”[২]

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে হযরত উবাই (রাঃ)-এর মানসিক দৃঢ়তা এবং ঈমান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর সামনে এ সূরাটি পাঠ করেছিলেন।

---

১. জামে তিরমিযীতেও বর্ণনাটি রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিজ আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ পদ্ধতিতে এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। পূর্বে যেটা বর্ণনা করা হয়েছে সেটাই প্রমাণিত।

মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ এবং সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআত শুনে হযরত উবাই (রাঃ) অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে তিনি যেমনভাবে এ সূরার কিরআত শুনেছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তেমনভাবে পড়েননি। রাগতভাবে হযরত উবাই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট গমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উভয়ের কিরআত শুনে বলেনঃ "উভয়ের কিরআতই বিশুদ্ধ।" হযরত উবাই (রাঃ) বলেনঃ আমি এ কথা শুনে এমন সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলাম যে, যেন অজ্ঞতার যুগের সন্দেহ আমার সামনে এসে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এ অবস্থা দেখে আমার বুকে হাত রাখলেন। আমার বুক ঘামে ভিজে গেল। আমার উপর এমন ভয় চাপলো যে, যেন আমি রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্কে সামনে দেখতে পাচ্ছি। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ "শোনো, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার সামনে এসেছিলেন। তিনি বললেনঃ 'উম্মতকে একই কিরআতে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।' আমি বললামঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং মাগফিরাত কামনা করছি। অতঃপর আমাকে দু'প্রকারের কিরআতের অনুমতি প্রদান করা হলো। কিন্তু আমি আরো বাড়ানোর আবেদন জানালাম। অবশেষে সাত প্রকারের কিরআত পাঠের অনুমতি দেয়া হলো।" অতঃপর এ সূরা নাযিল হলো এবং এতে রয়েছেঃ

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ـ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ـ

নবী করীম (সঃ) মানসিক দৃঢ়তার শিক্ষা দান এবং সতর্ককরণের উদ্দেশ্যে হযরত উবাই (রাঃ)-কে এ সূরাটি তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দেন। কেউ যেন এটা মনে না করে যে, শিখবার ও মনে রাখবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উবাই (রাঃ)-এর সামনে এ সূরাটি তিলাওয়াত করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) একাধিক কিরআতের মাধ্যমে কুরআন কারীম পাঠ করায় হযরত উবাই (রাঃ)-এর মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল তা নিরসন কল্পেই রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই সূরাটি হযরত উবাই (রাঃ)-কে পাঠ করে শোনান। হযরত উমর (রাঃ)-এর ঘটনাও একই ধরনের। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির বছরে সন্ধির ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আপনি কি বলেননি যে, আমরা কা'বা শরীফে যাবো এবং তাওয়াফ করবো?" উত্তরে

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, তা বলেছিলাম বটে, কিন্তু এটা তো বলিনি যে এ বছরই এটা হবে? নিঃসন্দেহে সে সময় আসছে যখন তুমি সেখানে পৌঁছবে ও তাওয়াফ করবে।" হুদাইবিয়া হতে ফিরবার পথে সূরা ফাত্হ নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উমর (রাঃ)-কে ডেকে সূরাটি পড়ে শোনালেন। তাতে নিম্নের আয়াতটিও ছিলঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তার রাসূল (সঃ)-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে।" (৪৮ ঃ ২৭)

হাফিয আবূ নাঈম (রাঃ) তাঁর أَسْمَاءِ صَحَابَةٍ নামক গ্রন্থে একটি হাদীস সংযোজন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ সূরাটির কিরআত শুনে বলেনঃ 'হে আমার বান্দা! তুমি খুশী হয়ে যাও, আমার মর্যাদার শপথ! তোমাকে জান্নাতে এমন বাসস্থান দিবো যে, তুমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে।[১]

হযরত মাতার আলমুযানী অথবা মাদানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ সূরাটির কিরআত শুনে বলেনঃ 'আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হবো না এবং তোমাকে জান্নাতে এমন বাসস্থান দান করবো যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।"[২]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

১। কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

---

[১] এ হাদীসটি উসূলে হাদীসের পরিভাষায় নিতান্ত গারীব বা দুর্বল।

[২] আবূ মূসা আলমাদানী (রঃ) এবং ইবনুল আমীর (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢- رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً ○

২। আল্লাহর নিকট হতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ।

٣- فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ○

৩। যাতে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাসমূহ রয়েছে।

٤- وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ○

৪। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

٥- وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ
وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ
وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ○

৫। তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

আহলে কিতাব দ্বারা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর মুশরিকীন দ্বারা বুঝানো হয়েছে মূর্তি পূজক আরব এবং অগ্নিপূজক অনারবদেরকে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিল না যে পর্যন্ত না তাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়।

আল্লাহর কোন একজন রাসূল যিনি পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে শুনিয়ে দেন, যাতে আছে সঠিক বিধান, এর দ্বারা কুরআন কারীমের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ - مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ - بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ -

অর্থাৎ "ওটা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র, মহান, পূতঃচরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।" (৮০ ঃ ১৩-১৬)

সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয়নি।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, নবী করীম (সঃ) উত্তমভাবে কুরআনের ওয়ায করেন এবং কুরআনের সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এ সব সহীফায় সত্য ন্যায়ের কথা সম্বলিত বিষয়সমূহ রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল। যেমন বিভিন্নভাবে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছেঃ 'ইয়াহুদীরা একাত্তর ফিরকা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল, আর নাসারারা বা খ্রিস্টানরা বিভক্ত হলো বাহাত্তর ফিরকায়। এই উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ) তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত। তার মধ্যে একটি মাত্র ফিরকা ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কারা?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে আদর্শের উপর রয়েছি (এই আদর্শের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।)।"

আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেনঃ অথচ তাদের প্রতি এই নির্দেশই ছিল যে, তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ـ

অর্থাৎ "তোমার পূর্বে আমি যতো রাসূল পাঠিয়েছি সবারই কাছে এই অহী করেছি যে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" (২১ ঃ ২৫) এখানেও আল্লাহ পাক বলেনঃ একনিষ্ঠ হয়ে অর্থাৎ শিরক হতে দূরে থেকে এবং তাওহীদ বা একত্ববাদে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ইবাদত করো। যেমন অন্যত্র বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি। (সেই কথা বলার জন্যে যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাগূত হতে দূরে থাকো।" (১৬ ঃ ৩৬)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, এটাই সঠিক দ্বীন।' যাকাত দিবে এর অর্থ এই যে, ফকীর মিসকীন এবং অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এই দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম মযবূত, সরল, সহজ এবং কল্যাণধর্মী। বহু সংখ্যক ইমাম যেমন ইমাম যুহরী (রঃ), ইমাম শাফিয়ী (রঃ) প্রমুখ এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এই আয়াতের সরলতা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত, নামায আদায় ও যাকাত প্রদানকেই দ্বীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ اُولٰٓئِكَ هُمْ
شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ ○

৬। কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা নরকাগ্নির মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।

٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ ۗ ○

৭। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

٨- جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ رَبَّهٗ ع ○ ١ ع ٨ ٢٣

৮। তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের উপর প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; এটা তার জন্য যে তার প্রতিপালকের ভয় করে।

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, কাফির, ইয়াহূদী, নাসারা, মুশরিক, আরব ও অনারব যেই হোক না কেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরোধ এবং আল্লাহর কিতাবকে অবিশ্বাস করে তারা কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে। কোন অবস্থাতেই তারা সেখান থেকে ছাড়া বা রেহাই পাবে না। এরাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

এরপর আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবান বান্দাদের পরিণাম সম্পর্কে বলেনঃ নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। এ আয়াত থেকে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) এবং একদল আলেম ব্যাখ্যা করেন

যে, ঈমানদার মানুষ আল্লাহর ফেরেশতাদের চেয়েও উৎকৃষ্টতর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাদের প্রতিদান স্বরূপ তাদের প্রতিপালকের নিকট সর্বদা অবস্থানের জান্নাতসমূহ রয়েছে যেগুলোর নিম্নদেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। এটা ঐ ব্যক্তির জন্যে যে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে অর্থাৎ যার মনে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয় ভীতি রয়েছে। ইবাদত করার সময় যে মন প্রাণ দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে, এমনভাবে ইবাদত করে যেন চোখের সামনে রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে। যে রাব্বুল আ'লামীন সব কিছুরই মালিক এবং যিনি সর্বশক্তিমান।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বোত্তম সৃষ্ট জীব কে এ সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দিবো না?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে আপনি এ খবর দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে ঐ মানুষ সবচেয়ে উত্তম যে জিহাদের ডাক শোনার জন্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে, যেন শোনা মাত্রই ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারে এবং শত্রুদলে প্রবেশ করে বীরত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। এবার আমি তোমাদেরকে এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছি। যে ব্যক্তি নিজের বকরীর পালের মধ্যে অবস্থান করা সত্ত্বেও নামায আদায় করতে এবং যাকাত দিতে কৃপণতা করে না। এবার তোমাদেরকে এক নিকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছি। সে হলো ঐ ব্যক্তি যে (কোন অভাবগ্রস্তকে) আল্লাহর নামে কিছু চাওয়ার পর কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।"

সূরা ঃ বাইয়্যিনাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ যিলযাল মাদানী

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৮, রুকূ' ঃ ১)

(اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعُهَا : ١)

জামে' তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে পড়িয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ الٓرٰ যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ করো।" লোকটি বললো "আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, স্মৃতিশক্তি আমার দুর্বল হয়ে গেছে এবং জিহ্বা মোটা হয়ে গেছে (সুতরাং এই সূরাগুলো পড়া আমার পক্ষে কঠিন)।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "আচ্ছা, তাহলে حٰمٓ যুক্ত সূরাগুলো পড়।" লোকটি পুনরায় একই ওযর পেশ করলো। তখন নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন "তাহলে يُسَبِّحُ বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করো।" লোকটি ঐ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করলো এবং বললোঃ আমাকে একটি সূরার সবক দিন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে اِذَا زُلْزِلَتْ এই সূরাটিই পাঠ করালেন। পড়া শেষ করার পর লোকটি বললোঃ "আল্লাহর কসম! আমি কখনো এর অতিরিক্ত কিছু করবো না।" এই কথা বলে লোকটি চলে যেতে শুরু করলো। তখন নবী করীম (সঃ) বললেনঃ "এ লোকটি সাফল্য অর্জন করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে।"

তারপর তিনি বললেনঃ "তাকে একটু ডেকে আনো।" লোকটিকে ডেনে আনা হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ আমাকে ঈদুল আযহার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দিনকে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্যে ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।" একথা শুনে লোকটি বললোঃ "যদি আমার কাছে কুরবানীর পশু না থাকে এবং কেউ আমাকে দুধ পানের জন্যে একটা পশু উপঢৌকন দেয় তবে কি আমি ঐ পশুটি যবাহ করে ফেলবো?" রাসূলুল্লাহ উত্তরে বললেনঃ 'না, না। (এ কাজ করো না) বরং চুল ছাটিয়ে নাও, নখ কাটিয়ে নাও, গোঁফ ছোট করো এবং নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করো, এ কাজই আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে পুরোপুরি কুরবানী রূপে গণ্য হবে।"[১]

জামে' তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করে সে অর্ধেক কুরআন পাঠের সওয়াব লাভ করে।"[২]

---

১. এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদ ও সুনানে নাসাঈতেও বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, إِذَا زُلْزِلَتْ সূরাটি অর্ধেক কুরআনের সমতুল্য, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এ সূরাটি কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য।[1]

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদের একজনকে বলেনঃ "তুমি কি বিয়ে করেছো?" লোকটি উত্তরে বলেনঃ "জ্বী, না। আমার বিয়ে করার মত সামর্থ্য নেই।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ "এ সূরাটি কি তোমার সাথে নেই (অর্থাৎ এ সূরাটি কি তোমার মুখস্ত নেই)?" লোকটি জবাবে বললেনঃ "হ্যাঁ (তা তো আছেই)।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হলো।" তারপর বললেনঃ "তোমার সাথে কি إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এই সূরাটি নেই?" লোকটি বললেনঃ "হ্যাঁ', আছে। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ "এতে কুরআনের এক চতুর্থাংশ হলো।" এরপর বললেন قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ "এ সূরাটি কি তোমার জানা নেই?" লোকটি জবাব দিলেনঃ "হ্যাঁ আছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "এটা কুরআনের এক চতুর্থাংশ" অতঃপর বললেনঃ "তোমার কি إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ এ সূরাটি মুখস্ত নেই?" লোকটি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এটাও কুরআনের এক চুতর্থাংশ। যাও, এবার বিয়ে করে নাও।"[2]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
১। পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,	١- إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ○
২। এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমূহ বের করে দিবে,	٢- وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ○
৩। এবং মানুষ বলবেঃ এর কি হলো?	٣- وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ○
৪। সেইদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,	٤- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ○

---

[1] এটাও গারীব বা দুর্বল হাদীস।

[2] এই হাদীসটি হাসান। এই তিনটি হাদীসই ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া আসহাবুল কুতুবের অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেননি।

٥- بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

৫। তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন,

٦- يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝

৬। সেইদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।

٧- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

৭। কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে।

٨- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝ ع

৮। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ জমীনকে যখন ভীষণ কম্পনে কম্পিত করা হবে, নীচে থেকে উপর পর্যন্ত প্রকম্পনে ভিতরের সমস্ত মৃতকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে। যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থাৎ “হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার।” (২২ ঃ ১) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ـ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ

অথাৎ “এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে ও পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।” (৮৪ ঃ ৩-৪)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জমীন তার কলেজার টুকরোগুলোকে উগরে দিবে এবং বাইরে নিক্ষেপ করবে। স্বর্ণ রৌপ্য স্তম্ভের মত বাইরে বেরিয়ে পড়বে। হত্যাকারী সে সব দেখে বলবেঃ হায়! আমি এই ধন সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করে ছিলাম, অথচ আজ ওগুলো এভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কেউ যেন ওগুলোর দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না!” আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দুর্ব্যবহারকারী দুঃখ করে বলবেঃ “হায়! এই ধন সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করিনি!” চোর বলবেঃ “হায়! এই মাল ধনের জন্যে আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছিল!” অতঃপর ওগুলো তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা ওগুলো হতে কিছুই গ্রহণ করবে না।”

মোটকথা, সেই ধন সম্পদ এমনভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে যে, ওগুলোর প্রতি কেউ চোখ তুলেও চাইবে না। মানুষ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে বলবেঃ হায়! এগুলোর তো নড়া চড়া করার কোন শক্তি ছিল না। এগুলো তো স্তব্ধ নিথর হয়ে পড়ে থাকতো। আজ এগুলোর কি হলো যে, এমন থরথর করে কাঁপছে! পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মৃতদেহ জমীন বের করে দিবে। তখন মানুষ বলবেঃ এর কি হলো? জমীন ও আসমান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। ঐ দৃশ্য সবাই দেখবে এবং সবাইকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। জমীন খোলাখুলি ও সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি তার উপর অমুক অমুক নাফরমানী করেছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বললেনঃ “জমীনের বৃত্তান্ত কি তা কি তোমরা জানো?” সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আদম সন্তান যে সব আমল জমীনে করেছে তার সব কিছু জমীন এভাবে প্রকাশ করে দিবে, যে অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক জায়গায় এই এই পাপ ও এই এই পুণ্য কাজ করেছে।”[১]

মু’জামে তিবরানীতে হযরত রাবীআ’হ হাদাসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জমীনের ব্যাপারে সাবধান থেকো। ওটা তোমাদের মা। ওর উপর যে ব্যক্তি যে পাপ বা পুণ্য কাজ করবে সে তো খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দিবে।” এখানে অহী দ্বারা আদেশ করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা জমীনকে বলবেনঃ ‘বলে দাও।’ তখন সে বলে দিবে। সেদিন মানুষ হিসাবের জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের দলে বিভক্ত হয়ে ফিরবে। কেউ হবে পুণ্যবান এবং কেউ হবে পাপী। কেউ জান্নাতী হবে, আবার কেউ জাহান্নামী হবে। এ অর্থও করা হয়েছে যে, এখান থেকে তারা পৃথক হবে, আর তারা মসবেত হবে না। এর কারণ হলো এই যে, তারা নিজেদের আমলসমূহ জেনে নিবে এবং ভালমন্দের প্রতিফল পেয়ে যাবে। এজন্যেই শেষেও একথাই বলে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ঘোড়ার মালিকরা তিন প্রকারের। এক প্রকার হলো তারা যারা পুরস্কার ও

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং আবূ আবদির রহমান নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি হাসান–সহীহ গারীব বলেছেন।

পারিশ্রমিক লাভকারী। দ্বিতীয় প্রকার হলো তারা যাদের জন্যে ঘোড়া আবরণস্বরূপ। তৃতীয় প্রকার হলো তারা যাদের জন্যে ঘোড়া বোঝাস্বরূপ অর্থাৎ তারা পাপী।

পুরস্কার বা পারিশ্রমিক লাভকারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে। যদি ঘোড়ার দেহে ও পায়ে শিথিলতা দেখা দেয় এবং ঐ ঘোড়া এদিক ওদিকের চারণ ভূমিতে বিচরণ করে তাহলে এজন্যেও মালিক সওয়াব লাভ করবে। যদি ঘোড়ার রশি ছিঁড়ে যায় এবং ঐ ঘোড়াটি এদিক ওদিক চলে যায় তবে তার পদচিহ্ন এবং মল মূত্রের জন্যেও মালিক সওয়াব বা পুণ্য লাভ করবে। মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা না থাকলেও ঘোড়া যদি কোন জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করে তাহলেও মালিক সওয়াব পাবে। এই ঘোড়া তার মালিকের জন্যে পুরোপুরি পুণ্য ও পুরস্কারের মাধ্যম। দ্বিতীয় হলো ঐ ব্যক্তি যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে ঘোড়া পালন করেছে, যাতে প্রয়োজনের সময় অন্যের কাছে ঘোড়া চাইতে না হয়, কিন্তু সে আল্লাহর অধিকারের কথা নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের সওয়ারীর ক্ষেত্রে বিস্মৃত হয় না। এই সওয়ারী ঐ ব্যক্তির জন্যে পর্দা স্বরূপ। আর তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অহংকার এবং গর্বের কারণে এবং অন্যদের উপর জুলুম অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, এই পালন তার উপর একটা বোঝা স্বরূপ এবং তার জন্যে গুনাহ্ স্বরূপ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে তখন জিজ্ঞেস করা হলোঃ "গাধা সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থবহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে, বিন্দুমাত্র পুণ্য এবং বিন্দুমাত্র পাপও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে।"১

হযরত ফারযদাকের (রাঃ) চাচা হযরত সাআ'সাআ' ইবনে মুআ'বিয়া (রাঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাঁর সামনে فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ الخ এ আয়াত দু'টি পাঠ করেন। তখন হযরত সাআ'সাআ' (রাঃ) বঁলেনঃ "এ আয়াত দু'টিই আমার জন্যে যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী যদি নাও শুনি তবুও কোন অসুবিধা হবে না।"২

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অর্ধেক খেজুর সাদকা করার মাধ্যমে হলেও এবং ভাল কথার মাধ্যমে হলেও আগুন হতে আত্মরক্ষা করো।" একইভাবে সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "পুণ্যের কাজকে কখনো হালকা মনে করো না, নিজের বালতি দিয়ে পানি তুলে কোন পিপাসার্তকে পান করানো অথবা কোন মুসলমান ভাই এর সাথে অন্তরঙ্গ অনুভূতি সহকারে দেখা করাও পুণ্যের কাজ বলে মনে করবে।"

অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "হে নারীদের দল! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের পাঠানো উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তারা এটা পায়ের গোড়ালীও অর্থাৎ খুরও পাঠায়।" অন্য একটি হাদীসে রয়েছেঃ "ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দাও, আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও দাও।"

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! পাপকে কখনো তুচ্ছ মনে করো না। মনে রেখো, তারও হিসাব হবে।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে আহার করছিলেন এমন সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন খাবার হতে হাত তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপেরও বদলা আমাকে দেয়া হবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! পৃথিবীতে তুমি যে সব দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছো তাতে তোমার ছোট খাট পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে, পুণ্যসমূহ তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে রক্ষিত রয়েছে। এগুলোর প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে কিয়ামতের দিন তোমাকে প্রদান করা হবে।"[১]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, এ সূরাটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর উপস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়। তিনি শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এই সূরাটি আমাকে কাঁদিয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না এরূপ ধারণা করে তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন উম্মত সৃষ্টি করতেন যারা ভুল করতো ও গুনাহ করতো, অতঃপর পরম করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন।"[২]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ـ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ এ আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয় তখন তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কি আমার সব আমলই দেখবো?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "বড় বড় সব আমল?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেনঃ "হ্যাঁ" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "ছোট ছোট সব আমল?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ" তখন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেনঃ "হায়, আফসোস!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "হে আবূ সাঈদ (রাঃ)! খুশী হয়ে যাও, জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা পুণ্যের পরিমাণ দশগুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত দেন, এমনকি যাকে ইচ্ছা করেন তার চেয়েও বেশী প্রদান করেন কিন্তু গুনাহ সমপরিমাণই থাকবে অথবা আল্লাহ গুনাহগারকে ক্ষমা করে দিবেন। মনে রাখবে যে, কোন লোককে শুধু তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না।" একথা শুনে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আপনাকেও নয়?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেনঃ "হ্যাঁ, আমাকেও নয়। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা ঢেকে দিবেন।"[১]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন, যখন وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ـ (অর্থাৎ "আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে (৭৬ ঃ ৮)।" যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন মুসলমানরা মনে করেন যে, তাঁরা সামান্য জিনিস প্রদান করলে কোন বিনিময় প্রাপ্ত হবেন না। তাই, তাঁদের দরজায় ফকীর মিকসীন আসলে তাঁরা তাদেরকে এক আধটা খেজুর, রুটির টুকরা ইত্যাদি দেয়াকে বৃথা মনে করে শূন্য হস্তেই ফিরিয়ে দিতেন। তাঁরা চিন্তা করতেন যে, যদি দিতে পারেন তবে ভালো ও উৎকৃষ্ট কোন জিনিসই দিবেন। এ ধরনের চিন্তা একটি দল করতেন। অন্য কেটি দল মনে করতেন যে, ছোট খাট পাপের জন্য কৈফিয়ত তলব করা হবে না। যেমন কখনো মিথ্যা কথা বলা, এদিক ওদিক তাকানো, কারো গীবত করা ইত্যাদি। তখন অবতীর্ণ হলো فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ـ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ এই আয়াত দু'টি। অর্থাৎ "কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ

---

[১] আবূ যারআ'হ (রঃ) বলেন যে, এই হাদীসটি শুধুমাত্র ইবনে লাহীআহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও দেখবে।” তাদেরকে আরো বলা হলোঃ ছোট খাট পুণ্য বা নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না, ওটা বড়রূপে দেখা দিবে। আর ছোট খাট পাপকেও তুচ্ছ মনে করো না। কেন না, এই ছোট খাট পাপসমূহই একত্রিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করবে।”

এর অর্থ হলো ছোট পিপীলিকা। অর্থাৎ আমলনামায় ছোট বড় সব আমলই দেখা যাবে। গুনাহ তো একটির স্থলে একটিই লিখা হয়, কিন্তু পুণ্য বা নেককাজ একটির বদলে দশ, বরং যার জন্যে আল্লাহ চান এরচেয়ে অনেকগুণ বেশী লিখেন। আবার অনেক সময় নেকীর বদলে গুনাহ্ মার্জনাও করে দেন। এক একটি নেকীর বদলে দশ দশটি গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তারপর এমনও রয়েছে যে, যার পুণ্য বা নেকী গুনাহর চেয়ে একবিন্দু পরিমাণ বেশী হবে সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “পাপকে হালকা মনে করো না। সব পাপ একত্রিত হয়ে ধ্বংস করে দেয়।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসব পাপের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেনঃ “যেমন কিছু লোক কোন জায়গায় অবতরণ করলো। তারপর একটি লোক একটি দু’টি করে কাঠ কুড়িয়ে জমা করলো। এতে কাঠের একটা স্তূপ হয়ে গেল। তারপর ঐ কাঠে অগ্নি সংযোগ করা হলো এবং তারা যা ইচ্ছা করলো তা রান্না করলো।”

সূরা ঃ যিলযাল এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ 'আদিয়াত, মাক্কী

(আয়াত ঃ ১১. রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعُهَا : ١)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
১। শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,	١- وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ○
২। যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে,	٢- فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ○
৩। যারা অভিযান করে প্রভাতকালে,	٣- فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ○
৪। এবং ঐ সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে;	٤- فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ○
৫। অতঃপর শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে–	٥- فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ○
৬। মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ	٦- اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ○
৭। এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী;	٧- وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ○
৮। এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন।	٨- وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ○
৯। তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয় সে যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে	٩- اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ○
১০। এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?	١٠- وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ○

১১। সেই দিন তাদের কি ঘটবে, তাদের প্রতিপালক অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।

١١- إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ○ ع

ع ١١ ٢٥

মুজাহিদের ঘোড়া যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে এবং হ্রেষাধ্বনি দিতে দিতে দৌড়ায়, আল্লাহ তা'আলা ঐ ঘোড়ার শপথ করছেন। তারপর শপথ করছেন, ঐ ঘোড়াসমূহের যারা পদাঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে। তারপর প্রভাতকালে অভিযান শুরু করে। অনন্তর ধুলি উড়ায়, তারপর শত্রুদলে ঢুকে পড়ে।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি শত্রু বেষ্টিত কোন জনপদে গমন করলে সেখানে রাত্রে অবস্থান করে আযানের শব্দ কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করতেন। আযানের শব্দ কানে এলে তিনি থেমে যেতেন, আর তা কানে না এলে তিনি সঙ্গীয় সৈন্যদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

অতঃপর সেই ঘোড়াসমূহের ধুলি উড়ানো এবং শত্রু দলের মধ্যে প্রবেশকরণের শপথ করে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রকৃত প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, اَلْعَادِيَات এর অর্থ হলো উট। হযরত আলীও (রাঃ) এ কথাই বলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ শব্দের অর্থ হলো ঘোড়া। হযরত আলী (রাঃ) এটা শোনার পর বলেনঃ "বদরের দিন আমাদের সাথে ঘোড়া ছিল কোথায়? ঘোড়া তো ছিল সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে যা শত্রুদের খবরের জন্যে বা ছোট খাট ব্যাপারে পাঠানো হয়েছে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা হাতিমে বসেছিলেন এমন সময় একজন লোক এসে তাঁর কাছে এ আয়াতের তাফসীর জানতে চাইলো। তিনি লোকটিকে বললেনঃ "এর অর্থ হলোঃ মুজাহিদদের ঘোড়াসমূহ, যেগুলো যুদ্ধের সময় শত্রুদের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। তারপর রাত্রিকালে সেই ঘোড়ার আরোহী মুজাহিদ নিজের শিবিরে এসে খাবার রান্নার জন্যে আগুন জ্বালিয়ে বসে।" লোকটি এ জবাব শুনে হযরত আলীর (রাঃ) কাছে গেল। হযরত আলী (রাঃ) ঐ সময় জনগণকে যমযমের পানি পান করাচ্ছিলেন। লোকটি হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছেও একই প্রশ্ন করলো। হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ

"আমার পূর্বে তুমি এটা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করেছো কি?" জবাবে লোকটি বললেনঃ "হ্যাঁ, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন যে, এর অর্থ হলোঃ মুজাহিদদের ঘোড়া, যেগুলো যুদ্ধের সময় শত্রুদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়।" হযরত আলী (রাঃ) তখন লোকটিকে বললেনঃ "যাও, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এলে হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ তুমি না জেনে মানুষকে ফতোয়া দিচ্ছ? আল্লাহর কসম! ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদরের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে আমাদের সাথে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। একটি হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর এবং অন্যটি হযরত মিকদাদ (রাঃ)-এর। কাজেই عَادِيَات ضَبْحًا এ যুদ্ধ হতে পারে কি করে? এখানে আরাফাত থেকে মুয্দালাফার দিকে যাওয়া এবং মুযদালাফা থেকে মিনার দিকে যাওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন "এ কথা শুনে আমি আমার প্রথম কথা প্রত্যাহার করে নিয়েছি। হযরত আলী (রাঃ) যা বলেছেন সেটাই আমিও বলতে শুরু করেছি।" মুযদালাফায় পৌঁছে হাজীরাও নিজেদের হাঁড়িতে রুটি তৈরীর জন্যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। মোটকথা হযরত আলী (রাঃ)-এর বক্তব্য হলো ঃ عَادِيَات ضَبْحًا দ্বারা উটকে বুঝানো হয়েছে। ইব্রাহীম (রঃ), উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও একথাই বলেছেন। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত আতা (রঃ) এবং হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেছেন যে, এখানে ঘোড়াকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। উপরন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), এবং হযরত আতা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ضَبْح অর্থাৎ হাঁপানো, ঘোড়ার ও কুকুর ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাঁপানোর সময় তাদের মুখ থেকে যে উহ্ উহ্ শব্দ বের হয় ওটাকেই ضَبْح বলে।

পরবর্তী আয়াতের অর্থ হলো ঐ সব ঘোড়ার পা পাথরের সাথে ঘর্ষণ লেগে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হওয়া। অন্য একটি অর্থ হচ্ছেঃ ঐ ঘোড়ার আরোহীর যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা। আবার যুদ্ধের সময় ধোকা বা প্রতারণা অর্থেও এটা ব্যবহৃত হয়েছে। কারো কারো মতে এর অর্থ হলোঃ রাত্রিকালে নিজেদের অবস্থান স্থলে পৌঁছে আগুন জ্বালানো এবং মুযদালাফায় হাজীদের মাগরিবের পর পৌঁছে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ আমার মতে সবচেয়ে নির্ভুল এবং যথার্থ বক্তব্য হলোঃ ঘোড়ার পা এবং ক্ষুরের পাথরের সাথে ঘর্ষণ লেগে আগুন সৃষ্টি করা। তারপর সকাল বেলায় মুজাহিদদের শত্রুদের উপর আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া। যাঁরা এ শব্দের অর্থ উট বলেছেন তাঁরা বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ সকাল বেলায় মুযদালাফা হতে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। তারপর সবাই একটা কথার উপর একমত যে, যেই স্থানে তাঁরা অবতরণ করেছেন, যুদ্ধের জন্যেই হোক অথবা হজ্বের জন্যেই হোক, তাঁরা ধূলি উড়িয়ে পৌঁছেছেন। তারপর মুজাহিদীনের শত্রু শিবিরে পৌঁছে যাওয়া। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, সবাই একত্রিত হয়ে মধ্যবর্তী স্থানে হাযির হওয়া।

এ ব্যাপারে আবূ বকর বাযযার (রঃ) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় হাদীসটিকে গারীব বা দুর্বল বলা হয়েছে। ঐ হাদীসটিতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সৈন্যদল পাঠান। কিন্তু একমাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের কোন খবর আসেনি। এই সময়ে এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঐ মুজাহিদদের কথা বলা হয়েছে যাদের ঘোড়া হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে। তাদের পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে। সকাল বেলা তারা শত্রুদলের উপর পূর্ণ বিক্রমের সাথে আক্রমণ করেছে। তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ছিল। তারপর তারা জয়লাভ করতঃ সবাই একত্রিত হয়ে অবস্থান করেছে।

এসব শপথের পর এবার যে উদ্দেশ্যে শপথ করা হয়েছে আল্লাহ সে সব ব্যক্ত করছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং সে এটা নিজেও জানে। কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করলে সে দিব্যি মনে রাখে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বেহিসাব নিয়ামতের কথা সে বেমালুম ভুলে যায়। মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে যে, كَنُوْد তাকে বলা হয় যে একাকী খায়, ভৃত্যদেরকে প্রহার করে এবং কারো সাথে ভাল ব্যবহার করে না। তবে এ হাদীসের সনদ উসূলে হাদীসের পরিভাষায় দুর্বল।

এরপর আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ আল্লাহ্ অবশ্যই সেটা অবহিত আছেন। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, এটা সে নিজেও অবহিত আছে। তার অকৃতজ্ঞতা কথা ও কাজে প্রকাশ পায়। যেমন অন্যত্র রয়েছে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ -

অর্থাৎ “মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না।” (৯ ঃ ১৭)

অতঃপর আল্লাহপাক বলেনঃ অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে প্রবল। তার কি ঐ সময়টির কথা জানা নেই যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে? অর্থাৎ তার ধন সম্পদের মোহ খুব বেশী! সেই মোহে পড়ে সে আমার পথে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। পরকালের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ সমাধিস্থ মৃতদেরকে যখন জীবিত করা হবে তখনকার কথা কি তার জানা নেই? যা অন্তরসমূহে আছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালক তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সমস্ত আমলের পূর্ণ প্রতিদান তাদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রদান করবেন। এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম বা অবিচার করা হবে না। সকলেরই প্রাপ্যের ব্যাপারে তিনি সুবিচারের পরিচয় দিবেন।

সূরা ঃ 'আদিয়াত এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ কা'রি'আহ্, মাক্কী

(আয়াত ঃ ১১, রুকু' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١١، رُكُوْعُهَا : ١)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥
১। মহাপ্রলয়,	١- اَلْقَارِعَةُ ٥
২। মহাপ্রলয় কী?	٢- مَا الْقَارِعَةُ ٥
৩। মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?	٣- وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ٥
৪। সেইদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত,	٤- يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ٥
৫। এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রংগিন পশমের মত।	٥- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ٥
৬। তখন যার পাল্লা ভারী হবে,	٦- فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ٥
৭। সে তো প্রীতিপ্রদ জীবনে (সুখী হয়ে) থাকবে।	٧- فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٥
৮। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে	٨- وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ٥
৯। তার স্থান হবে হাবিয়াহ্।	٩- فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ٥
১০। ওটা কি তা তুমি জান?	١٠- وَمَا اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ٥
১১। ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।	١١- نَارٌ حَامِيَةٌ ٥ (١ ع ١١ ٢٦)

قَارِعَةَ শব্দটিও কিয়ামতের একটি নাম। যেমন غَاشِيَةَ - طَامَّةَ - حَاقَّةَ এবং صَاخَّةَ এগুলোও কিয়ামতের নাম। কিয়ামতের বিভীষিকা এবং ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যেই আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেছেন যে, সেটা কি? আল্লাহ তা'আলার জানিয়ে দেয়া ছাড়া সেটা জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেনঃ সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে এবং

এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ অর্থাৎ "তারা যেন ছড়িয়ে থাকা পঙ্গপাল।" (৫৪ ঃ ৭)

তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ পাহাড়সমূহ ধূণিত রঙিন পশমের ন্যায় হয়ে যাবে। অনন্তর যার ঈমান ও আমলের পাল্লা ভারী হবে সে তো বাসনারূপ সুখে অবস্থান করবে। আর যার ঈমান ও আমলের পাল্লা হালকা হবে সে জাহান্নামের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাকে উল্টোমুখে জাহান্নামে। নিক্ষেপ করা হবে।

اُمُّهٗ এর অর্থ হলো দেমাগ অর্থাৎ সে মুখ থুবড়ে হাবিয়াহ্ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ অর্থও হতে পারে যে, ফেরেশতা জাহান্নামে তার মাথায় আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আবার অর্থ এটাও হতে পারে যে, তার আসল ঠিকানা ঐ জায়গা যেখানে তার অবস্থানস্থল নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ জায়গা হলো জাহান্নাম।

হাবিয়াহ্ জাহান্নামের একটি নাম। এ জন্যেই এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)কে বলেনঃ সেটা কি তা তোমার জানা আছে? সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি।

হযরত আশ'আস ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) বলেন যে, মুমিনের মৃত্যুর পর তার রূহ ঈমানদারদের রূহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ফেরেশতা ঐ সব রূহকে বলেনঃ তোমাদের ভাই এর মনোরঞ্জন ও শান্তির ব্যবস্থা করো। পৃথিবীতে সে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে।" ঐ সৎরূহসমূহ তখন জিজ্ঞেস করেঃ "অমুকের খবর কি?" সে কেমন আছে?" নবাগত রূহ তখন উত্তর দেয়ঃ সে তো মারা গেছে। তোমাদের কাছে সে আসেনি? তখন রূহসমূহ বুঝে নেয় এবং বলেঃ রাখো তার কথা, সে তার মা হাবিয়ায় পৌঁছেছে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি। ঐ আগুন খুবই দাউদাউ করে জ্বলে ক্ষণিকের মধ্যে ভস্মীভূত করে দেয়।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের এ আগুনের তেজ জাহান্নামের আগুনের তেজের মাত্র সত্তর ভাগের এক ভাগ।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ"হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ধ্বংস করার জন্যে তো এ আগুনই যথেষ্ট?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তা ঠিক কিন্তু জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী তেজস্বী।" সহীহ বুখারীতে এ হাদীস রয়েছে এবং তাতে আরো রয়েছেঃ "ওর প্রত্যেক অংশ এই আগুনের

মত।" মুসনাদে আহমাদেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদের একটি হাদীসে এটাও রয়েছে যে, দুনিয়ার এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রের পানিতে দু'বার ধুয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। এরূপ না করা হলে দুনিয়ার আগুন দ্বারা উপকার গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। অন এক হাদীসে রয়েছে যে, দুনিয়ার এ আগুনের তেজ জাহান্নামের আগুনের তেজের একশ' ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ইমাম আবুল কাসিম তিবরানীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের এ আগুন এবং জাহান্নামের আগুনের মধ্যে কি পার্থক্য আছে তা কি তোমরা জান? তোমাদের এ আগুনের ধোঁয়ার চেয়েও সত্তর গুণ বেশী কালো জাহান্নামের আগুন!" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়। ফলে ঐ আগুন লাল হয়ে যায়। তারপর আরো এক হাজার বছর ধরে জ্বাল দেয়া হয়। এতে ঐ আগুন সাদা বর্ণ ধারন করে। তারপর আরো এক হাজার বছর পর্যন্ত জ্বাল দেয়ায় ঐ আগুন কালো হয়ে যায়। বর্তমানে ঐ আগুন অত্যন্ত কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন।"[১]

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাকে সবচেয়ে সহজ ও হালকা শাস্তি দেয়া হবে তাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করলোঃ "হে আমার প্রতিপালক। আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে।" আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে দুটি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালে। প্রচণ্ড শীত যে তোমরা অনুভব কর তা হলো জাহান্নামের শীতল নিঃশ্বাস, আর গ্রীষ্মের যে প্রচণ্ড গরম তোমরা অনুভব কর সেটা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া।" অন্য একটি হাদীসে রয়েছেঃ "প্রচণ্ড গরম পড়া শুরু হলে (গরমের প্রখরতা) কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ার পর নামায পড়ো। কেননা, গরমের প্রখরতা জাহান্নামের তেজস্বিতার কারণে হয়ে থাকে।"

সূরাঃ কা'রিআহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সূরাঃ তাকাসূর, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৮, রুকু’ ঃ ১)

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعُهَا : ١)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
১। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে।	١- اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ○
২। যতক্ষণ না তোমরা সমাধিসমূহে উপস্থিত হচ্ছ।	٢- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ○
৩। এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে;	٣- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○
৪। আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٤- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○
৫। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।	٥- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ○
৬। তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই।	٦- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ○
৭। আবার বলি, তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে,	٧- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ○
৮। এরপর অবশ্যই সেইদিন তোমরা সুখ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।	٨- ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ○ ع

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, দুনিয়া পাওয়ার প্রচেষ্টা তোমাদেরকে আখেরাতের প্রত্যাশা এবং সৎকাজ থেকে বেপরোয়া করে দিয়েছে। তোমরা এ দুনিয়ার ঝামেলাতেই লিপ্ত থাকবে, হঠাৎ মৃত্যু এসে তোমাদেরকে কবরে পৌঁছিয়ে দিবে।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দুনিয়ার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে তোমরা আল্লাহর

আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছো। এবং মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এ উদাসীনতা অক্ষুণ্ন থেকেছে!”

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, মানুষের ধন সম্পদ ও সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির লালসা তার মৃত্যুর চিন্তাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুর রিকাকে আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বলেনঃ আমরা এটাকে কুরআনের আয়াত মনে করতাম, لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ (অর্থাৎ বানী আদমের যদি এক উপত্যকা ভর্তি সোনা থাকে) এটাকে কুরআনের আয়াত মনে করতাম, এমতাবস্থায় اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শুখায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি যখন নবী করীম (সঃ)-এর দরবারে হাজির হই তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করছিলেন। তিনি বলছিলেনঃ “বানী আদম বলছেঃ আমার, মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মাল শুধু সেগুলো যেগুলো তুমি খেয়ে শেষ করেছো এবং পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছো। অথবা সাদকা করে অবশিষ্ট রেখেছো।”[১]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে অতিরিক্ত এ কথাও রয়েছেঃ “এ ছাড়া অন্য যা কিছু রয়েছে সেগুলো তুমি মানুষের জন্যে রেখে চলে যাবে।”

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিষ যায়, তার মধ্যে দুটি ফিরে আসে, শুধু একটি সাথে থেকে যায়। (ওগুলো হলো) আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং আমল। প্রথমোক্ত দুটি ফিরে আসে শুধু আমল সাথে থেকে যায়।”[২]

মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ “আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু দু'টি জিনিস তার সাথে অবশিষ্ট থেকে যায়, লোভ ও আকাঙ্ক্ষা।”[৩]

---

[১] এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ)।

[২] এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[৩] ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন।

হযরত যহ্হাক (রঃ) একটি লোকের হাতে একটি দিরহাম দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এ দিরহাম কার?" উত্তরে লোকটি বললোঃ "আমার।" তখন হযরত যহ্হাক (রঃ)তাকে বললেনঃ "এটা তোমার তখনই হবে যখন তুমি এটাকে সৎকাজে অথবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে (আল্লাহ্র পথে) খরচ করবে।" অতঃপর তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নের কবিতাংশটি পাঠ করেন।

اَنْتَ لِلْمَالِ اِذَا اَمْسَكْتَهُ * فَاِذَا اَنْفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ

অর্থাৎ "যখন তুমি মাল (আল্লাহ্র পথে খরচ না করে) রুকে রাখবে তখন তুমি হবে তার মালিকানাধীন। আর যখন তুমি তা খরচ করবে তখন ঐমাল তোমার মালিকানাধীন হয়ে যবে।"[১]

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই সূরাটি আনসারের দু'টি গোত্র বানূ হা'রিসাহ্ এবং বানূ হা'রিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা একে অপরের উপর গর্ব প্রকাশ করতে থাকে। তারা বলেঃ দেখো, আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি এ রকম বাহাদুর, এ রকম অর্থ-সম্পদের অধিকারী ইত্যাদি। জীবিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে এ রকম গর্ব প্রকাশ করার পর বলেঃ চলো, কবরস্থানে যাই। সেখানে তারা নিজ নিজ সর্দারের কবরের প্রতি ইশারা করে বলতে শুরু করেঃ বলতো, এর মত তোমাদের মধ্যে কেউ কি ছিল? মৃত ব্যক্তিদের নাম নিয়ে নিয়ে তারা নানা অপবাদ দিতে থাকে এবং তাদেরকে ভৎর্সনা করে। আল্লাহ তায়ালা তখন এ সূরার প্রথম দু'টি আয়াত অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, এমন কি তোমরা কবরে উপনীত হও। অর্থাৎ কবরে উপনীত হয়ে নিজেদের সর্দারদের ব্যাপারেও গর্ব করতে থাকো। অথচ তোমাদের উচিত ছিল সেখানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা। পূর্ব পুরুষদের মরে যাওয়া ও পচে গলে যাওয়ার কথা চিন্তা করে নিজেদের পরিণতি চিন্তা করা উচিত ছিল।

হযরত কাতাদা' (রঃ) বলেনঃ মানুষ নিজের প্রাচুর্যের ব্যাপারে অহংকার করছে আর একে একে কবরে গিয়ে প্রবেশ করছে। অর্থাৎ প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা তাকে উদাসীনতায় নিমজ্জিত রেখেছে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে এবং সমাধিস্থ হয়েছে।

---

১. এটা ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সহীহ্ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক বেদুইনের মৃত্যুকালে তার পরিচর্যার জন্যে হাজির হলেন এবং যথা অভ্যাস বললেনঃ “কোন ভয় নেই, ইনশাআল্লাহ্ তুমি গুনাহ থেকে পবিত্রতা লাভ করবে।” লোকটি তখন বললোঃ আপনি পবিত্রতা লাভ করার কথা বলছেন, কিন্তু এটা এমন জ্বর যার প্রকোপ বড়দেরকেও ঘায়েল করে ফেলে এবং কবরে পৌঁছিয়ে দেয়।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “আচ্ছা, তাহলে তোমার কথাই ঠিক।” এ হাদীসেও تَزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ শব্দ রয়েছে। আলোচ্য সূরাতেও زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ রয়েছে। এর অর্থ হলো মৃত্যুবরণ করে কবরে উপনীত হওয়া।

জামে’ তিরমিযীতে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “এ আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কবরের আযাব সম্পর্কে সন্ধিহানই ছিলাম।”[১]

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে মায়মূন ইবনে মিহ্রান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা হযরত উমর ইবনে আবদিল আযীয (রঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় তিনি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ـ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ـ এই আয়াত পাঠ করেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেনঃ “হে মায়মূন (রঃ)! কবরসমূহ দেখার উদ্দেশ্য হলো যিয়ারত করা, প্রত্যেক যিয়ারতকারী নিজের জায়গায় ফিরে যায়। অর্থাৎ হয়তো জাহান্নামের দিকে যায়, না হয় জান্নাতের দিকে যায়।”

একজন বেদুইন এক ব্যক্তির মুখে এ আয়াত দু’টি শুনে বলেছিলঃ “আসল বাসস্থান তো অন্যত্রই বটে।”

এরপর আল্লাহ্ তা’আলা হুমকির সুরে দু’দুবার বলেনঃ কখনো নয়, শ্রীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলিঃ কখনো নয়, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। এ অর্থও করা হয়েছে যে, প্রথমবার কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার মু’মিনদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

তারপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ কখনো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হতে তবে এরূপ দাম্ভিকতার মধ্যে পতিত থাকতে না। অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের শেষ মনযিল আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন থাকতে না। এরপর প্রথমোক্ত বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেনঃ তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। সেই জাহান্নামের ভয়াবহতা এক নযর দেখেই ভয়ে-ভীতিতে অন্যেরা তো বটেই, আম্বিয়ায়ে কিরামও হাঁটুর ভরে পড়ে যাবেন।

---

[১] এ হাদীসটি উসূলে হাদীসের পরিভাষায় গারীব বা দুর্বল।

ওর কাঠিন্য ও ভীতি প্রত্যেকের অন্তরে ছেয়ে যাবে। এ সম্পর্কে বহু হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ এরপর অবশ্যই সেইদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা, রিয্ক ইত্যাদি সকল নিয়ামত সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হবে। এসব নিয়ামতের কতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে তা জিজ্ঞেস করা হবে।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা ঠিক দুপুরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঘর হতে বের হন। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখেন যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ)ও মসজিদের দিকে আসছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ " এ সময়ে বের হলে কেন?" উত্তরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ "যে কারণ আপনাকে ঘর হতে বের করেছে ঐ একই কারণ আমাকেও ঘর হতে বের করেছে।" ঐ সময়ে হযরত উমর (রাঃ)ও এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "এই সময়ে বের হলে কেন?" তিনি জবাবে বললেনঃ "যে কারণ আপনাদের দু'জনকে বের করেছে ঐ কারণই আমাকেও বের করেছে।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদের সাথে আলাপ শুরু করলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেনঃ "সম্ভব হলে চলো, আমরা ঐ বাগান পর্যন্ত যাই। ওখানে আহারেরও ব্যবস্থা হবে এবং ছায়াদানকারী জায়গাও পাওয়া যাবে।" তাঁরা বললেন, "ঠিক আছে, চলুন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে আবুল হায়সাম (রাঃ) নামক সাহাবীর বাগানের দরজায় উপনীত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দরজায় গিয়ে সালাম জানালেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। উম্মে হায়সাম দরজার ওপাশেই দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু উচ্চস্বরে জবাব দিচ্ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)-এর নিকট থেকে শান্তির দু'আ বেশী পরিমানে পাওয়ার লোভেই এ নীরবতা পালন করছিলেন। তিনবার সালাম জানিয়েও কোন জবাব না পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সঙ্গীদ্বয়সহ ফিরে আসতে উদ্যত হলেন। এবার উম্মে হায়সাম (রাঃ) ছুটে গিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আপনার আওয়ায আমি শুনছিলাম, কিন্তু আপনার সালাম বেশী বেশী পাওয়ার লোভেই উচ্চস্বরে জবাব দেইনি। এখন আপনি চলুন।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উম্মে হায়সাম (রাঃ)-এর এ ব্যবহারে বিরক্ত হলেন না। জিজ্ঞেস করলেনঃ "আবূ হায়সাম (রাঃ) কোথায়?" উম্মে হায়সাম (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "তিনি নিকটেই আছেন, পানি আনতে

গেছেন। এক্ষুণি তিনি এসে পড়বেন, আপনি এসে বসুন!” রাসূলুল্লাহ্ (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয় বাগানে প্রবেশ করলেন। উম্মে হায়সাম (রাঃ) ছায়া দানকারী একটি গাছের তলায় কিছু বিছিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে সেখানে উপবেশন করলেন। ইতিমধ্যে আবূ হায়সামও (রাঃ) এসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে তাঁর আনন্দের কোন সীমা থাকলো না। এতে তিনি মানসিক শান্তি লাভ করলেন। তাড়াতাড়ি একটা খেজুর গাছে উঠলেন এবং ভাল ভাল খেজুর পাড়তে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিষেধ করার পর থামলেন এবং নেমে এলেন। এসে বললেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কাঁচা, পাকা, শুকনো, সিক্ত ইত্যাদি সব রকম খেজুরই রয়েছে। যেটা ইচ্ছা ভক্ষণ করুন।” তাঁরা ওগুলো ভক্ষণ করলেন। তারপর মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানি দেয়া হলো। তাঁরা সবাই পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ “এই নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে জিজ্ঞেস করা হবে।”[১]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেনঃ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ) এসেছিলেন এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেনঃ “এখানে বসে আছ কেন?” উত্তরে তাঁরা বললেনঃ “যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাদেরকে ঘর হতে বের করে এনেছে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাকেও বের করে এনেছে।” তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঐ দুই সাহাবী (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে এক আনসারীর বাড়িতে গেলেন। আনসারী বাড়িতে ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আনসারীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার স্বামী কোথায়?” মহিলা উত্তরে বললেনঃ “তিনি আমাদের জন্যে মিষ্টি পানি আনতে গেছেন।” ইতিমধ্যে ঐ আনসারী পানির মশক নিয়ে এসেই পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে আনসারী আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। তিনি বললেনঃ “আমার বাড়িতে আজ আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) তাশরীফ এনেছেন, সুতরাং আমার মত ভাগ্যবান আর কেউ নেই।” পানির মশক ঝুলিয়ে রেখে আনসারী বাগানে গিয়ে তাযা তাযা খেজুরের কাঁদি নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ “বেছে বেছে আনলেই তো হতো?” আনসারী বললেনঃ “ভাবলাম যে, আপনি পছন্দ মত বাছাই করে গ্রহণ করবেন।” তারপর (একটা

---

[১] এ ধারায় এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল।

বকরী বা মেষ যবাহ্ করার জন্যে) আনসারী একটি ছুরি হাতে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ বললেনঃ "দেখো, দুগ্ধবতী (কোন বকরী বা মেষ) যবাহ্ করো না।" অতঃপর আনসারী তাঁদের জন্যে (কিছু একটা) যবাহ্ করলেন এবং তাঁরা সেখানে আহার করলেন। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "দেখো, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলে, অথচ এখন পেট পূর্ণ করে ফিরে যাচ্ছ। এই নিয়ামত সম্পর্কে তোমরা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আযাদকৃত দাস হযরত আবূ উসায়েব (রাঃ) বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমন করে আমাকে ডাক দেন। তারপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)-এর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন এবং তাদেরকেও ডেকে নেন। তারপর এক আনসারীর বাগানে গিয়ে বললেনঃ "দাও ভাই, খেতে দাও।" আনসারী তখন এক গুচ্ছ আঙ্গুর এনে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং সঙ্গীরা তা ভক্ষণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আনসারীকে বললেনঃ "ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এসো।" আনসারী পানি এনে দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা তা পান করলেন। তারপর নবীকরীম (সঃ) বললেনঃ "কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"এ কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) খেজুর গুচ্ছ উঠিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বললেনঃ "এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হতে হবে?" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ। তবে তিনটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তা হলো সম্ভ্রম রক্ষার উপযোগী পোশাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযোগী খাদ্য এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী গৃহ।"[১]

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ) খেজুর ভক্ষণ করেন ও পানি পান করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এই নিয়ামত সম্বন্ধে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।"[২]

হযরত মাহমুদ ইবনে রাবী হতে বর্ণিত আছে যে, যখন اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ এ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে এটা পাঠ করে শুনান। যখন তিনি لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন নিয়ামত সম্বন্ধে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

হবে? খেজুর খাচ্ছি, পানি পান করছি, ঘাড়ের উপর তরবারী ঝুলছে, শত্রু শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং আমরা কোন নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবো?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “ভয় করো না, শীঘ্রই নিয়ামত এসে পৌঁছবে।”[১]

মুআয ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে হাবীব (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (তাঁর চাচা) বলেনঃ

“আমরা এক মজলিসে বসেছিলাম এমন সময় নবী করীম (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করলেন, তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল (তিনি গোসল করে এসেছেন বলে মনে হচ্ছিল)। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে তো বেশ আনন্দিত চিত্ত মনে হচ্ছে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ, তাই।” তারপর “গিনা বা ধন ঐশ্বর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যার অন্তরে আল্লাহ্ ভীতি রয়েছে তার জন্যে “গিনা বা ধন সম্পদ খারাপ জিনিষ নয়। মনে রেখো, পরহেযগার ব্যক্তির জন্যে সুস্থতা গিনার চেয়েও উত্তম। আনন্দ চিত্ততাও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত।”[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ “নিয়ামতের প্রশ্নে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে বলা হবেঃ “আমি কি তোমাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করিনি? ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমাকে কি পরিতৃপ্ত করিনি?”

হযরত ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন সাহাবীগণ বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি এমন নিয়ামত ভোগ করছি যে, সে সম্বন্ধে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে? আমরা তো যবের রুটি ভক্ষণ করছি, (তাও পেট পুরে নয়, বরং) অর্ধভুক্ত থেকে যাচ্ছি?” তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সঃ) এর কাছে অহী পাঠালেনঃ তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা কি (পায়ের আরামের জন্যে) জুতা পরিধান কর না এবং (তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে) ঠাণ্ডা পানি পান কর না? এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।[৩] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

---

১. ইমাম আহমাদ (রঃ) এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজাহতেও এ হাদীসটি রয়েছে।

৩. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) করেছেন।

পেট পুরে আহার করা, ঠাণ্ডা পানি পান করা ছায়াদানকারী ঘরে বাস করা, আরামদায়ক ঘুম যাওয়া, আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা, এমনকি মধু পান করা, সকাল বিকাল আহার করা, ঘি, মধু, ময়দার রুটি ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ শারীরিক সুস্থতা, কান চোখের সুস্থতা ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেঃ তোমরা এ সবকে কি কাজে ব্যবহার করেছো? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً ۔

অর্থাৎ "কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় ওগুলোর প্রত্যেকটির সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (১৭ ঃ ৩৬)

সহীহ বুখারী, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ এবং সুনানে ইবনে মাজাহতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

"দু'টি নিয়ামত সম্পর্কে মানুষ খুবই উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে। ও দু'টি নিয়ামত হলো স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতা।" অর্থাৎ মানুষ এ দুটোর পূর্ণ কৃতজ্ঞতা ও প্রকাশ করে না এবং এদুটোর শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অবগত নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এ দুটি ব্যয় করে না। উল্লেখ্য যে, সম্ভ্রম রক্ষার উপযোগী পোশাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযোগী আহার এবং শীত গ্রীষ্ম হতে রক্ষা পাওয়ার গৃহ ছাড়া অন্য সবকিছু সম্পর্কেই কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেনঃ "হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়ায় ও উষ্ট্রে আরোহণ করিয়েছি, নারীদের সাথে বিয়ে দিয়েছি। তোমাকে হাসি খুশীভাবে আনন্দ উজ্জ্বল জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছি। এবার বল তো, এগুলোর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোথায়?"

সূরা ঃ তাকাসুর এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ আস্‌র, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৩, রুকু' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعُهَا : ١)

বর্ণিত আছে যে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পূর্বে একবার মুসাইলামা কাযযাবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় মুসাইলামা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছিল। হযরত আমর (রাঃ)-কে সে জিজ্ঞাসা করলোঃ "এখন কি তোমাদের রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়েছে?" হযরত আমর (রাঃ) জবাবে বলেনঃ "একটি সংক্ষিপ্ত, অলংকার পূর্ণ সূরা নাযিল হয়েছে।" মুসাইলামা জিজ্ঞেস করলোঃ "সেটি কি?" হযরত আমর (রাঃ) তখন وَالْعَصْرِ সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। মুসাইলামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললোঃ "জেনে রেখো, আমার উপরও এরকম সূরা নাযিল হয়েছে।" হযরত আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "সেটি কি?" সে তখন বললোঃ

يَاوَبَرُ يَا وَبَرُ وَاِنَّمَا اَنْتَ اُذْنَانِ وَصَدْرٌ وَسَائِرُكَ حَفْرُنَقِرٌ

তারপর জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আমর (রাঃ)! বল, তোমার অভিমত কি?" তখন হযরত আমর (রাঃ) বললেনঃ "তুমি তো নিজেই জান যে, তোমার মিথ্যা ও ভণ্ডামী সম্পর্কে আমি অবহিত রয়েছি।" وَبَرَ হলো বিড়ালের মত আকৃতি বিশিষ্ট একটা পশু। তার কান দুটি ও বুক কিছুটা প্রশস্ত ও বড়। দেহের অন্যান্য অংশ খুবই নিকৃষ্ট ও বাজে। ভণ্ড, দুর্বৃত্ত ও মিথ্যাবাদী মুসাইলামা এ রকম বাজে কথাকে আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামের সাথে তুলনা করতে চেয়েছিল। তার এ ধরনের ঘৃণ্য ভণ্ডামী দেখে আরবের মূর্তি পূজকরাও তাকে মিথ্যাবাদী এবং ফালতু বলে সহজেই বুঝে নিয়েছিল।

দু'জন সাহাবীর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎ হতো তখন একজন এ সূরাটি পড়তেন এবং অপরজন শুনতেন। তারপর পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেন।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন যে, মানুষ যদি এই একটি মাত্র সুরা চিন্তা ভাবনা ও মনোযোগের সাথে পাঠ করে এবং অনুধাবন করে তবে এই একটি সূরাই যথেষ্ট।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

১। মহাকালের শপথ,

২। মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে;

৩। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যধারনে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- وَالْعَصْرِ ۙ ○

٢- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ ○

٣- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ع ○

ع ١ ٣ ٢٨

'আসর এর অর্থ হলো কাল বা সময়, যেই কাল বা সময়ে মানুষ পাপ পূণ্যের কাজ করে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, 'আসর এর অর্থ হলো আসরের নামায বা আসরের নামাযের সময়। কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তিটিই মাশহূর বা প্রসিদ্ধ। এই কসমের পর আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় অর্থাৎ নিজে সৎকাজ করে ও অন্যকে সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, আর বিপদে-আপদে নিজে ধৈর্য ধারণ করে ও অন্যকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়, জনগণ কষ্ট দিলে ক্ষমার মাধ্যমে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে যে বাধাবিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হয় তাতেও ধৈর্য ধারণ করে, তারা এই সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

সূরা ঃ আসর এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ হুমাযাহ্, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৯, রুকূ ঃ ১)

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٩، رُكُوْعُهَا : ١)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
১। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দে করে;	١- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ○
২। যে অর্থ জমায় ও তা গণে গণে রাখে;	٢- الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ○
৩। সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে;	٣- يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ○
৪। কখন ও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়;	٤- كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ○
৫। হুতামা কী, তা তুমি কি জান?	٥- وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ○
৬। এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন,	٦- نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ○
৭। যা হৃদয়কে গ্রাস করবে;	٧- الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ○
৮। নিশ্চয়ই এ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে	٨- اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ○
৯। দীর্ঘায়িত স্তম্ভ সমূহে।	٩- فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ع○ (١ ع ٩ ٢٧)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ চরম দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে অগোচরে অন্যের নিন্দে করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়। এর বর্ণনা هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ - بِنَمِيْمٍ (পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়) (৬৮ ঃ ১১) এ আয়াতের তাফসীরে গত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো খোঁটাদানকারী এবং গীবতকারী। রবী ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, সামনে মন্দ বলাকে هُمَزَ বলা হয় এবং অসাক্ষাতে নিন্দে করাকে لُمَزَ বলে। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলো মুখের ভাষায় এবং চোখের ইশারায় আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট

দেয়া। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, هُمَزٌ এর অর্থ হলো হাত এবং চোখ দ্বারা কষ্ট দেয়া এবং لُمَزٌ এর অর্থ মুখ বা জিহ্বা দ্বারা কষ্ট দেয়া। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা আখফাস ইবনে শুরায়েককে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়নি।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে। যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى

অর্থাৎ "যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল।" হযরত কাব (রঃ) বলেনঃ সারাদিন সে অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখলো এবং রাত্রে পচা গলা লাশের মত পড়ে রইলো।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ সে মনে করে যে, তার ধন সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে। কখনো না। অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। হে নবী (সঃ)! তুমি কি জান হুতামাহ কি? তা তুমি জান না। তা হলো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন। যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। জ্বালিয়ে তাদেরকে ভষ্ম করে দিবে, কিন্তু তারা মৃত্যুবরণ করবে না। হযরত সাবিত বানানী (রঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করে যখন এর অর্থ বর্ণনা করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেনঃ "আল্লাহর আযাব তাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে।" মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রঃ) বলেনঃ প্রজ্জ্বলিত আগুন কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার পৌঁছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ আগুন তাদের উপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে। সূরা 'বালাদ' এর তাফসীরেও এ ধরণের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মারফূ' হাদীসেও এ রকম বর্ণনা রয়েছে। আগুনের স্তম্ভের মধ্যে লম্বা লম্বা দরজা রয়েছে।

হযরত ইবনে মাসঊদের (রাঃ) কিরআত بِعَمَدٍ রয়েছে। ঐ সব জাহান্নামীদের স্কন্ধে শিকল বাঁধা থাকবে। লম্বা লম্বা স্তম্ভের মধ্যে আবদ্ধ করে তাদের উপর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। সেই আগুনের স্তম্ভের মধ্যে তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দেয়া হবে। আবূ সালিহ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাদের জন্যে ভারী বেড়ী এবং শিকল থাকবে। তাতে তাদেরকে বন্দী করে দেয়া হবে।

সূরাঃ হুমাযাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ ফীল, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৫, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعُهَا : ١)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তুমি কি দেখনি যে, তোমার প্রতিপালক হস্তী অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন?

١- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

২। তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?

٢- اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝

৩। তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করেছিলেন।

٣- وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

৪। যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল।

٤- تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

৫। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।

٥- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝ ع

আল্লাহ তা'আলা যে কুরায়েশের উপর বিশেষ নিয়ামত দান করেছিলেন, এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যে বাহিনী হস্তী সঙ্গে নিয়ে কাবা গৃহ ধ্বংস করার জন্যে অভিযান চালিয়েছিল। তারা কাবা গৃহের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ তারা ছিল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বীনকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিল। তারা প্রায় সবাই মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের অশুভ উদ্দেশ্য এবং তৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া ছিল মূলতঃ মহানবীর (সঃ) পূর্বাভাষ এবং তাঁর আগমনী সংবাদ। সেই বছরই তাঁর জন্ম হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ হে কুরায়েশের দল! আবিসিনিয়ার (হাবশের) ঐ বাহিনীর উপর আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি, তাতে তোমাদের কল্যাণ সাধন আমার উদ্দেশ্য ছিল না, আমি নিজের গৃহ রক্ষার জন্যেই ঐ বিজয় দান করেছি। আমার প্রেরিত

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নবুওয়াতের মাধ্যমে সেই গৃহকে আমি আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করবো। মোটকথা, আসহাবে ফীল বা হস্তী অধিপতিদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এটাই যা বর্ণনা করা হলো। বিস্তারিত বর্ণনা اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدُ। এর বর্ণনায় গত হয়েছে যে, হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ যূনুয়াম, যে ছিল মুশরিক, তার সময়ের মুসলমানদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। ঐ সব মুসলমান ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যিকার অনুসারী। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। দাউস যু সালাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি হাবশের (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে লিখলেনঃ “দাউস যু সা’লাবানের সঙ্গে পুরো বাহিনী পাঠিয়ে দিন।” সেখান থেকে শত্রুদেশ নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ নাজাশী আমীর ইবনে ইরবাত ও আবরাহা ইবনে সাহাব আবূ ইয়াকসুমকে সৈন্য পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী যুনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ইয়ামনে পৌঁছলো এবং ইয়ামন ও তথাকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলো। যূনুয়াস পালিয়ে গেল এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করলো। যুনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামন হাবশের বাদশাহর কর্তৃত্বে চলে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামনে বসবাস করতে লাগলো। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে উভয় সর্দার পরস্পরকে বললোঃ অযথা রক্তপাত করে কি লাভ, চলো আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়ামন এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে।” এই কথা অনুযায়ী উভয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। আমীর ইবনে ইরবাত আবরাহার উপর আক্রমণ করলো এবং তরবারীর এক আঘাতে তার চেহারা রক্তাক্ত করে ফেললো। নাক, ঠোঁট এবং চেহারার বেশ কিছু অংশ কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার ক্রীতদাস আতূদাহ্ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে ফেললো। মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভাল হলো এবং সে ইয়ামনের শাসনকর্তা হয়ে বসলো। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং একপত্রে জানালেনঃ “আল্লাহর

কসম! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করবো এবং তোমার টিকি কেটে আনবো।” আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখলো এবং দূতকে নানা প্রকারের উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়ামনের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রাখলো ও ওর মুখ বন্ধ করে দিলো। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখলোঃ “ইয়ামনে মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের কসম পূর্ণ করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন!” এতে নাজাশী খুশী হলেন এবং ইয়ামনের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখলোঃ “আমি ইয়ামনে আপনার জন্যে এমন একটি গীর্জা তৈরি করছি যে, এরকম গীর্জা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কখনো তৈরি হয়নি।” অতি যত্ন সহকারে খুবই মযবুত ও অতি উঁচু করে ঐ গীর্জাটি নির্মিত হলো। ঐ গীর্জার চূড়া এতো উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেতো। আরববাসীরা ঐ গীর্জার নাম দিয়েছিল ‘কালীস’ অর্থাৎ টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা। এবার আবরাহা মনে করলো যে, জনসাধারণ কা’বায় হজ্ব না করে বরং এ গীর্জায় এসে হজ্ব করবে। সারাদেশে সে এটা ঘোষণা করে দিলো। আদনানিয়্যাহ ও কাহ্তা নিয়্যাহ গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট, আর কুরায়েশরা ভীষণ রাগান্বিত হলো। অল্প কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে ঐ গীর্জায় প্রবেশ করে পায়খানা করে এসেছে। প্রহরীরা পরের দিন এ অবস্থা দেখে বাদশাহর কাছে খবর পাঠালো এবং অভিমত ব্যক্ত করলো যে, কুরায়েশরাই এ কাজ করেছে। তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেই এ কাণ্ড তারা করেছে। আবরাহা তৎক্ষণাৎ কসম করে বললোঃ “আমি মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবো এবং বায়তুল্লাহর প্রতিটি ইট পর্যন্ত খুলে ফেলবো।”

অন্য এক বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরায়েশ যুবক ঐ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালভাবে ঐ গীর্জাকে গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধ্বসে পড়েছিল। অতঃপর ক্রুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলো। তাদের সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতী ছিল। ঐরূপ হাতী ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হাতীটির নাম ছিল মাহমুদ। বাদশাহ নাজাশী মক্কা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে ঐ হাতিটি আবরাহাকে দিয়েছিল। ঐ হাতীর সাথে আবরাহা আরো আটটি অথবা বারোটি হাতী নিলো। তার উদ্দেশ্য ছিল যে,

সে বায়তুল্লাহর দেয়ালে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতীর গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতীগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধ্বসিয়ে দিবে। মক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লো। যে কোন অবস্থায় এর মুকাবিলা করার তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। যুনফর নামক ইয়ামনের একজন রাজ বংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে পাশের বহু সংখ্যক আরবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। যুনফর পরাজিত হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন। যুনফরকেও সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মক্কার পথে অগ্রসর হলো। খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌঁছার পর নুফায়েল ইবনে হাবীব খাশআমী একদল সৈন্য নিয়ে আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরাই আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ করলেন। নুফায়েলকেও যুনফরের মত বন্দী করা হলো। আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার ইচ্ছা করলো, কিন্তু পরে মক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চললো। তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছলে সাকীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করলো যে, লাত মূর্তিটি যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা ঐ প্রকোষ্ঠের কোন ক্ষতি সাধন করবে না। সাকীফ গোত্র আবূ রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে আবরাহার সঙ্গে দিলো। মক্কার কাছে মুগমাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করলো। আবরাহার সৈন্যেরা আশেপাশের জনপদ এবং চারণভূমি থেকে বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিলো। এগুলোর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল। এতে আরবের কবিরা আবরাহার নিন্দে করে কবিতা রচনা করলো সীরাতে ইবনে ইসহাকে ঐ কবিতার উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হুমাইরীকে বললোঃ তুমি মক্কার সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। এবং ঘোষণা করে দাওঃ আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, মক্কাবাসীরা যদি কা'বাগৃহ রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারলো যে, আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেমই মক্কার বড় নেতা। হানাতাহ আবদুল মুত্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আবদুল মুত্তালিব বললেনঃ "আল্লাহর কসম! আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত

শক্তিও নেই।” আল্লাহর সম্মানিত ঘর। তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবন্ত স্মৃতি। সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাজত নিজেই করবেন। অন্যথায় তাঁর ঘরকে রক্ষা করার সাহসও আমাদের নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও আমাদের নেই।” হানাতাহ তখন তাঁকে বললোঃ “ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন।” আবদুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শণ বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হতো। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তাঁর সাথে মেঝেতে উপবেশন করলোঃ সে তার দোভাষীকে বললোঃ তাকে জিজ্ঞেস করঃ তিনি কি চান? আবদুল মুত্তালিব জানালেনঃ “বাদশাহ আমার দু'শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি।” বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বললোঃ প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু'শ উটের জন্যে আপনার এতো চিন্তা অথচ স্বজাতির ধর্মের জন্যে কোন চিন্তা নেই! আমি আপনাদের ইবাদতখানা কা'বা ধ্বংস করে ধূলিসাৎ করতে এসেছি।” একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব জবাবে বললেনঃ “শুন, উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি। আর কা'বাগৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন।” তখন ঐ নরাধম বললোঃ “আজ স্বয়ং আল্লাহও কা'বাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না।” একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেনঃ “তা আল্লাহ জানেন এবং আপনি জানেন।” এও বর্ণিত আছে যে, মক্কার জনগণ তাদের ধন সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাজী হয়নি। মোটকথা, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে ফিরে আসলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে বললেনঃ “তোমরা মক্কাকে সম্পূর্ণ খালি করে দাও। সবাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও।” তারপর আবদুল মুত্তালিব কুরায়েশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহে গিয়ে কা'বার খুঁটি ধরে দেয়াল ছুঁয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে ঐ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্যে প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা'বাকে পবিত্র রাখার জন্যে আবদুল মুত্তালিব কবিতার ভাষায় নিম্নলিখিত দুআ করেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنَّ الْـمَرْءَيَمْ * نَعُ رِحْلَهٗ فَامْنَعْ رِحَالَكَ
لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ * وَمَحَالُهُمْ اَبَدًا مَحَالَكَ

অর্থাৎ "আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযত করেন। হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয়।" অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কা'বা গৃহের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর একশত পশুকে নিশান লাগিয়ে কা'বার আশে পাশে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয়া পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে আল্লাহর গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে আসবে।

পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ আয়োজন করলো। বিশেষ হাতী মাহমুদকে সজ্জিত করা হলো। পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইবনে হাবীব তখন মাহমুদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেনঃ "মাহমুদ! তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে এসেছো সেখানে ভালভাবে ফিরে যাও। তুমি আল্লাহর পবিত্র শহরে রয়েছো।" একথা বলে নুফায়েল হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং ছুটে গিয়ে নিকট এক পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। মাহমুদ নামক হাতীটি নুফায়েলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়লো। বহুচেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হলো না। পরীক্ষামূলক ভাবে ইয়ামনের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলো। পূর্বদিকে চালাবার চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, কিন্তু মক্কা শরীফের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালাবার চেষ্টা করতেই বসে পড়লো। সৈন্যরা তখন হাতীটিকে প্রহার করতে শুরু করলো। এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি কালো মেঘের মত হয়ে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে। চোখের পলকে ওগুলো আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়লো। এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দুপায়ে দুটি কংকর ছিল। কংকরের ঐটুকরাগুলো ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাই এর সমান। পাখিগুলো কংকরের ঐ টুকরোগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ

করছিল। সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল আর নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল কারণ তারা তাঁকেই পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে এনেছিল। নুফায়েল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরায়েশদের সাথে আবরাহা ও তার সৈন্যদের দুরাবস্থার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। ঐ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেনঃ

اَيْنَ الْمَفَرُّ وَ الْاِلٰهُ الطَّالِبُ * وَالْاَشْرَمُ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

অর্থাৎ “এখন আর আশ্রয়স্থল কোথায়? স্বয়ং আল্লাহ্ই তো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শোনো, দুর্বৃত্ত আশরম পরাজিত হয়েছে, জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।”

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুফায়েল আরো বলেনঃ

الاحيـيت عنايا ودينا * نعـمناكم منع الاصـباح عـينا
ودينة لورأيت ولانريه * لدى جنب الـمـحـصب مـارأينا
ان العذرتى وحمدت امرى * ولم تأسى على مافات بينا
حمدت الله اذا ابصرت طيرا * وخفت حجارة تلقى علينا
فكل القوم تسئل على نفيل * كأن على الحبشان دينا

অর্থাৎ “হাতী ওয়ালাদের দুরাবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাসসাব প্রান্তরে তাদের উপর আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে। তুমি সে অবস্থা দেখলে আল্লাহর দরবারে সিজদায় পতিত হতে। আমরা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করছিলাম। আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল এই ভয়ে যে, না জানি হয় তো আমাদের উপরও এই কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও দফারফা করে দেয়। পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল, যেন নুফায়েলের উপর হাবশীদের ঋণ রয়েছে।”

ওয়াকেদী (রঃ) বলেন যে, পাখিগুলো ছিল সবুজ রঙএর। ওগুলো কবুতরের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। ওদের পায়ের রঙছিল লাল। অন্য এক রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, মাহমুদ নামক হাতীটি যখন বসে পড়লো এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে উঠানো সম্ভব হলো না। তখন সৈন্যরা অন্য একটি হাতীকে সামনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে পা বাড়াতেই তার মাথায় কংকরের টুকরো

পড়লো এবং আর্তনাদ করে পিছনে সরে এলো। অন্যান্য হাতীও তখন এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করলো। কয়েকটির উপর কংকর পড়ায় তৎক্ষণাৎ ওগুলো মারা গেল। যারা ছুটে পালাচ্ছিল তাদেরও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল। এবং অবশেষে সবগুলোই মারা গেল। আবরাহা বাদশাহও ছুটে পালালো, কিন্তু তারও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল। সানআ (তৎকালীন ইয়ামনের রাজধানী) নামক শহরে পৌঁছার পর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো এবং কুকুরের মত ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করলো। তার কলেজা ফেটে গিয়েছিল। কুরায়েশরা প্রচুর ধন সম্পদ পেয়ে গিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিব তো সোনা সংগ্রহ করে করে একটি কূপ ভর্তি করেছিলেন। ঐ বছরই সারা দেশে প্রথম ওলা ওঠা এবং প্লেগ রোগ দেখা দেয়। হরযল, হানযাল প্রভৃতি কটুগাছও ঐ বছর উৎপন্ন হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সঃ)-এর ভাষায় এ নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং যেন বলছেনঃ যদি তোমরা আমার ঘরের সম্মান এভাবে করতে থাকতে এবং আমার রাসূল (সঃ)-এর কথা মানতে তবে আমিও সেভাবে তোমাদের হিফাযত করতাম এবং শত্রু দল থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিতাম।

أَبَابِيْل শব্দটি বহুবচন, এর একবচন আরবী অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর سِجِّيْل শব্দের অর্থ হলো খুবই কঠিন বা শক্ত। কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, أَبَابِيْل এবং سِجِّيْل শব্দ দুটি ফারসী শব্দ। سِجِّيْل এর অর্থ হলো প্রস্তর সমন্বিত মৃত্তিকা। عَصْف শব্দটি عَصْفَة শব্দের বহুবচন। عَصْف মাঠের ফসলের ঐ সব পাতাকে বলা হয় যেগুলো এখনো পাকেনি। طَيْرًا أَبَابِيْل এর অর্থ হলো ঝাঁক ঝাঁক পাখী, বহুসংখ্যক এবং ক্রমাগত আগমনকারী। কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন যে, أَبَابِيْل শব্দটি أَبِيْل শব্দের বহুবচন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ পাখিগুলোর চঞ্চু ছিল পাখির মত এবং নখ ছিল কুকুরের মত।

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, সবুজ রঙ-এর এই পাখিগুলো সমুদ্র হতে বের হয়ে এসেছিল। ওগুলোর মাথা ছিল জন্তুর মত। এ সম্পর্কে আরো বহু উক্তি রয়েছে। পাখির ঝাঁক আবরাহার সৈন্যদের মাথার উপর অবস্থান করে চীৎকার করছিল এবং কংকর নিক্ষেপ করছিল। যার মাথায় ঐ কংকর পড়ছিল তা তার পায়খানার দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তি দ্বিখণ্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রবল বাতাস বইতে লাগলো। এর ফলে আশে পাশের

বালুকণা এসে তাদের চোখে পড়লো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে ঘায়েল করে ফেললো।

عَصْفٍ এর অর্থ হলো ভূষি এবং مَّأْكُوْلٍ অর্থহলো ভক্ষিত বা টুকরো টুকরো কৃত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শস্যদানার উপরের ভূষিকে عَصْفٌ বলা হয়। হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, عَصْفٌ হলো ক্ষেতের শস্যের ঐ পাতা যেগুলো পশুরা খেয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তছনছ করে দিলেন এবং সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন। তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কোন কল্যাণই তারা লাভ করতে সমর্থ হলো না। তাদের দুরাবস্থার খবর অন্যদেরকে পৌঁছানোর মত কেউই তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। অল্পসংখ্যক যারা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বেঁচেছিল তারাও পরে ধুকে ধুকে মরেছিল। স্বয়ং বাদশাহ্ও এক টুকরো গোশতের মত হয়ে গিয়েছিল। কোনক্রমে সে সানআতে পৌঁছলো। সেখানে পৌঁছেই তার কলেজা ফেটে গেল এবং সে মারা গেল। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকসূ ইয়ামনের শাসন ভার গ্রহণ করলো। তারপর তার অন্য ভাই মাসরূক ইবনে আবরাহা সিংহাসনে আরোহন করলো। এ সময়ে যূইয়াযান হুমাইরী কিসরার (পারস্য সম্রাট) কাছে গিয়ে হাবশীদের কবল থেকে ইয়ামনকে মুক্ত করার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করলো। কিসরা সাইফের সাথে একদল বাহাদুর সৈন্য পাঠালো। সেই সৈন্যদল হাবশীদেরকে পরাজিত করে আবরাহার বংশধরদের কবল থেকে ইয়ামনের শাসনক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতঃপর হুমাইরীয় গোত্র ইয়ামন শাসন করতে থাকে। আরবের লোকেরা এই উপলক্ষে উৎসব পালন করে। চারদিক থেকে হুমাইরীয় গোত্রের বাদশাহ্কে অভিনন্দন জানানো হয়।

হযরত আয়েশা বিনতে আবী বকর (রাঃ) বলেনঃ "আবরাহার সৈন্যদলের দু'জন সৈন্যকে আমি মক্কা শরীফে দেখেছি। তারা উভয়েই অন্ধ এবং চলাচলে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। তারা বসে বসে ভিক্ষা করতো।"

হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ) বলেন যে, যে আসাফ ও নায়েলা নামক মূর্তিদ্বয়ের পার্শ্বে মুশ্‌রিকরা কুরবানী করতো সেখানে বসে ঐ লোক দু'টি লোকদের কাছে ভিক্ষা চাইতো। তাদের মধ্যে একজন ছিল হাতীর চালক, যার নাম ছিল আনীসা। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যে, আবরাহা নিজে

এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি, বরং শামর ইবনে মাকসূত নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিল। সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার। পাখিগুলো তাদের উপর রাত্রিকালে এসেছিল এবং সকাল পর্যন্ত তাদের সকলকে তছনছ করে ফেলেছিল। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি গারীব বা দুর্বল। আসল কথা হলো এই যে, স্বয়ং বাদশাহ্ আবরাহা আশরম হাবশী নিজেই সৈন্যদল নিয়ে এ অভিযানে অংশ নিয়েছিল। শামর ইবনে মাকসূদ হয় তো কোন একদল সৈন্যের সেনাপতি ছিল। বহু সংখ্যক আরব কবি এ ঘটনাকে নানাভাবে তাঁদের কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

একটি রিওয়াইয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনে নবী করীম (সঃ) একটি টিলার উপর উঠেছিলেন। সেখান থেকে কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উষ্ট্রীটি সেখানে বসে পড়েছিল। সাহাবী (রাঃ)গণ বহু চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেন না। তখন তাঁরা বললেন যে, উষ্ট্রী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ “না, সে ক্লান্তও হয়নি এবং বসে পড়া তার অভ্যাসও নয়। তাকে ঐ আল্লাহ্ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি হাতীকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মক্কাবাসীরা যে শর্তে সম্মত হবে আমি সেই শর্তেই তাদের সাথে সন্ধি করবো। তবে, আল্লাহ্র অমর্যাদা হতে পারে এমন কোন শর্তে আমি সম্মত হবো না।” তারপর তিনি উষ্ট্রীকে ধমক দেয়া মাত্রই সে উঠে দাঁড়ালো। এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার উপর হাতী ওয়ালাদের আধিপত্য বিস্তার করতে দেননি, বরং তিনি তাঁর নবী (সঃ) ও ঈমানদার বান্দাদেরকে মক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। জেনে রেখো যে, মক্কার মর্যাদা আজ ঐ অবস্থাতেই ফিরে এসেছে যে অবস্থায় গতকাল ছিল। খবরদার! প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (খবর) পৌঁছিয়ে দিবে।”

সূরা ঃ ফীল এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ কুরাইশ, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৪, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٤، رُكُوْعُهَا : ١)

এ সূরার ফযীলত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী (রঃ) তাঁর 'কিতাবুল খিলাফিয়্যাত' এ একটি গারীব হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলোঃ হযরত উম্মিহানী বিনতে আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়েশদেরকে সাতটি ফযীলত প্রদান করেছেন। (এক) আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (দুই) নবুওয়াত তাদের মধ্যে রয়েছে। (তিন) তারা আল্লাহ্‌র ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। (চার) তারা যমযম কূপের পানি পরিবেশনকারী। (পাঁচ) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হস্তী অধিপতিদের উপর বিজয় দান করেছেন। (ছয়) দশবছর পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছে যখন অন্য কেউ ইবাদত করতো না। (সাত) তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমের একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) পাঠ করেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۔ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۔ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۔
الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۔

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
১। যেহেতু কুরায়েশের আসক্তি আছে,	١- لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝
২। আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের।	٢- اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝ج
৩। অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের	٣- فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝لا
৪। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্যদান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।	٤- الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۵ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝ع (١ ع٤ ٣١)

কুরআনের বর্তমান উসমানী (রাঃ) সংস্করণের বিন্যাসে এ সূরাটিকে সূরা ফীল হতে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। উভয় সূরার মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ সূরাটিও সূরা 'ফীল' এরই অনুরূপ। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ), আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) প্রমুখ গুরুজন যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বলা হয়েছেঃ আমি মক্কা হতে হাতীদের ফিরিয়ে রেখেছি এবং হাতী ওয়ালাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। কুরায়েশদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এবং শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় অবস্থানের জন্যেও এ সূরার বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে এরূপ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। আবার এই অর্থও লিখিত হয়েছে যে, শীত-গ্রীষ্ম যে কোন ঋতুতে কুরায়েশরা দূর দূরান্তে শান্তিপূর্ণভাবে সফর করতো। কেননা, মক্কার মত সম্মানিত শহরে বসবাস করার কারণে সবাই তাদের সম্মান করতো। তাদের সঙ্গে যারা থাকতো তারাও শান্তিপূর্ণভাবে সফর করতে সক্ষম হতো। একইভাবে নিজ দেশেও তারা সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। যেমন কুরআনের অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ـ

অর্থাৎ "তারা কি দেখে না যে, আমি হরমকে শান্তিমূলক স্থান হিসেবে মনোনীত করেছি, অথচ লোকদেরকে তাদের চতুর্দিক হতে ছিনতাই করা হয়?" (২৯ ঃ ৬৭) কিন্তু সেখানে যারা অবস্থান করে তারা সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, لِاِيْلٰفِ এর মধ্যে প্রথম যে لَام টি রয়েছে ওটা বিস্ময় প্রকাশক لَام এবং উভয় সূরা অর্থাৎ সূরা ফীল এবং সূরা লিঈলাফি কুরাইশ সম্পূর্ণ পৃথক। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়েশদের প্রতি তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেনঃ এই গৃহের মালিকের ইবাদত করা তাদের উচিত, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ আমাকে শুধু এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি এই শহরের প্রভুর ইবাদত করবো যিনি ওকে হরম বানিয়েছেন, যিনি সকল জিনিষের মালিক। আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” (২৭ ঃ ৯১) সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ যিনি ক্ষুধায় আহার্য দিয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন তাঁর ইবাদত কর এবং ছোট বড় কোন কিছুকে তাঁর অংশীদার করো না। আল্লাহ্ তা'আলার এ আদেশ যে পালন করবে আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করাবেন। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যাচরণ যে করবে তার ইহকালের শান্তিকেও অশান্তিতে পরিণত করা হবে এবং আখেরাতেও সে শান্তির পরিবর্তে ভয়ভীতি ও হতাশার সম্মুখীন হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۔ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۔

অর্থাৎ “আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসতো সর্বদিক হতে ওর প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করলো; ফলে, তারা যা করতো তজ্জন্যে আল্লাহ্ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের। তাদের নিকট তো এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে, সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো।” (১৬ঃ ১১২-১১৩)

একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ “হে কুরায়েশগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করেছেন, ঘরে বসিয়ে তোমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন, চতুর্দিকে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তোমাদেরকে তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন। এরপরও তোমাদের কি হলো যে, তোমরা এই বিশ্ব প্রতিপালকের ইবাদত করবে না এবং তাঁর তাওহীদ বা একত্ববাদকে অবিশ্বাস করবে? তোমাদের উপর কি এমন বিপদ আপতিত হলো, যে কারণে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনে মাথানত করবে?”

সূরাঃ কুরাইশ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ মাউ'ন, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৭, রুকূ' ১)

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٧، رُكُوْعُهَا : ١)

ঐ সূরার তাফসীর যার মধ্যে মাউন (গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট জিনিস) এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এটা মক্কী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝	করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।
١- اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ ط	১। তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে থাকে?
٢- فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ لا	২। সে তো সেই, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।
٣- وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ ط	৩। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না।
٤- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ لا	৪। সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্যে
٥- الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ لا	৫। যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী।
٦- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ لا	৬। যারা লোক দেখানোর জন্যে ওটা করে,
٧- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝ ع	৭। এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি কি ঐ লোকটিকে দেখেছো যে প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে? সেতো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে আহার্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ

অর্থাৎ "না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।" (৮৯ ঃ ১৭-১৮) অর্থাৎ ঐ ভিক্ষুককে, যে প্রয়োজন অনুপাতে ভিক্ষা পায় না।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সুতরাং দুর্ভোগ ঐ নামাযীদের যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। অর্থাৎ সর্বনাশ রয়েছে ঐসব মুনাফিকের জন্যে যারা লোকদের সামনে নামায আদায় করে, কিন্তু অন্য সময় করে না। অর্থাৎ লোক দেখানোই তাদের নামায আদায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ অর্থই করেছেন। এ অর্থও করা হয়েছে যে, তারা নির্দিষ্ট সময় পার করে দেয়। মাসরূক (রঃ) এবং আবুয্ যুহা (রঃ) এ কথা বলেছেন।

হযরত আতা ইবনে দীনার (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি عَنْ صَلَاتِهِمْ বলেছেন, فِىْ صَلَاتِهِمْ বলেননি। অর্থাৎ আল্লাহপাক বলছেন যে, তারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, নামাযের মধ্যে গাফিল বা উদাসীন থাকে এরূপ কথা বলেননি। আবার এ শব্দেই এ অর্থও রয়েছে যে, এমন নামাযীদের জন্যেও সর্বনাশ রয়েছে যারা সব সময় শেষ সময় নামায আদায় করে। অথবা আরকান আহকাম আদায়ের ব্যাপারে মনোযোগ দেয় না। রুকু সিজদার ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এসব কিছু যার মধ্যে রয়েছে সে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগা। যার মধ্যে এসব অন্যায় যতো বেশী রয়েছে সে ততো বেশী সর্বনাশের মধ্যে পতিত হয়েছে। তার আমল ততো বেশী ত্রুটিপুর্ণ এবং ক্ষতিকারক।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ওটা মুনাফিকের নামায, ওটা মুনাফিকের নামায, ওটা মুনাফিকের নামায, যে সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, সূর্য অস্ত যেতে শুরু করলে শয়তান যখন তার শিং মিলিয়ে দেয় তখন এ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মোরগের মত চারটি ঠোকর মারে। তাতে আল্লাহর স্মরণ খুব কমই করে।" এখানে আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। এ নামাযকে "সালাতুল ভুসতা" বা মধ্যবর্তী নামায বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তি মাকরূহ সময়ে উঠে দাঁড়ায় এবং কাকের মত ঠোকর দেয়। তাতে আরকান, আহকাম, রুকু, সিজদাহ ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করা হয় না এবং আল্লাহর স্মরণও খুব কম থাকে। লোক দেখানো নামায আদায় করা না করা একই কথা। ঐ মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْآ اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا
كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

অর্থাৎ "মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দেয় এবং তিনি তাদেরকে ধোকা (-র প্রতিফল) দেন, তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতা ও উদাসীনতার সাথে দাঁড়ায়, তারা শুধু লোক দেখানোর জন্যেই নামায পড়ে থাকে এবং তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।" (৪ ঃ ১৪২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ وَيْلٌ জাহান্নামের একটি ঘাঁটির নাম। ওর আগুন এমন তেজস্বী ও গরম যে, জাহান্নামের অন্যান্য আগুন এই আগুন থেকে আল্লাহর কাছে দৈনিক চারশ' বার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। এই وَيْلٌ এই উম্মতের অহংকারী আলেমদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে এবং যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে দান খায়রাত করে থাকে তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে।" আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে হজ্ব করে ও জিহাদ করে তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে।"[১]

তবে হ্যাঁ, এখানে স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্যে কোন ভাল কাজ করে, আর জনগণ তা জেনে ফেলে এবং এতে সে খুশী হয় তাহলে এটা রিয়াকারী ও অহংকার বলে গণ্য হবে না।

মুসনাদে আবী ইয়ালা মুসিলীতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি একাকী (নফল) নামায পড়ছিলাম এমন সময় হঠাৎ করে একটি লোক আমার কাছে এসে পড়ে, এতে আমি কিছুটা আনন্দিত হই (এতে কি আমার রিয়া হবে?)" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন "(না, না, বরং) তুমি এতে দুটি পুণ্য লাভ করবে। একটি গোপন করার পুণ্য এবং আরেকটি প্রকাশ করার পুণ্য।"[২]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) একটি গারীব সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যখন اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ মহান! তোমাদের প্রত্যেককে সারা পৃথিবীর সমান দেয়ার চেয়েও এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম। এখানে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে নামায পড়লে কোন কল্যাণের আশা করে না এবং না পড়লেও স্বীয় প্রতিপালকের ভয় তার মনে কোন রেখাপাত করে না।"

---

[১] এহাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] ইবনে মুবারক (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি রিয়াকারদের জন্যে খুবই উত্তম। কিন্তু সনদের দিক থেকে এটা গারীব। তবে একই অর্থবোধক হাদীস অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, নবী করীম (সঃ)-কে এ আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "এখানে ঐ সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা নামায আদায়ের ব্যাপারে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব করে।" এর একটি অর্থ এও রয়েছে যে, আদৌ নামায পড়ে না। অন্য একটি অর্থ এই আছে যে, শরীয়ত অনুমোদিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নামায পড়ে। আবার এটাও অর্থ রয়েছে যে, সময়ের প্রথম দিকে নামায পড়ে না।

একটি মাওকূফ হাদীসে রয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) বলেনঃ এর ভাবার্থ হলোঃ নামাযের সময়কে সংকীর্ণ করে ফেলে। এ বর্ণনাটিই সবচেয়ে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম বায়হাকীও (রঃ) বলেছেন যে, মারফূ' রিওয়াইয়াত যঈফ বা দুর্বল এবং মাওকূফ রিওয়াইয়াত সহীহ বা বিশুদ্ধ। ইমাম হাকিমও (রঃ) একথা বলেছেন। কাজেই এসব লোক আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন অলসতা করে, তেমনি লোকদের অধিকারও আদায় করে না। তারা রিয়াকারী করে ও যাকাত দেয় না।

হযরত আলী (রাঃ) মা'উন শব্দের অর্থ যাকাত পরিশোধ বলেও উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তাফসীরকারগণও একই কথা বলেছেন। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, তাদের নামায আদায়ও রিয়াকারী ও অহংকার প্রকাশক। তাদের সম্পদের সাদকার মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য রয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, এই মুনাফিকরা লোক দেখানোর জন্যে নামায আদায় করে, কারণ নামায প্রকাশ্য ব্যাপার। তবে তারা যাকাত আদায় করে না, কারণ যাকাত গোপনীয় ব্যাপার। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, মা'উন ঐ সব জিনিষকে বলা হয় যা মানুষ একে অন্যের নিকট চেয়ে থাকে। যেমন কোদাল, বালতি, ডেকচি ইত্যাদি। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ মা'উনের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, বর্ণনাকারী বলেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম এবং মাউনের আমরা এ তাফসীর করেছি।"

সুনানে নাসাঈতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "প্রত্যেক ভাল জিনিষই সাদকা। ডোল, হাঁড়ি, বালতি ইত্যাদি দেয়াকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আমলে আমরা 'মাউন নামে অভিহিত করতাম। মোটকথা, এর অর্থ হলো যাকাত না দেয়া, আনুগত্য না করা, কোন জিনিষ চাইলে না দেয়া, ছোট

ছোট জিনিষ কেউ কিছু সময়ের জন্যে নিতে চাইলে না দেয়া, যেমন চালুনি, কোদাল, দা, কুড়াল, ডেকচি ডোল ইত্যাদি।

একটি গারীব বা দুর্বল হাদীসে রয়েছে যে, নুমায়ের গোত্রের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে বিশেষ আদেশ কি দিচ্ছেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "মাউনের ব্যাপারে নিষেধ করো না।" প্রতিনিধি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "মাউন কি?" তিনি জবাব দিলেনঃ "পাথর, লোহা, পানি।" প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেনঃ "লোহা দ্বারা কোন লোহাকে বুঝানো হচ্ছে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "মনে কর, তোমাদের তামার পাতিল, লোহার কোদাল ইত্যাদি।" প্রতিনিধি প্রশ্ন করলেনঃ "পাথরের অর্থ কি?" রাসূলুল্লাহ বললেনঃ "ডেকচি, শীলবাটা ইত্যাদি।" এ হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল। এর রাভী বা বর্ণনাকারী 'মাশহূর' শ্রেণীভুক্ত নন।

আলী ইবনে ফুলান নুমাইরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "মুসলমান মুসলমানের ভাই। দেখা হলে সালাম করবে, সালাম করলে ভাল জবাব দিবে এবং মাউনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাবে না অর্থাৎ নিষেধ করবে না।" আলী নুমাইরী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "মাউন কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "পাথর, লোহা এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিষ।" এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ঃ মাউন এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ কাওসার, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৩, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعُهَا : ١)

আবার এটাকে মাদানী সূরাও বলা হয়েছে।

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার দান করেছি,

١- اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○

২। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর।

٢- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○

৩। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।

٣- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ○

মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে হাসিমুখে তিনি বললেন অথবা তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ "এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।" তারপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা কাওসার পাঠ করলেন। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "কাওসার কি তা কি তোমরা জান?" উত্তরে তাঁরা বললেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "কাওসার হলো একটা জান্নাতী নহর। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে এটা দান করেছেন। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত সেই কাওসারের ধারে সমবেত হবে। আসমানে যতো নক্ষত্র রয়েছে সেই কাওসারের পিয়ালার সংখ্যাও ততো। কিছু লোককে কাওসার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে তখন আমি বলবোঃ হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার উম্মত!" তখন তিনি আমাকে বলবেনঃ "তুমি জান না, তোমার (ইন্তেকালের) পর তারা কত রকম বিদআত আবিষ্কার করেছে!"

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, সেই কাওসারের দুটি ধারা আকাশ থেকে অবতরণ করবে।

সুনানে নাসাঈতে রয়েছে যে, এ ঘটনা মসজিদে নববীতে (সঃ) ঘটেছে। এজন্যেই অধিকাংশ কারী বলেন যে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ

ফিকাহ্‌বিদ এ হাদীস থেকেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' প্রত্যেক সূরার সাথেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা প্রত্যেক সূরার পৃথক আয়াত।

মুসনাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সূরার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে বলেনঃ "আমাকে কাওসার দান করা হয়েছে। কাওসার একটি প্রবাহিত ঝর্ণা বা নহর, কিন্তু গর্ত নয়। ওর দু'পাশে মুক্তার তৈরি তাঁবু রয়েছে। ওর মাটি খাঁটি মিশকের ওর পাথরও খাঁটি মুক্তাদ্বারা নির্মিত।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসমানে জান্নাতে এ নহর দেখেছিলেন। এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "এটা কোন নহর?" হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বলেছিলেনঃ "এর নাম কাওসার, যে কাওসার আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনাকে দান করেছেন।" এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, কাওসারের পানি দুধের চেয়েও বেশী সাদা, মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট। সেই কাওসারের তীরে লম্বাগ্রীবা বিশিষ্ট পাখিরা বসে রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) একথা শুনে বললেনঃ "সে সব পাখি তো খুব সুন্দর!" নবী করীম (সঃ) বললেনঃ 'সেগুলো খেতেও খুব সুস্বাদু।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "কাওসার কি?" উত্তরে তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করলে হযরত উমার (রাঃ) পাখিগুলো সম্পর্কে উপরোক্ত কথা বলেন।[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন এ নহরটি জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত।[২] হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কাওসারের পানি ঝরার শব্দ শুনতে পছন্দ করে সে যেন তার অঙ্গুলিদ্বয় তার কর্ণদ্বয়ে রাখে।[৩] প্রথমতঃ এ হাদীসের সনদ সমার্থ নয়, দ্বিতীয়তঃ অর্থ হলো কানে আঙ্গুল দিয়ে কাওসারের পানি ঝরার মত শব্দ শোনা যাবে, অবিকল সেই আওয়াজই যে শোনা যাবে এমন নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাওসারের মধ্যে ঐ কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা খাস করে তাঁর নবী (সঃ)-কে দান করেছেন। আবু বাশার (রঃ) সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ)কে বলেনঃ লোকদের তো ধারণা এই যে, কাওসার হলো জান্নাতের একটি

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি মুনকার বা অস্বীকৃত।
৩. সনদের দিক দিয়ে এ হাদীসটি মুনকাতা' বা ছেদ কাটা।

নহর। তখন হযরত সাঈদ (রঃ) বললেনঃ জান্নাতে যে নহরটি রয়েছে সেটা ঐ কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ খাস করে তাঁর নবী (সঃ)-কে প্রদান করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, কাওসার হলো বহু কল্যান। বহু সংখ্যক তাফসীরকার এরকমই লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কাওসার দ্বারা দুনিয়ার ও আখেরাতের বহু প্রকারের কল্যাণের কথা বুঝানো হয়েছে। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, কাওসার দ্বারা নবুওয়াত, কুরআন ও পরকালের পুণ্যকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কাওসারের তাফসীরে নহরে কাওসারও বলেছেন।

তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাওসার হলো জান্নাতের একটি নহর যার উভয় তীর স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। ইয়াকূত ও মণি-মুক্তার উপর ওর পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ঐ কাওসারের পানি বরফের চেয়েও অধিক সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি।[১]

তাফসীরে ইবনে জারীরে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হামযার (রাঃ) বাড়িতে আগমন করেন। হযরত হামযা (রাঃ) ঐ সময় বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বানূ নাজ্জার গোত্রীয়া মহিলা বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ "আমার স্বামী এই মাত্র আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি বানূ নাজ্জারের ওখানে আটকা পড়ে গেছেন। আপনি এসে বসুন।" অতঃপর হযরত হামযার (রাঃ) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে মালীদা (এক প্রকার খাদ্য) পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তা আহার করলেন। হযরত হামযা'র (রাঃ) স্ত্রী আনন্দের সুরে বললেনঃ "আপনি নিজেই আমাদের গরীব খানায় তাশরীফ এনেছেন এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমি তো ভেবেছিলাম যে আপনার দরবারে হাজির হয়ে আপনাকে হাউযে কাওসার প্রাপ্তি উপলক্ষে মুবারকবাদ জানাবো। এই মাত্র হযরত আবূ আম্মারাহ (রাঃ) আমার কাছে এই সুসংবাদ পৌঁছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "হ্যাঁ, সেই হাউযে কাওসারের মাটি হলো ইয়াকূত, পদ্মরাগ, পান্না এবং মণি মুক্তা।"[২]

বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তা'বিয়ীর বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কাওসার একটি নহরের নাম।

---

১. ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইববে মাজাহ (রঃ)এ হাদীসটি মারফু রূপেও বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২. খারামা ইবনে উসমান নামক এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী দুর্বল। তবে এটাকে হাসান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি। অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ। অর্থাৎ হে নবী (সঃ) তুমি নফল নামায ও কুরবানীর মাধ্যমে লা-শারীক আল্লাহ্র ইবাদত কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ـ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ـ

অর্থাৎ "বলঃ আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।" (৬ ঃ ১৬২-১৬৩)

কুরবানী দ্বারা এখানে উট বা অন্য পশু কুরবানীর কথা বলা হয়েছে। মুশরিকরা সিজদা' এবং কুরবানী আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের নামে করতো। এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করো। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ

অর্থাৎ" যে পশু কুরবানীতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না তা তোমরা খেয়োনা, কেননা, এটা ফিসক বা অন্যায়াচরণ।" (৬ ঃ ১২১) এটাও বলা হয়েছে যে, اِنْحَرْ এর অর্থ হলো নামাযের সময়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকে বাঁধা। এটা হযরত আলী (রাঃ) হতে গায়ের সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে। হযরত শা'বী (রঃ) এ শব্দের তাফসীর এটাই করেছেন।

হযরত আবূ জা'ফর বা'কির (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো নামায শুরু করার সময় হাত উঠানো। একথাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হলোঃ বুক কিবলার দিক রেখে কিবলা মুখী হওয়া। এই তিনটি উক্তিই ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে এ জায়গায় একটি নিতান্ত মুনকার হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে আছে যে, এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! وَانْحَرْ এর অর্থ কি?" উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "এর অর্থ কুরবানী নয়, বরং আপনার প্রতিপালক আপনাকে নামাযে তাকবীরে তাহ্রীমার সময়, রুকুর সময়, রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় এবং সিজদাহ করার সময় দু'হাত তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই আমাদের এবং যে সব ফেরেশতা সপ্তম আকাশে রয়েছেন তাঁদের নামায। প্রত্যেক

জিনিষের সৌন্দর্য রয়েছে, নামাযের সৌন্দর্য হলো প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠানো।”

হযরত আতা খুরাসানী (রঃ) বলেন যে, وَانْحَرْ এর অর্থ হলো নিজের পিঠ রুকু হতে উঠানোর সময় সমতল করে বুক প্রকাশ করো অর্থাৎ স্বস্তি অর্জন করো। এগুলো সবই গারীব বা দুর্বল উক্তি।

نَحَرٌ এর অর্থ কুরবানীর পশু জবাহ করা এ উক্তিটিই হলো সঠিক উক্তি। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদের নামায শেষ করার পরপরই নিজের কুরবানীর পশু যবাহ করতেন এবং বলতেনঃ “যে আমাদের নামাযের মত নামায পড়েছে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করেছে সে শরীয়ত সম্মতভাবে কুরবানী করেছে আর যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বেই কুরবানী করেছে তার কুরবানী আদায় হয়নি।” একথা শুনে হযরত আবূ বারদাহ ইবনে দীনার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। আজকের দিনে গোশতের চাহিদা বেশী হবে ভেবেই কি আপনি নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছেন?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তা হলে তো খাওয়ার গোশতই হয়ে গেল অর্থাৎ কুরবানী হলো না।” সাহাবীগণ বললেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বর্তমানে আমার কাছে একটি বকরীর শাবক রয়েছে, কিন্তু ওটা দুটি বকরীর চেয়েও আমার কাছে অধিক প্রিয়। এ বকরীর শাবকটি কি আমার জন্যে যথেষ্ট হবে?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ, তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে বটে, কিন্তু তোমার পরে ছয় মাসের বকরী শাবক অন্য কেউ কুরবানী করতে পারবে না।”

ইমাম আবূ জাফর ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ তার কথাই যথার্থ যে বলে যে, এর অর্থ হলোঃ নিজের সকল নামায শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে আদায় করো, তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্যে আদায় করো না। তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর যিনি তোমাকে এরকম বুযুর্গী ও নিয়ামত দান করেছেন যে রকম বুযুর্গী ও নিয়ামত অন্য কাউকেও দান করেননি। এটা একমাত্র তোমার জন্যেই নির্ধারিত করেছেন। এই উক্তিটি খুবই উত্তম।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাযী (রঃ) এবং আতা (রঃ) একই কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরার শেষ আয়াতে বলেছেনঃ নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারীই তো নির্বংশ। অর্থাৎ যারা তোমার (হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর) শত্রুতা করে, তারাই অপমানিত, লাঞ্ছিত, তাদেরই লেজকাটা।

এই আয়াত আ'স ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই দুর্বৃত্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আলোচনা শুনলেই বলতোঃ “ওর কথা রাখো, ওর কথা রাখো, ওর কোন পুত্র সন্তান নেই। মৃত্যুর পরই সে বেনাম-নিশান হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা তখন এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

শামর ইবনে আতিয়্যাহ (রঃ) বলেন যে, উকবা ইবনে আবী মুঈত সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কা'ব ইবনে আশরাফ এবং কুরায়েশদের একটি দল সম্পর্কে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদে বায্যারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইবনে আশরাফ যখন মক্কায় আসে তখন কুরায়েশরা তাকে বলেঃ "আপনি তো তাদের সর্দার, আপনি কি ঐ ছোকরাকে (হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে দেখতে পান না? সে সমগ্র জাতি থেকে পৃথক হয়ে আছে, এতদসত্ত্বেও নিজেকে সবচেয়ে ভাল ও শ্রেষ্ঠ মনে করছে। অথচ আমরা হাজীদের বংশধর, কা'বাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক এবং যমযম কূপের দেখাশোনাকারী।" দুর্বৃত্ত কা'ব তখন বললোঃ 'নিঃসন্দেহে তোমরা তার চেয়ে উত্তম।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।"[১]

হযরত আতা' (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত আবু লাহাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সন্তানের ইন্তেকালের পর এ দুর্ভাগা দুর্বৃত্ত মুশরিকদেরকে বলতে লাগলো "আজ রাত্রে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধারা বিলোপ করা হয়েছে।" আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটাও বলেছেন যে, এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত শত্রুকেই বুঝানো হয়েছে। যাদের নাম নেয়া হয়েছে এবং যাদের নাম নেয়া হয়নি তাদের সকলকেই বুঝানো হয়েছে।

শব্দের অর্থ হলো একাকী। আরবে এ প্রচলন রয়েছে যে, যখন কারো একমাত্র সন্তান মারা যায় তখন তাকে 'আবতার' বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তানদের ইন্তেকালের পর শত্রুতার কারণে তারা তাঁকে 'আবতার' বলছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। 'আবতার' এর অর্থ দাঁড়ালোঃ যার মৃত্যুর পর তার সম্পর্কিত আলোচনা, নাম নিশানা মুছে যায়। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্পর্কেও ধারণা করেছিল যে, সন্তান বেঁচে থাকলে তাঁর আলোচনা জাগরুক থাকতো। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অথচ তারা জানে না যে, পৃথিবী টিকে থাকা অবধি আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)-এর নাম টিকিয়ে রাখবেন। নবী করীম (সঃ)-এর শরীয়ত চিরকাল বাকি থাকবে। তাঁর আনুগত্য সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে অত্যাবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর প্রিয় ও পবিত্র নাম সকল মুসলমানের মনে ও মুখে রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম আকাশতলে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান থাকবে। জলে স্থলে সর্বদা তাঁর নাম আলোকিত হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর আল ও আসহাবের প্রতি দরূদ ও সালাম সর্বাধিক পরিমাণে প্রেরণ করুন! আমীন!

সূরা ঃ কাওসার এর তাফসীর সমাপ্ত

---

১. এ হাদীসের সনদ সহীহ বা বিশুদ্ধ।

সূরাঃ কা-ফিরূন মাক্কী

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৬, রুকূ' ঃ ১)

(اٰيَاتُهَا : ٦، رُكُوْعُهَا : ١)

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাওয়াফের পর দুই রাকআ'ত নামাযে এই সূরা এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরা পাঠ করতেন। সহীহ মুসলিমেই হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের দুই রাকআ'ত সুন্নাত নামাযেও এ সূরা দুটি পাঠ করতেন। মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের পূর্বের দুই রাকআ'তে এবং মাগিরিবের পরের দুই রাকআ'তে قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরা দুইটি বিশেরও অধিকবার অথবা দশেরও অধিকবার পাঠ করতেন।

মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি ফজরের দুই রাকআ'ত সুন্নাত নামাযে এবং মাগরিবের দুই রাকআ'ত সুন্নাত নামাযে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরা দু'টি চব্বিশ বার অথবা পঁচিশবার পড়তে দেখেছি।

মুসনাদে আহমদেরই অন্য এক রিওয়াইয়াতে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে এক মাস ধরে ফজরের পূর্বের দুই রাকআ'ত নামাযে এবং মাগরিবের পরের দুই রাকআ'তে নামাযে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এ সূরা দু'টি পাঠ করতে দেখেছেন।[১]

এই সূরাটি যে কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য এ বর্ণনাটি ইতিপূর্বে গত হয়েছে। اِذَا زُلْزِلَتْ সূরাটিও একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

মুসনাদে আহমদে হযরত নওফিল ইবনে মুআ'বিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে (তাঁর পিতাকে) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যয়নব (রাঃ)কে তুমি তোমার কাছে নিয়ে প্রতিপালন কর।" নওফিলের (রাঃ) পিতা এক সময়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "মেয়েটি সম্পর্কে তুমি কি করেছো?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আমি তাকে তার মায়ের কাছে রেখে এসেছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস

---

[১] এ হাদীসটি জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ এবং সুনানে নাসায়ীতেও রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

করলেনঃ "কেন রেখে এসেছো?" তিনি (নওফিল (রাঃ)-এর পিতা মুআ'বিয়া উত্তরে বললেনঃ "শয়নের পূর্বে পড়ার জন্যে আপনার কাছে কিছু ওয়াযীফা শিখতে এসেছি।" রাসূলুল্লাহ তখন বললেনঃ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পাঠ করো, এতে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে।"

হযরত জিবিল্লাহ ইবনে হা'রিসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তুমি বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। কেননা, এটা হলো শিরক হতে মুক্তি লাভের উপায়।"[১]

আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বিছানায় শয়ন করতে যেতেন তখন قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন।[২]

হযরত হারিস ইবনে জিবিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ "আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি ঘুমোবার সময় পাঠ করবো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যখন তুমি বিছানায় ঘুমোতে যাবে তখন قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পাঠ করবে। কেননা, এটা শিরক হতে মুক্তি লাভের উপায়।"[৩] এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১। বলঃ হে কাফিরগণ!	١- قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○
২। আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর	٢- لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○
৩। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি,	٣- وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ○
৪। এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছো।	٤- وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আবূল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটিও ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[৩] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫। এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি।

٥- وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝

৬। তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্যে আমার কর্মফল।

٦- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۝

এই মুবারক সূরায় আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের আমলের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে মক্কার কুরায়েশদেরকে সম্বোধন করা হলেও পৃথিবীর সমস্ত কাফিরকে এই সম্বোধনের আওতায় আনা হয়েছে। এই সূরার শানে নুযূল এই যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বললোঃ "এক বছর আপনি আমাদের মাবূদ প্রতিমাগুলোর ইবাদত করুন, পরবর্তী বছর আমরাও এক আল্লাহর ইবাদত করবো।" তাদের এই প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ সূরা নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)কে আদেশ করছেনঃ তুমি বলে দাওঃ হে কাফিরগণ! না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি, না তোমরা আমার মাবূদের উপাসনা কর। আর না আমি তোমাদের উপাস্যদেরকে উপাসনা করবো, না তোমরা আমার মাবূদের উপাসনা করবে। অর্থাৎ আমি শুধু আমার মাবূদের পছন্দনীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরই উপাসনা করবো, তোমাদের পদ্ধতি তো তোমরা নির্ধারণ করে নিয়েছো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى

অর্থাৎ "তারা শুধু মনগড়া বিশ্বাস এবং খাহেশাতে নাফসানী বা কুপ্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে, অথচ তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের হিদায়াত বা পথ নির্দেশ পৌঁছে গেছে।" (৫৩ ঃ ২৩) অতএব, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সংস্পর্শ হতে নিজেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত করে নিয়েছেন এবং তাদের উপাসনা পদ্ধতি ও উপাস্যদের প্রতি সর্বাত্মক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, প্রত্যেক ইবাদতকারীরই মাবূদ বা উপাস্য থাকবে এবং উপাসনার পদ্ধতি থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর উম্মত শুধু আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত বা উপাসনা করেন। নবী করীমের (সঃ) অনুসারীরা তাঁরই শিক্ষা অনুযায়ী ইবাদত করে থাকে। এ কারণেই ঈমানের মূলমন্ত্র হলোঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল।" পক্ষান্তরে কাফির মুশরিকদের উপাস্য বা মাবূদ আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন, তাদের উপাসনার

পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের। আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতির সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন কাফিরদেরকে জানিয়ে দেনঃ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্যে আমার দ্বীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তাদেরকে বলে দাওঃ আমার আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে, আমি যে আমল করি তা হতে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যে আমল কর তা হতে আমিও মুক্ত।" (১০ ঃ ৪১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরো বলেনঃ

لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

অর্থাৎ "আমাদের কর্ম আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্যে।" (৪২ ঃ ১৫) অর্থাৎ আমাদের কর্মের জন্যে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমাদের কর্মের জন্যে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে লিখা হয়েছেঃ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন অর্থাৎ কুফর, আর আমার জন্যে আমার দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম। আয়াতের শব্দ হলো دِيْنِي কিন্তু অন্যান্য আয়াতে যেহেতু نُوْن এর উপর ওয়াক্ফ হয়েছে সেই হেতু এখানেও ى কে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন فَهُوَ يَهْدِيْنِ এবং يَسْقِيْنِ এর মধ্যে ى কে উহ্য রাখা হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে এ আয়াতের অর্থ হলোঃ আমি তোমাদের বর্তমান উপাস্যদের উপাসনা করি না, ভবিষ্যতের জন্যেও তোমাদেরকে হতাশ করছি যে, সমগ্র জীবনে ঐ কুফরী আমার (নবী (সঃ)-এর) দ্বারা কখনো সম্ভব হবে না। একইভাবে তোমরা আমার প্রতিপালকের ইবাদত বর্তমানেও কর না এবং ভবিষ্যতেও করবে না।

এখানে ঐ সব কাফিরকে বুঝানো হয়েছে যাদের ঈমান আনয়ন না করার ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার জানা রয়েছে। যেমন অন্যত্র রয়েছেঃ

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ـ

অর্থাৎ “তোমার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় ঐ ব্যাপারে তাদের অধিকাংশ হঠকারিতা ও কুফরীতে লিপ্ত হয়।” (৫ ঃ ৬৮)

কোন কোন আরবী সাহিত্য বিশারদ হতে ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, একটি বাক্যকে দু'বার গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

অর্থাৎ “কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্য কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।” আর এক জায়গায় বলেনঃ

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ـ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ـ

অর্থাৎ “তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই, আবার বলি তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে।”

আলোচ্য সূরায় একই রকম বাক্য দু'বার ব্যবহারের তিনটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রথম বাক্যে উপাস্য এবং দ্বিতীয় বাক্যে ইবাদত বা উপাসনার পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম বাক্যে বর্তমান এবং দ্বিতীয় বাক্যে ভবিষ্যৎ বুঝানো হয়েছে। তৃতীয়তঃ প্রথম বাক্যের তাগীদের জন্যেই দ্বিতীয় বাক্যের অবতারণা করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এখানে চতুর্থ একটি কারণ আবূ আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রঃ) তাঁর কোন এক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় প্রথম বাক্য জুমলায়ে ফে'লিয়া এবং দ্বিতীয় বাক্য জুমলায়ে ইসমিয়া অর্থাৎ আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না, আমার নিকট হতে অনুরূপ কোন আশাও কেউ করতে পারে না। এ উক্তিটিও ভালো বলেই মনে হয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম শাফিয়ী' (রঃ) এ আয়াত থেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কাফিররা সবাই এক জাতি। এ কারণে ইয়াহূদীরা খৃস্টানদের এবং খৃস্টানরা ইয়াহূদীদের উত্তরাধিকারী হতে পারে। উভয়ের মধ্যে বংশগত ও কার্যকরণ গত সামঞ্জস্য ও অংশীদারিত্ব রয়েছে। এ কারণে ইসলাম ছাড়া কুফরীর যতগুলো পথ রয়েছে, বাতিল হিসেবে সবই এক ও অভিন্ন। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের মাযহাব এর বিপরীত। তাঁরা বলেন যে, ইয়াহূদীরা খৃষ্টানদের বা খৃষ্টানরা ইয়াহূদীদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না, কেননা, হাদীসে রয়েছে যে, দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একে অন্যের অংশীদার ও উত্তরাধিকারী হতে পারে না।

সূরা ঃ 'কা-ফিরূন এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ নাস্‌র, মাদানী

(আয়াত ঃ ৩, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعُهَا : ١)

পূর্বেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, এই সূরাটি কুরআন কারীমের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উৎবাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করেনঃ "সর্বশেষ কোন সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে তা কি তুমি জান?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, সূরা ইযাজাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু' (সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে।)" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তখন বললেনঃ "তুমি সত্য বলেছো।"[১]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আইয়ামে তাশরীকের (১১ই, ১২ইও ১৩ই যিল হজ্ব তারিখের) মধ্যভাগে اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, এটা বিদায়ী সূরা। সুতরাং তখনই তিনি সওয়ারী তৈরি করার নির্দেশ দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। তারপর তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ খুৎবাহ প্রদান করলেন।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরা অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ "আমার পরলোক গমনের খবর এসে গেছে।" এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন।

তারপরই তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "আমার আব্বার (সঃ) পরলোক গমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার খবর শুনে আমার কান্না এসেছিল। কিন্তু আমার কান্নার সময় তিনি আমাকে বললেনঃ "তুমি ধৈর্য ধারণ করো। আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে তুমিই সর্ব প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।"[৩]

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর বাযযার (রঃ) এবং হাফিয বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

[৩] এহাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে নাসায়ীতে এটা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাতে হযরত ফাতিমার (রঃ) উল্লেখ করা হয়নি।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ۙ○

১। যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

٢- وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ○

২। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে।

٣- فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع ○

৩। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতাবাচক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো তিনি তো সর্বাপেক্ষা অধিক অনুতাপ গ্রহণকারী।

ع ٢ ٢٥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক মুজাহিদদের সাথে হযরত উমার (রাঃ) আমাকেও শামিল করে নিতেন। এ কারণে কারো কারো মনে সম্ভবতঃ অসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকবে। একদা তাদের মধ্যে একজন আমার সম্পর্কে মন্তব্য করলেনঃ সে যেন আমাদের সাথে না থাকে। তার সমবয়সী ছেলে আমাদেরও তো রয়েছে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ তোমরা তো তাকে খুব ভাল রূপেই জান!" একদিন তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং আমাকেও স্মরণ করলেন আমি বুঝতে পারলাম যে, আজ তিনি তাঁদেরকে কিছু দেখাতে চান। আমরা সবাই হাজির হলে তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেনঃ اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ সূরাটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি (অর্থাৎ এ সূরাটি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে)।" কেউ কেউ বললেনঃ "এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার গুণগান করার জন্যে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যে আমাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এলে এবং আমাদের বিজয় সূচিত হলেই যেন আমরা এইরূপ করি।" কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন, কিছুই বললেন না। হযরত উমার (রাঃ) তখন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার মতামতও কি এদের মতই?" আমি উত্তরে বললামঃ না, বরং আমি এই বুঝেছি এ সূরায় রাসূলুল্লাহর (সঃ) পরলোক গমনের ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে

এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর ইহলৌকিক জীবন শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং তিনি যেন তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “আমিও এটাই বুঝেছি।”[১]

এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “(এ বছরই আমার ইন্তেকাল হবে) আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে।”[২] মুজাহিদ (রঃ), আবুল আলিয়া (রঃ), যহহাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় অবস্থান করছিলেন, একদা তিনি বলেনঃ “আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান! আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে পড়েছে। ইয়ামনের অধিবাসীরা এসে গেছে।” তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ইয়ামনবাসীরা কেমন লোক?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “তারা কোমল প্রাণ ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের অধিকারী। ঈমান, বুদ্ধিমত্তা এবং হিকমত এ সবই ইয়ামনবাসীদের রয়েছে।”[৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যেহেতু এ সূরাটিতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) পরলোকগমনের সংবাদ ছিল সেহেতু সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আখেরাতের কাজে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগী হন। অতঃপর তিনি বলেনঃ “আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে এবং ইয়ামনবাসী এসে পড়েছে।” তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ “ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ইয়ামনবাসীরা কি (প্রকৃতির লোক)?” উত্তরে তিনি বললেন! “তাদের অন্তর কোমল, স্বভাব নম্র এবং তারা ঈমান ও বুদ্ধি মত্তার অধিকারী।”[৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা সমূহের মধ্যে পুরো সূরা অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এ সূরাটিই সর্বশেষ সূরা।[৫]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এ হাদসিটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫. এ হাদীসটিও ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এ সূরাটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তা শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন, অতঃপর বলেনঃ “সব মানুষ এক দিকে এবং আমি ও আমার সাহাবীরা এক দিকে। জেনে রেখো যে, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, তবে রয়েছে জিহাদ এবং নিয়ত।” মারওয়ানকে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) এ হাদীসটি শোনালে তিনি বলে ওঠেনঃ “তুমি মিথ্যা বলছো” ঐ সময় মারওয়ানের সাথে তাঁর মজলিসে হযরত রাফে’ ইবনে খাদীজ (রঃ) এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতও (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন! “এঁরাও এ হাদীসটি জানেন এবং বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু একজন নিজের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশংকায় এবং অপরজন যাকাত আদায়ের পদমর্যাদা থেকে বরখাস্ত হওয়ার ভয়ে এটা বর্ণনা করছেন না।” একথা শুনে মারওয়ান হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)কে চাবুক মারতে উদ্যত হলে উভয় সাহাবী মারওয়ানকে লক্ষ্য করে বলেনঃ “শোনো মারওয়ান! হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) সত্য কথাই বলেছেন।”[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেনঃ “হিজরত আর অবশিষ্ট নেই, তবে জিহাদ এবং নিয়ত বাকি রয়েছে। তোমাদেরকে যখন চলতে বলা হবে তখন তোমরা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করবে।”[২] তবে হ্যাঁ, এটাও মনে রাখতে হবে যে, যে সব সাহাবী (রাঃ) হযরত উমারের (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেনঃ “যখন আল্লাহ তা’আলা আমাদের উপর শহর ও দূর্গের বিজয় দান করবেন এবং আমাদেরকে সাহায্য করবেন তখন আমরা যেন তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, এ সূরায় এ নির্দেশই তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। তাছাড়া আমরা যেন নামায আদায় করি ও নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি, এ নির্দেশও আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।” তাঁদের এ অর্থ ও তাফসীরও খুবই সুন্দর ও বিশুদ্ধ, এতে কোন সন্দেহ নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন চাশতের আট রাকআত নামায আদায় করেছিলেন, যদিও কেউ কেউ বলেন যে, ওটা ছিল চাশ্‌তের নামায, কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি চাশ্‌তের নামায নিয়মিতভাবে আদায় করতেন না। তাছাড়া ঐসময় ব্যস্ততা ছিল এবং কাজকর্মও

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

অনেক ছিল। তিনি ছিলেন মুসাফির, এ অবস্থায় কি করে তিনি চাশতের নামায পড়তে পারেন? এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের সময়ে মক্কা শরীফে রমযানের শেষ পর্যন্ত উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ফরয নামাযও কসর করেছিলেন। তিনি রোযাও রাখেননি। তাঁর সঙ্গীয় প্রায় দশ হাজার মুসলমান সবাই এ নিয়ম পালন করেছিলেন। এতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আট রাকআ'ত নামায মক্কা বিজয়ের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ছিল। এ কারণেই সেনাবাহিনী প্রধান বা সমকালীন ইমামের জন্যে কোন শহর জয় করার সাথে সাথে ঐ শহরে আট রাকআ'ত নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

হযরত সা'দ ইবনে অক্কাস (রাঃ) মাদায়েন বিজয়ের দিন অনুরূপ আট রাকআ'ত নামায আদায় করেছিলেন। এই আট রাকআ'ত নামায দুই রাকআত করে আদায় করতে হবে। কারো কারো মতে আট রাকআ'তে একবার সালাম ফিরালেই চলবে। অর্থাৎ একবারই সালাম ফিরানোর নিয়তে আট রাকআ'ত নামায পড়া যাবে। কিন্তু সুনানে আবি দাউদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ নামায প্রতি দুই রাকআ'তে সালাম ফিরিয়ে আদায় করেছিলেন। অন্যান্য তাফসীরও বিশুদ্ধ। যেমন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেছেন যে, এ সূরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে তার ইন্তেকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যে মক্কা থেকে কাফিররা তোমাকে চলে যেতে বাধ্য করেছে, সেই মক্কা বিজয় যখন তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে, নিজের পরিশ্রমের ফলে যখন দেখতে পাবে, আরো যখন দেখতে পাবে যে, জনগণ আল্লাহর ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করছে তখন তুমি স্বীয় প্রতিপালকের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তুমি পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকো। মনে রেখো যে, তোমার ইহকালীন দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং এখন পরকালের প্রতি মনোযোগী হও। সেখানে তোমার জন্যে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। তোমার মেহমানদারী স্বয়ং আমিই করবো। কাজেই আমার রহমত ও কুদরতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে অধিক পরিমাণে আমার প্রশংসা করো, তাওবা' ইসতিগফার করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুল করে থাকেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর রুকু ও সিজদায় নিম্নলিখিত তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেনঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি মহাপবিত্র এবং আপনার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন! রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন কারীমের ... فَسَبِّحْ এ আয়াতের উপর অধিক পরিমাণে আমল করতেন।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর শেষ জীবনে নিম্নলিখিত কালেমাগুলো অধিক পরিমাণে পাঠ করতেনঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ মহাপবিত্র, তাঁর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তাওবা করছি।"

তিনি আরো বলতেনঃ "আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়ে রেখেছেনঃ যখন আমি দেখতে পাই যে, মক্কা বিজয় অত্যাসন্ন এবং দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করছে তখন যেন আমি এ কালেমা অধিক পরিমাণে পাঠ করি। সুতরাং আল্লাহর রহমতে আমি মক্কা বিজয় প্রত্যক্ষ করেছি। এ কারণে এখন (মনোযোগ সহকারে) এ কালেমা নিয়মিত পাঠ করছি।"[১]

তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এবং আসতে যেতে নিম্নের তাসবীহ্ পড়তে থাকতেনঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ অর্থাৎ "আল্লাহ মহাপবিত্র এবং তাঁর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ "আমি একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা নাস্‌র তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ "আল্লাহপাক আমাকে এরকমই আদেশ দিয়েছেন।"

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে প্রায়ই এ সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং রুকূ'তে তিনবার নিম্নের দু'আ পড়তেনঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি মহা পবিত্র। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

---

[১] এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে।

বিজয় অর্থে এখানে মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। আরবের সাধারণ গোত্রগুলোর মধ্যেএ ব্যাপারে কোনই মতানৈক্য হয়নি। আরবের সাধারন গোত্রগুলো অপেক্ষা করছিল যে, যদি মুহাম্মদ (সঃ) স্বজাতির উপর জয়যুক্ত হন এবং মক্কা তাঁর পদানত হয় তবে তিনি যে সত্য নবী এব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)কে মহাবিজয় দান করলেন তখন এরা সবাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এরপর দু'বছর যেতে না যেতেই সমগ্র আরব ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। প্রত্যেক গোত্রের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

সহীহ বুখারীতেও হযরত আমর ইবনে সালমার (রাঃ)এ উক্তি বিদ্যমান রয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সাথে সকল গোত্র ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো। তারা ইসলাম গ্রহণের জন্যে অপেক্ষা করছিল এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলঃ নবী মুহাম্মদ (সঃ)কে এবং তাঁর স্বজাতিকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। যদি মুহাম্মদ (সঃ) সত্য নবী হয়ে থাকেন তবে নিজের জাতির উপর অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন এবং মক্কার উপর তাঁর বিজয় পতাকা উড়বে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের প্রাপ্য।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহর এক প্রতিবেশী সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত জাবির (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সেই প্রতিবেশী মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং নতুন নতুন বিদআতের কথা ব্যক্ত করলে হযরত জাবির (রাঃ)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেনঃ "আমি সরদারে দো জাহান, শাফীউল মুযনিবীন, রহমাতুল লিল আ'লামীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ "লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তারা দলে দলে এই দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে।"

সূরা ঃ নাস্‌র-এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ লাহাব, মাক্কী
(আয়াত ঃ ৫, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعُهَا : ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○

১। ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

٢- مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○

২। তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসেনি।

٣- سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○

৩। অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট নরকানলে প্রবেশ করবে

٤- وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○

৪। এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে,

٥- فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ○ (ع ٥ ٣٦)

৫। তার গলদেশে খর্জুর বল্কলের রজ্জু রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বাতহা' নামক স্থানে গিয়ে একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে "ইয়া সাবা'হা'হ্, ইয়া সাবা'হা'হ্" (অর্থাৎ হে ভোরের বিপদ, হে ভোরের বিপদ) বলে ডাক দিতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কুরায়েশ নেতা সমবেত হলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ "যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, সকালে অথবা সন্ধ্যাবেলায় শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?" সবাই সমস্বরে বলে উঠলোঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করবো।" তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ "শোনো, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির আগমন সংবাদ দিচ্ছি।" আবূ লাহাব তার একথা শুনে বললোঃ "তোমার সর্বনাশ হোক, একথা বলার জন্যেই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছো?" তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, আবূ লাহাব হাত ঝেড়ে নিম্ন লিখিত বাক্য বলতে বলতে চলে গেলঃ

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ অর্থাৎ "তোমার প্রতি সারাদিন অভিশাপ বর্ষিত হোক।" আবূ লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) চাচা। তার নাম ছিল আবদুল উয্যা ইবনে আবদিল মুত্তালিব। তার কুনইয়াত বা ছদ্ম পিতৃপদবীযুক্ত নাম আবূ উৎবাহ ছিল। তার সুদর্শন ও কান্তিময় চেহারার জন্যে তাকে আবূ লাহাব অর্থাৎ শিখা বিশিষ্ট বলা হতো। সে ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকৃষ্টতম শত্রু। সব সময় সে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্যে এবং তাঁর ক্ষতি সাধনের জন্যে সচেষ্ট থাকতো।

হযরত রাবীআ'হ্ ইবনে ইবাদ দাইলী (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ "আমি নবী করীম (সঃ)কে যুল মাজায এর বাজারে দেখেছি, সে সময় তিনি বলছিলেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা বলঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে।" বহু লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনেই গৌরকান্তি ও সুডোল দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দুপাশে সিঁথি করা, সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললোঃ "হে লোক সকল! এ লোক বে-দ্বীন ও মিথ্যাবাদী।" মোটকথা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সুদর্শন এই লোকটি তাঁর বিরুদ্ধে বলতে বলতে যাচ্ছিল। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বললোঃ "এ লোকটি হলো রাসূলুল্লাহর (সঃ) চাচা আবূ লাহাব।"[১]

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাবীআ'হ্ (রাঃ) বলেনঃ "আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম, আমার তখন যৌবন কাল। আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক একটি লোকের কাছে যাচ্ছেন আর লোকদেরকে বলছেনঃ "হে লোক সকল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। তোমরা আমাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করো এবং আমাকে শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করো, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা আমাকে যে কাজের জন্যে প্রেরণ করেছেন সে কাজ আমি করতে পারবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) যেখানেই এ পয়গাম পৌঁছাতেন, পরক্ষণেই আবু লাহাব সেখানে পৌঁছে বলতোঃ "হে অমুক গোত্রের লোকেরা! এ ব্যক্তি তোমাদেরকে লাত, উয্যা থেকে দূরে সরাতে চায় এবং বানু মালিক ইবনে আকইয়াসের ধর্ম থেকে তোমাদেরকে

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

ফিরিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য। সে নিজের আনীত গুমরাহীর প্রতি তোমাদেরকেও টেনে নিতে চায়। সাবধান! তার কথা বিশ্বাস করো না।”

আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় বলছেনঃ আবূ লাহাবের দুই হস্ত ধ্বংস হোক! না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে এসেছে, না তার উপার্জন তার কোন উপকার করেছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তার স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানালেন তখন আবূ লাহাব বলতে লাগলোঃ “যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয় তবে আমি কিয়ামতের দিন আমার ধন সম্পদ আল্লাহকে ফিদিয়া হিসেবে দিয়ে তাঁর আযাব থেকে আত্মরক্ষা করবো।” আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবূ লাহাব তার স্ত্রীসহ জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে। আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরায়েশ নারীদের নেত্রী। তার কুনিয়াত ছিল উম্মু জামীল, নাম ছিল আরওয়া বিনতু হারব ইবনে উমাইয়া। সে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এর বোন ছিল। তার স্বামীর কুফরী, হঠকারিতা এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল সহকারিণী, সহযোগিণী। এ কারণে কিয়ামতের দিন সেও স্বামীর সঙ্গে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। কাঠ বহন করে নিয়ে সে তা ঐ আগুনে নিক্ষেপ করবে যে আগুনে তার স্বামী জ্বলবে। তার গলায় থাকবে আগুনের পাকানো রশি।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকানো রজ্জু। অর্থাৎ সে স্বামীর ইন্ধন সংগ্রহ করতে থাকবে।

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর 'গীবতকারিণী' অর্থও করা হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ অর্থই পছন্দ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বর্ণনা করেছেন যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী জঙ্গল থেকে কাঁটাযুক্ত কাঠ কুড়িয়ে আনতো এবং ঐ কাঠ রাসূলুল্লাহর চলার পথে বিছিয়ে দিতো। এটাও বলা হয়েছে যে, এ নারী রাসুলুল্লাহকে ভিক্ষুক বলে তিরস্কার করতো। এ কারণে তাকে কাষ্ঠ বহনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত কথাই নির্ভুল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, আবূ লাহাবের স্ত্রীর কাছে একটি সুন্দর গলার মালা ছিল সে বলতোঃ “আমি এ মালা বিক্রী করে তা মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরোধিতায় ব্যয় করবো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন

যে, তার গলদেশে থাকবে পাকানো রজ্জু। অর্থাৎ তার গলদেশে আগুনের বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে।

مَسَد শব্দের অর্থ হলো খেজুর গাছের আঁশের রশি। উরওয়া (রঃ) বলেন যে, এটা হলো জাহান্নামের শিকল, যার এক একটি কড়া সত্তর গজের হবে। সওরী (রঃ) বলেন যে, এটা জাহান্নামের শিকল, যা সত্তর হাত লম্বা । জওহরী (রঃ) বলেন যে, এটা উটের চামড়া এবং পশম দিয়ে তৈরি করা হয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা লোহার বেড়ী বা শিকল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর ধাঙ্গড় নারী উম্মু জামীল বিনতু হারব নিজের হাতে কারুকার্য খচিত, রং করা পাথর নিয়ে কবিতা আবৃত্তির সূরে নিম্নলিখিত কথাগুলো বলতে বলতে রাসূলুল্লাহর নিকট আগমন করেঃ

مُذَمِّمًا اَبَيْنَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا ۔ وَاَمْرُهُ عَصَيْنَا ۔

অর্থাৎ "আমি মুযাম্মামের (নিন্দনীয় ব্যক্তির) অস্বীকারকারিণী, তার দ্বীনের দুশমন এবং তার হুকুম অমান্যকারিণী।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সময় কা'বা গৃহে বসেছিলেন। তাঁর সাথে আমার আব্বা হযরত আবূ বকরও (রাঃ) ছিলেন। আমার আব্বা তাকে এ অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে আসছে, আপনাকে আবার দেখে না ফেলে!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমাকে দেখতে পাবেই না।" তারপর তিনি ঐ দুষ্টা নারীকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا

অর্থাৎ "যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার মধ্যে এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে গোপন পর্দা টেনে দিই।" (১৭ ঃ ৪৫) ডাইনী নারী হযরত আবূ বকরের (রাঃ) কাছে এসে দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহও (সঃ) তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পাশেই ছিলেন। কিন্তু কুদরতী পর্দা তার চোখের সামনে পড়ে গেল। সুতরাং সে আল্লাহর রাসূল (সঃ)কে দেখতে পেলো না। ডাইনী নারী হযরত আবূ বকর (রাঃ)কে বললোঃ "আমি শুনেছি যে, তোমার সাথী (সঃ) আমার দুর্নাম করেছে অর্থাৎ কবিতার ভাষায় আমার বদনাম ও নিন্দে করেছে।" হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ "কা'বার প্রতিপালকের শপথ! রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমার কোন নিন্দে করেননি।" আবূ লাহাবের স্ত্রী তখন ফিরে যেতে যেতে বললোঃ "কুরায়েশরা জানে যে, আমি তাদের সর্দারের মেয়ে।"

একবার এ দুষ্টা রমনী নিজের লম্বা চাদর গায়ে জড়িয়ে তাওয়াফ করছিল, হঠাৎ পায়ে চাদর জড়িয়ে পিছনে পড়ে গেল। তখন বললোঃ "মুযাম্মাম ধ্বংস হোক।" তখন উম্ম হাকীম বিনতু আবদিল মুত্তালিব বললোঃ "আমি একজন পূত পবিত্র রমনী। আমি মুখের ভাষা খারাপ করবো না। আমি বন্ধুত্ব স্থাপনকারিণী, কাজেই আমি কলঙ্কিনী হবো না এবং আমরা সবাই একই দাদার সন্তান, আর কুরায়েশরাই এটা সবচেয়ে বেশী জানে।"

আবূ বকর বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যখন تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। তখন আবূ লাহাবের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আগমন করে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বসেছিলেন এবং তাঁর সাথে হযরত আবূ বকরও (রাঃ) ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ যে সে আসছে, আপনাকে সে কষ্ট দেয় না কি!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমাকে দেখতে পাবে না।" অতঃপর আবূ লাহাবের স্ত্রী হযরত আবূ বকর (রাঃ)কে বললোঃ "তোমার সাথী (কবিতার ভাষায়) আমার দুর্নাম রটনা করেছে।" হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন কসম করে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাব্য চর্চা করতে জানেন না এবং তিনি কবিতা কখনো বলেননি।" দুষ্টা নারী চলে যাওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তার চলে না যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন।" কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, উম্মু জামীলের গলায় আগুনের রশি লাগিয়ে দেয়া হবে এবং ঐ রশি ধরে টেনে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর রশি ঢিলে করে তাকে জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে এ শাস্তিই তাকে ক্রমাগতভাবে দেয়া হবে।

ঢোলের রশিকে আরবের লোকেরা مَسَدٌ বলতো। আরবী কবিতায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হতো। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এ সূরা আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-এর নবুওয়াতের একটি উচ্চতর প্রমাণ। আবূ লাহাব এবং তার স্ত্রী দুষ্কৃতির এবং পরিণতির যে সংবাদ এ সূরায় দেয়া হয়েছে। বাস্তবেও তা-ই ঘটেছে। এ দম্পতির ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য হয়নি। তারা প্রকাশ্য বা গোপনীয় কোনভাবেই মুসলমান হয়নি। কাজেই এ সূরাটি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নবুওয়াতের উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সূরা ঃ লাহাব এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ ইখলাস, মাক্কী

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৪, রুকূ ঃ ১)

(اٰيَاتُهَا : ٤، رُكُوْعُهَا : ١)

মুসনাদে আহমদে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা নবী করীম (সঃ)কে বললোঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমাদের সামনে তোমার প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা কর।" তখন আল্লাহ তা'আলা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

صَمَدٌ শব্দের অর্থ হলো যিনি সৃষ্ট হননি। এবং যাঁর সন্তান সন্ততি নেই। কেননা, যে সৃষ্ট হয়েছে সে এক সময় মৃত্যুবরণ করবে এবং অন্যেরা তার উত্তরাধিকারী হবে। আর আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুবরণও করবেন না এবং তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও হবে না। তিনি কারো সন্তান নন এবং তার সমতুল্য কেউই নেই।[১]

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন বেদুইন নবী করিমের (সঃ) নিকট এসে বলেঃ "আমার সামনে আপনার প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা করুন!" তখন আল্লাহ তা'আলা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।[২] অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক জিনিষেরই নিসবত বা সম্বন্ধ রয়েছে, আল্লাহর নিসবত হলো قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ এবং صَمَدٌ তাঁকেই বলা হয় যিনি অন্তসারশূণ্য নন।"[৩]

সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদে নবী করীম (সঃ)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নবী (সঃ) একটি লোকের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে নবী করীম (সঃ)কে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যাঁকে আপনি আমাদের নেতা মনোনীত করেছেন তিনি প্রত্যেক নামাযে কিরআতের শেষে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ

---

১. ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ইমাম ইবনে আবী হাতিমও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন।

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হা'ফিয আবূ ইয়া'লা মুসিলী (রঃ)।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করতেন।” নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ “সে কেন এরূপ করতো তা তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর তো?” তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেনঃ “এ সূরায় আল্লাহর রাহমানুর রাহীমের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, এ কারণে এ সূরা পড়তে আমি খুব ভালবাসি।” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন।”

সহীহ বুখারীর কিতাবুস সলাতে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী মসজিদে কুবার ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তারপর কুরআনের অন্য অংশ পছন্দমত পড়তেন। একদিন মুক্তাদী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “আপনি সূরা ইখলাস পাঠ করেন, তারপর অন্য সূরাও এর সাথে মিলিয়ে দেন, কি ব্যাপার? হয় শুধু সূরা ইখলাস পড়ুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পড়ুন।” আনসারী জবাব দিলেনঃ “আমি যেমন করছি তেমনি করবো, তোমাদের ইচ্ছা হলে আমাকে ইমাম হিসেবে রাখো, না হলে বলো, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিচ্ছি।” মুসল্লীরা দেখলেন যে, এটা মুশকিল ব্যাপার! কারণ উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁরা অন্য কারো ইমামতি মেনে নিতে পারলেন না (সুতরাং তিনিই ইমাম থেকে গেলেন)। একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে গমন করলে মুসল্লীরা তাঁর কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি মুসল্লীদের কথা মানো না কেন? প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস পড় কেন?” ইমাম সাহেব উত্তরে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ সূরার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে।” তাঁর একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ “এ সূরার প্রতি তোমার আসক্তি ও ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।”

মুসনাদে আহমদে ও জামে’ তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরাটিকে ভালবাসি।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ “ তোমার এ ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবে।”

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক অন্য একটি লোককে রাত্রিকালে বারবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ সূরাটি পড়তে শুনে সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। লোকটি

সম্ভবতঃ ঐ লোকটির এ সূরা পাঠকে হালকা সওয়াবের কাজ মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।”

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ “ তোমরা প্রত্যেকেই কি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে না?” সাহাবীদের কাছে এটা খুবই কষ্ট সাধ্য মনে হলো। তাই, তাঁরা বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মধ্যে কার এ ক্ষমতা আছে?” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ “জেনে রেখো যে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।”

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত কাতাদা ইবনে নু'মান (রাঃ) সারা রাত ধরে সুরা ইখলাস পড়তে থাকলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ)কে এটা জানানো হলে তিনি বললেন, “এ সুরা অর্ধেক কুরআন অথবা এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমতুল্য।”

মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এক মজলিসে ছিলেন। তিনি জনগণকে বলেন! “ তোমাদের মধ্যে কারো প্রত্যেক রাত্রে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠের ক্ষমতা আছে কি?” তাঁরা উত্তরে বললেনঃ “আমাদের মধ্যে কার এ ক্ষমতা থাকতে পারে?” তখন তিনি বললেনঃ “জেনে রেখো যে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের (এর সমতূল্য)।” এমন সময় নবী করীম (সঃ) সেখানে এসে পড়লেন এবং হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ)কে এ কথা বলতে শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ “আবূ আইয়ুব (রাঃ) সত্য কথাই বলেছে।”

জামে তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ তোমরা সমবেত হও, আজ আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শোনাবো।” সাহাবীগণ সমবেত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘর থেকে বের হয়ে এসে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ করলেন। তারপর আবার ঘরে চলে গেলেন। সাহাবীরা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে, আমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শোনাবেন, সম্ভবত আকাশ থেকে কোন অহী এসেছে।” এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বের হয়ে এসে বললেনঃ “আমি

তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শোনানোর জন্যে কথা দিয়েছিলাম। জেনে রেখো যে, এই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।”

হযরত আবুদ দারদার (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ “তোমরা কি প্রতিদিন কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে অপারগ?” সাহাবীগণ আরয করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ ব্যাপারে আমরা খুবই দুর্বল এবং অক্ষম।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।”[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোথাও হতে তাশরীফ আনলেন, তাঁর সাথে হযরত আবূ হুরাইরাও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে এ সূরাটি পাঠ করতে শুনে বললেনঃ “ওয়াজিব হয়ে গেছে।” হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “জান্নাত (ওয়াজিব হয়ে গেছে)।”[২]

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “ তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাত্রিকালে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি তিনবার পড়ার ক্ষমতা রাখে না? এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।”[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাঁর পিতা) বলেনঃ “আমরা পিপাসার্ত ছিলাম, চারদিকে রাতের গভীর অন্ধকার, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কখন আসবেন এবং নামায পড়াবেন আমরা তারই অপেক্ষা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সময় এলেন এবং আমার হাত ধরে বললেনঃ “পড়।” আমি নীরব থাকলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেনঃ “পড়।” আমি বললামঃ কি পড়বো? তিনি বললেনঃ “প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে। প্রতিদিন তোমার জন্যে দুই বারই যথেষ্ট।”[৪]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম নাসায়ী (রঃ) বর্ণা করেছেন। এ ধরনের রিওয়াইয়াত সাহাবীদের একটি বড় জামাআত হতে বর্ণিত রয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম নাসায়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান, সহীহ, গারীব বলেছেন।

৩. এ হাদীসটি হাসিম আবূ ইয়ালা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল।

৪. এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম নাসায়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সুনানে নাসাঈর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ “এ তিনটি সূরা পাঠ করলে এগুলো তোমাকে প্রত্যেক জিনিষ হতে রক্ষা করবে।”

মুসনাদে আহমদে হযরত তামীম দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত কালেমা দশবার পাঠ করবে সে চল্লিশ লাখ পুণ্য লাভ করবে।ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ۔

অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, তিনি এক একক, অভাবমুক্ত, তিনি স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, সন্তানও না (অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীও নেই, সন্তানও নেই) এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।”[১]

মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।” এ কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কেউ যদি আরো বেশী বার পাঠ করে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)! বললেন ঃ “আল্লাহ এর চেয়েও অধিক ও উত্তম প্রদানকারী (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বেশীও দিতে পারবেন, তাঁর কোনই অভাব নেই।)”

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ “যে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সুরাটি দশবার পাঠ করবে আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন, যে বিশ বার করবে তার জন্যে তৈরি করবেন জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ এবং যে ব্যক্তি ত্রিশবার পাঠ করবে তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তিনটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।” তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! যদি আমরা এর চেয়েও বেশী বার পড়ি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আল্লাহ এর চেয়েও অধিকদাতা।”[২]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে পঞ্চাশবার, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেন।”[৩]

---

১. হাদীসের একজন বর্ণনাকারী খলীল ইবনে মুররাহ রয়েছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং অন্যান্য ইমাম তাঁকে খুবই দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।

২. এ হাদীসটি মুরসাল এবং উত্তম। দারিমী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি হা'ফিয আবু ইয়া'লা সূসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ দিনে দুইশত বার পাঠ করে তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার পাঁচশত পুণ্য লিখে থাকেন যদি তার উপর কোন ঋণ না থাকে।"[১]

জামে' তিরমিযীর একটি হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ দুইশত বার পাঠ করে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হয়, যদি সে ঋণগ্রস্ত না হয়।"

জামে' তিরমিযীর একটি গারীব বা দুর্বল হাদীসে রয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি ঘুমোবার জন্যে বিছানায় যায়, তারপর ডান পাশ ফিরে শয়ন করতঃ একশতবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করে তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ "হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে চলে যাও।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুইশত বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করে তার দুইশত বছরের পাপ মিটিয়ে দেয়া হয়।"[২]

সুনানে নাসায়ীতে এই সূরার তাফসীরে হযরত বারীদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ কালে দেখেন যে, একটি লোক নামায পড়ছে এবং নিম্নলিখিত দুআ' করছেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۔

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে এ সাক্ষ্যসহ আবেদন করছি যে, আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন, আপনি এমন সত্ত্বা যাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই সত্তার শপথ! এ ব্যক্তি ইস্মে আযমের সাথে দু'আ করেছে। আল্লাহর এই মহান নামের সাথে তাঁর কাছে কিছু যাঞ্চা করলে তিনি তা দান করেন এবং এই নামের সাথে দু'আ করলে তিনি তা কবুল করে থাকেন।"[৩]

---

১. এটাও বর্ণনা করেছেন হাফিয আবূ ইয়ালা সূসিলী (রঃ)। এর সনদও দুর্বল।

২. এ হাদীসটি আবূ বকর বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম নাসায়ী (রঃ) ছাড়াও অন্যান্য আসহাবে সুনানও বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিনটি কাজ এমন রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এগুলো সম্পাদন করে সে জান্নাতের দরজাগুলোর যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে এবং জান্নাতের যে কোন হূরের সাথে ইচ্ছা বিবাহিত হতে পারবে। (এক) যে ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, (দুই) নিজের গোপনীয় ঋণ পরিশোধ করে এবং (তিন) প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে দশবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ করে।" তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! এ তিনটি কাজের যে কোন একটি যদি কেউ করে?" উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "একটি করলেও একই রকম সম্মান সে লাভ করবে।"[১]

হযরত জারীর ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের সময় قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার ঘরের বাসিন্দাদেরকে এবং প্রতিবেশীদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন।"[২]

মুসনাদে আবী ইয়ালায় হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "আমরা তাবুকের যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। সূর্য এমন স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও পরিষ্কারভাবে উদিত হলো যে, ইতিপূর্বে কখনো এমনভাবে সূর্য উদিত হতে দেখা যায়নি। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আজ এ রকম উজ্জ্বল দীপ্তির সাথে সূর্যোদয়ের কারণ কি?" হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "আজ মদীনায় মুআ'বিয়া ইবনে মুআ'বিয়ার (রাঃ) ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁর জানাযার নামাযে অংশগ্রহণের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান থেকে পাঠিয়েছেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ন করলেনঃ "তার কোন্ আমলের কারণে এরূপ হয়েছে?" জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "তিনি দিন রাত সব সময় চলাফেরায় উঠা বসায় সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। আপনি যদি তার জানাযার নামাযে হাজির হতে চান তবে চলুন, আমি জমীন সংকীর্ণ করে দিচ্ছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, তাই ভাল।"

---

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা মূসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি যঈফ বা দুর্বল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইবনে মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর জানাযার নামায আদায় করলেন।"[১]

মুসনাদে আবী ইয়ালায় এ হাদীসের অন্য একটি সনদও রয়েছে। তাতে বর্ণনাকারী ভিন্ন ব্যক্তি। তাতে রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেনঃ "মুআ'বিয়া ইবনে মুআ'বিয়া (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন। আপনি কি তাঁর জানাযার নামায পড়তে চান?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ" হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর পালক দ্বারা জমীনে আঘাত করলেন। এর ফলে সমস্ত গাছ পালা, টিলা ইত্যাদি নিচু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মৃতের জানাযা দেখতে গেলেন। তিনি নামায শুরু করলেন। তাঁর পিছনে ফেরেশতাদের দু'টি কাতার বা সারি ছিল। প্রত্যেক সারিতে সত্তর হাজার ফেরেশতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "মুআ'বিয়ার (রাঃ)-এরূপ মর্যাদার কারণ কি?" জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটির প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা এবং উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে ও আসতে যেতে এ সূরাটি পাঠ করাই তাঁর এ মর্যাদার কারণ।"[২]

মুসনাদে আহমদে হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করে বললামঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মুমিনের মুক্তি কোন আমলে রয়েছে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হে উকবা' (রাঃ) জিহবা সংযত রেখো, নিজের ঘরেই বসে থাকো এবং নিজের পাপের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি করো।" পরে দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি নিজেই আমার সাথে করমর্দন করে বললেনঃ হে

---

[১] এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর বায়হাকীও (রঃ) তাঁর 'দালাইলুন নবুওয়াত' নামক গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনে হারুণের (রঃ) রিওয়াইয়াতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ (রঃ) আ'লা ইবনে মুহাম্মদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এই আ'লা মাওযূ হাদীস বর্ণনা করে থাকেন বলে তাঁর নামে অভিযোগ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

[২] এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকীও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তাঁর এ হাদীসের সনদে মাহবুব ইবনে হিলাল রয়েছেন। আবূ হাতিম রাযী (রঃ) বলেন যে, ইনি বর্ণনাকারী হিসেবে মাশহূর নন। মুসনাদে আবী ইয়ালায় বর্ণিত এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইনি নন, সেখানে এর স্থলে আবূ আবদিল্লাহ ইবনে মাসউদ রয়েছেন। কিন্তু মাহবুব ইবনে হিলালের বর্ণনাই যথার্থ বলে মনে হয়। কারণ আবূ আবদিল্লাহ ইবনে মাহবুব রিওয়াইয়াতের আরো বহু সনদ রয়েছে এবং সব সনদই যঈফ বা দুর্বল।

‘উকবা’ (রাঃ) আমি কি তোমাকে তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর এবং কুরআনে অবতীর্ণ সমস্ত সূরার মধ্যে উৎকৃষ্ট সূরার কথা বলবো?” আমি উত্তর দিলামঃ “হ্যাঁ” হে আল্লাহ রাসূল (সঃ)! অবশ্যই বলুন, আপনার প্রতি আল্লাহর আমাকে উৎসর্গিত করুন! তিনি তখন আমাকে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, এবং সূরা নাস পাঠ করালেন, তারপর বললেনঃ “হে উকবা’ (রাঃ)“ এ সুরাগুলো ভুলো না। প্রতিদিন রাত্রে এগুলো পাঠ করো।” হযরত উকবা’ (রাঃ) বলেনঃ এরপর থেকে আমি এ সূরাগুলোর কথা ভুলিনি এবং এগুলো পাঠ করা ছাড়া আমি কোন রাত্রি কাটাইনি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং ত্বরিৎ তাঁর হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে আরয করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে উত্তম আমলের কথা বলে দিন। তখন তিনি বললেনঃ “শোনো, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তুমি তার সাথে সম্পর্ক মিলিত রাখবে, যে তোমাকে বঞ্চিত করবে তুমি তাকে দান করবে। তোমার প্রতি যে যুলুম করবে তুমি তাকে ক্ষমা করবে।”[১]

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রিকালে যখন বিছানায় যেতেন তখন এ তিনটি সূরা পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে, এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন।[২]

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
১। বলঃ তিনিই আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়,	١- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○
২। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী;	٢- اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○
৩। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন,	٣- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ○
৪। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।	٤- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○ ع

---

[১] এ হাদীসের কিছু অংশ ইমাম তিরমিযী (রঃ) তাঁর জামে তিরমিযীতে ‘যুহদ’ শীর্ষক অধ্যায়ে সংযোজন করেছেন এবং বলেছেন যে, এ হাদীসটি হাসান। মুসনাদে আহমদেও এ হাদীসের আরেকটি সনদ রয়েছে।

[২] এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদেও বর্ণিত হয়েছে।

এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (শানে নুযূল) পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ইয়াহূদিরা বলতোঃ আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) উযায়ের (আঃ)-এর উপাসনা করি।” আর খৃষ্টানরা বলতোঃ “আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) ঈসার (আঃ) পূজা করি।” মাজূসীরা বলতোঃ “আমরা চন্দ্র সূর্যের উপাসনা করি।” আবার মুশরিকরা বলতোঃ আমরা মূর্তি পুজা করি।” আল্লাহ তা'আলা তখন এই সূরা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলোঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর মত আর কেউই নেই। তাঁর কোন উপদেষ্টা অথবা উযীর নেই। তিনি একমাত্র ইলাহ্ বা মাবূদ হওয়ার যোগ্য। নিজের গুণ বিশিষ্ট ও হিকমত সমৃদ্ধ কাজের মধ্যে তিনি একক ও বে-নযীর। তিনি সামাদ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী। সমস্ত মাখলুক, সমগ্র বিশ্বজাহান তাঁর মুখাপেক্ষী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ‘সামাদ’ তাঁকেই বলে যিনি নিজের নেতৃত্বে, নিজের মর্যাদায়, বৈশিষ্ট্যে, নিজের বুযর্গীতে, শ্রেষ্ঠত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিকমতে, বুদ্ধিমত্তায় সবারই চেয়ে অগ্রগণ্য। এই সব গুণ শুধুমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনি পূত পবিত্র মহান সত্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবারই উপর বিজয়ী, তিনি বেনিয়ায। ‘সামাদ’ এর একটা অর্থ এও করা হয়েছে যে, ‘সামাদ’ হলেন তিনি যিনি সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকেন। যিনি চিরন্তন ও চিরবিদ্যমান। যাঁর লয় ও ক্ষয় নেই এবং যিনি সব কিছু হিফাযতকারী। যাঁর সত্তা অবিনশ্বর এবং অক্ষয়।

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, صَمَدٌ সেই সত্তা যিনি কোন কিছু আহারও করেন না। এবং যাঁর মধ্য হতে কোন কিছু বেরও হয় না। আর যিনি কাউকেও বের করেন না। অর্থাৎ তিনি কাউকেও জন্ম দেন না। তাঁর কোন সন্তান সন্ততি নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। তাঁর পিতা মাতা নেই। এ তাফসীর খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে উপরোক্ত বর্ণনা উল্লিখিত রয়েছে। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী' থেকে বর্ণিত আছে যে, সামাদ এমন জিনিষকে বলা হয় যা অন্তঃসার শূন্য নয়, যার পেট নেই। শা'বী (রঃ) বলেন যে, ‘সামাদ’ এর অর্থ হলো যিনি পানাহার করেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ্ (রঃ) বলেন যে, "সামাদ' এমন নূরকে বলা হয় যা উজ্জ্বল, রওশন ও দীপ্তিময়।

একটি মারফূ' হাদীসেও রয়েছে যে, 'সামাদ' এমন এক সত্তা যাঁর পেট নেই। অর্থাৎ যিনি আহারের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটি মারফূ' নয়, বরং মাওকুফ।

হাফিয আবূল কাসিম তিবরানী (রঃ) তাঁর আস সুন্নাহ্ গ্রন্থে 'সামাদ' এর উপরোক্ত সব তাফসীর উল্লেখ করে লিখেছেন যে, আসলে এ সব কথাই সত্য ও সঠিক। উল্লিখিত সমস্ত গুণ এবং বৈশিষ্ট্য আমাদের মহান প্রতিপালকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড়। তাঁর আহারের প্রয়োজন নেই। সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি চিরন্তন। তাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই। তিনি অবিনশ্বর।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহর সন্তান সন্ততি নেই, পিতা মাতা নেই, স্ত্রী নেই। যেমন কুরআন কারীমের অন্যত্র রয়েছেঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَّخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۔

অর্থাৎ "তিনি আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা, কি করে তাঁর সন্তান হতে পারে? তাঁর তো স্ত্রী নেই, সকল জিনিষ তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন!" (৬ ঃ ১০১) অর্থাৎ তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক, এমতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টি ও মালিকানায় সমকক্ষতার দাবীদার কে হবে? অর্থাৎ তিনি উপরোক্ত সমস্ত আয়েব থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন কুরআনের অন্যত্র রয়েছেঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۔ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۔ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۔ وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۔ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۔ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۔ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۔

অর্থাৎ "তারা বলেঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছো; এতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে

শোভনীয় নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। আর কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।” (১৯ঃ ৮৮-৯৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ - لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ “তারা বলে যে, দয়াময়, সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, বরং তারা তাঁর সম্মানিত বান্দা। কথার দিক থেকেও এই বান্দাসমূহ আল্লাহকে অতিক্রম করে না, বরং তারা আল্লাহর ফরমান যথারীতি পালন করে।” (২১ ঃ ২৬-২৭) আল্লাহ পাক আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ - سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ -

অর্থাৎ “তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছে। অথচ জ্বিনেরা জানে তাদেরকে ও শাস্তির জন্যে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের বর্ণিত দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।” (৩৭ ঃ ১৫৮-১৫৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, কষ্টদায়ক কথা শুনে এতো বেশী ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। মানুষ বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে, তবুও তিনি তাকে অন্ন দান করছেন, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করছেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আদম সন্তান আমাকে অবিশ্বাস করে, অথচ এটা তার জন্যে সমীচীন নয়। সে আমাকে গালি দেয়, অথচ এটাও তার জন্যে সমীচীন ও সঙ্গত নয়। তারা আমাকে অবিশ্বাস করে বলে যে, আমি নাকি প্রথমে তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছি পরে আবার সেভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবো না। অথচ দ্বিতীয়বারের সৃষ্টির চেয়ে প্রথমবারের সৃষ্টি তো সহজ ছিল না। যদি আমি প্রথমবারের সৃষ্টিতে সক্ষম হয়ে থাকি তবে দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিতে সক্ষম হবো না কেন?” আর সে আমাকে গালি দিয়ে বলে যে, আমার নাকি সন্তান রয়েছে, অথচ আমি একাকী, আমি অদ্বিতীয়, আমি অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। আমার কোন সন্তান সন্ততি নেই। আমার পিতা মাতা নেই, এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই।”

সুরা ঃ ইখলাস এর তাফসীর সমাপ্ত

سُوْرَتَيِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

আশ্রয় প্রার্থনা করার দুইটি সূরা

হযরত যার ইবনে জায়েশ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে বলেনঃ "হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ সূরা দুটিকে (সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে) কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলেন না।" তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেনঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেনঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ বলুন।" তিনি তা বললেন। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বললেনঃ "আপনি قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলুন।" তিনি তা বললেন। সুতরাং আমরা ওটাই বলি যা নবী করীম (সঃ) বলেছেন।"[১]

মুসনাদে আবী ইয়ালা প্রভৃতি কিতাবে উল্লিখিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ দুটি সূরাকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলে লিখেননি। এবং এগুলোকে কুরআনের অংশ বলে মনে করতেন না। কারী এবং ফকীহ্দের নিকট প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এদু'টি সূরাকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে লিখতেন না। সম্ভবতঃ তিনি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে শুনেননি। তারপর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর কথা থেকে ফিরে জামাআতের মতামতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম এ দু'টি সূরাকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার নুসখাহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "তোমরা কি দেখোনি যে, ঐ রাত্রে আমার উপর এমন কতকগুলো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যেমন আয়াত আর কখনো অবতীর্ণ হয়নি।" তারপর তিনি এ সূরা দু'টি তিলাওয়াত করেন।[২]

মুসনাদে আহমদে হযরত উকবাহ ইবনে আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "আমি মদীনার গলি পথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁর উটের

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়াইয়াত সহীহ বুখারীতেও বর্ণিত হয়েছে।

[২] এহাদীসটি মুসনাদে আহমদে জামে' তিরমিযী এবং সুনানে নাসায়ীতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

লাগাম ধরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি আমাকে বললেনঃ “এসো এবার তুমি আরোহণ করো।” আমি চিন্তা করলাম যে, তাঁর কথা না শোনা অবাধ্যতা হবে, তাই আরোহণ করতে সম্মত হলাম। কিছুক্ষণ পর আমি নেমে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরোহণ করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ “ হে উকবাহ (রাঃ)আমি কি তোমাকে দু’টি উৎকৃষ্ট সূরা শিখিয়ে দিবো না?” আমি আরয করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) হ্যাঁ, অবশ্যই আমাকে শিখিয়ে দিন! তখন তিনি আমাকে قُلْ اَعُــوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পাঠ করালেন। অতঃপর উট হতে নেমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়ালেন এবং নামাযে এ সূরা দু’টি পাঠ করলেন তারপর তিনি আমাকে বললেন! হে উকবাহ (রাঃ)! আমি সূরা দু’টি পাঠ করেছি তা তুমি লক্ষ্য করেছো তো? শোনো, ঘুমোবার সময় এবং দাঁড়ানোর সময় এ সূরা দু’টি পাঠ করবে।”[১]

মুসনাদে আহ্‌মদের অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উকবাহ ইবনে আ’মিরকে (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের শেষে এ দু’টি সূরা তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হে উকবাহ্ (রাঃ) তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করার এ সূরা দু’টি পাঠ করো, কেননা এ দু’টি সূরার মত সূরা তুমি কখনো পড়বেই না”

হযরত উকবাহ্ ইবনে আ’মির (রাঃ) সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উটের উপর তিনিও আরোহণ করেছিলেন। ঐ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হযরত উকবাহ (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা দু’টি আমার কাছে তিলাওয়াত করার পর আমাকে তেমন আনন্দিত হতে না দেখে বলেনঃ “সম্ভবতঃ তুমি এ সূরা দু’টিকে খুব সাধারন সূরা মনে করেছো। জেনে রেখো যে, নামাযে পড়ার ক্ষেত্রে এ সূরা দুটির মত কিরআত আর নেই।”

সুনানে নাসাঈতে রয়েছে যে, এ দু’টি সূরার মত সূরা কোন আশ্রয় প্রার্থীর জন্যে আর নেই।

---

১. জামে’ তিরমিযী, সুনানে আবী দাউদ এবং সুনানে নাসায়ীতেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটিও সুনানে আবী দাউদ, জামে’ তিরমিযী এবং সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে গারীব বা দুর্বল বলেছেন।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উকবাহ্র (রাঃ) দ্বারা এ সূরা দু'টি পাঠ করিয়ে নেয়ার পর বললেন, আশ্রয় প্রার্থনার মত সূরা এ দু'টি সূরার মত আর নেই।"

এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সূরা দু'টি ফজরের নামাযে পাঠ করেন।

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, হযরত উকবাহ ইবনে আ'মির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাহনের পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর পায়ে হাত রেখে বলছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সূরা হূদ অথবা সূরা ইউনুস শিখিয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "সূরা ফালাক অপেক্ষা অধিক উপকার দানকারী কোন সূরা আর নেই।[১]

আর একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলেনঃ আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে এ দু'টি সূরার চেয়ে উত্তম আর কোন সূরা নেই।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দু'টি সূরা এবং সূরা ইখলাস সম্পর্কে বলেছেনঃ "চারটি আসমানী কিতাবে এ তিনটির মত সূরা আর একটিও অবতীর্ণ হয়নি।

মুসনাদে আহমদে হযরত আ'লা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেনঃ আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। সওয়ারীর সংখ্যা ছিল কম, তাই পালাক্রমে আমরা আরোহণ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ)একজন সাহাবীর মাথায় হাত রেখে তাঁকে একটি সূরা পড়ালেন এবং বললেনঃ "নামায পড়ার সময় এ সূরা দু'টি (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করবে।" সম্ভবতঃ ঐ সাহাবীর নাম উকবাহ ইবনে আ'মিরই (রাঃ) হবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আবদুল্লাহ আসলামী ইবনে আনীস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বুকে হাত দিয়ে বললেনঃ "বলো।" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কি বলবেন তা বুঝতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় বললেন। "বলো।" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَـدٌ বললেন। রাসূলুল্লাহ

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(সঃ) আবার বললেনঃ "বলো।" হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ বললেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় বললেনঃ "বলো।" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বললেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এভাবেই আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আশ্রয় প্রার্থনা করার মত এ রকম সূরা আর নেই।"

সুনানে নাসায়ীর অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত জাবির (রাঃ)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সূরা দু'টি পাঠ শুনলেন। তারপর বললেন এগুলো পড়তে থাকবে। পড়ার মত এ রকম সূরা আর পাবে না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রিকালে যখন বিছানায় যেতেন তখন তিনি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে হাতের উভয় তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা দেহের যতোটুকু উভয় হাতের নাগালে পাওয়া যায় ততোটুকু পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাত ফিরাতেন।

ইমাম মালিক (রাঃ)-এর 'মুআত্তা' গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন অসুস্থ হতেন তখন এ দু'টি সূরা পাঠ করে তিনি সারা দেহে ফুঁ দিতেন। রাসূলুল্লাহর (সঃ) অসুস্থতা যখন মারাত্মক হয়ে যেতো তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) আউযুবিল্লাহ পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হস্তদ্বয় তাঁরই সারা দেহে ফিরাতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এরূপ করার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র ও বরকতময় হাতের স্পর্শ তারই দেহে পৌঁছিয়ে দেয়া।

এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জ্বিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এ দু'টি সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এ সূরা দু'টিকে গ্রহণ করেন এবং বাকি সব ছেড়ে দেন।[১]

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসায়ী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সূরা ঃ ফালাক, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৫, রুকূ’ ঃ ১)

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعُهَا : ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ

১। বলঃ আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার

٢- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ

২। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে,

٣- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ

৩। অনিষ্ট হতে রাত্রির যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়;

٤- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ

৪। এবং ঐ সব নারীর অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকায় দেয়

٥- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ع

৫। এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।

ع ١ ٥ ٣٨

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, فَلَق সকাল বেলাকে বলা হয়। আওফী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণনা করেছেন। কুরআন কারীমেরই অন্য জায়গায় فَالِقُ الْاِصْبَاحِ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, فلق এর অর্থ হলো মাখলুক। হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) বলেন যে, فَلَق হলো জাহান্নামের একটি জায়গা। ঐ জায়গার দরজা খোলা হলে তথাকার আগুনের উত্তাপ এবং ভয়াবহতায় জাহান্নামের সমস্ত অধিবাসী চীৎকার করতে শুরু করে। একটি মারফূ’ হাদীসেও উপরোক্ত হাদীসেরই প্রায় অনুরূপ উক্তি রয়েছে। কিন্তু ওটাকে মুনকার হাদীস বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, فَلَق জাহান্নামের নাম। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, প্রথমটিই সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য উক্তি। অর্থাৎ فَلَق এর অর্থ হলো সকাল বেলা। ইমাম বুখারীও (রঃ) একথাই বলেছেন এবং এটাই নির্ভুল।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতার মধ্যে জাহান্নাম, ইবলীস ও ইবলীসের সন্তান সন্ততিও রয়েছে। غَاسِقٍ এর অর্থ হলো রাত। اِذَا وَقَبَ এর অর্থ হলো সূর্যাস্ত।

অর্থাৎ যখন অন্ধকার রাত উপস্থিত হয়। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, আরবের লোকেরা সুরাইয়া নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়াকে غَاسِقٍ বলে। অসুখ এবং বিপদ আপদ সুরাইয়া নক্ষত্র উদিত হওয়ার পর বৃদ্ধি পায় এবং ঐ নক্ষত্র অস্তমিত হওয়ার পর অসুখ বিপদ আপদ কেটে যায়।

একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, غَاسِقٍ হলো নক্ষত্রের নাম। কিন্তু এ হাদীসের মারফু' হওয়ার কথা সত্য নয়। কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, غَاسِقٍ এর অর্থ হলো চাঁদ। তাফসীরকারদের দলীল হলো মুসনাদে আহমদে বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাত ধরে চাঁদের প্রতি ইশারা করে বললেনঃ "আল্লাহর কাছে ঐ غَاسِقٍ এর অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। উভয় উক্তির মধ্যে সহজেই সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে বলা যেতে পারে যে, এটা হলো চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি এবং নক্ষত্ররাজির আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। এসব কিছু রাত্রিকালেই হয়ে থাকে এবং যখন রাত্রির আগমন ঘটে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

গ্রন্থিসমূহের উপর পড়ে পড়ে ফুঁৎকারকারিণীরা অর্থাৎ যাদুকর নারীগণ।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যেই মন্ত্র পাঠ করে সাপে কাটা রোগীর উপর ফুঁ দেয়া হয় এবং ভূত প্রেত তাড়ানোর জন্যে ফুঁ দেয়া হয় এগুলো শিরকের খুবই কাছাকাছি। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনি কি রোগাক্রান্ত?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেন "হ্যাঁ" হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন নিম্নের দু'আ দু'টি পাঠ করেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ

অর্থাৎ "আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি সেই সব রোগের জন্যে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্ট ও কুদৃষ্টি হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন।" এই রোগ দ্বারা সম্ভবতঃ ঐ রোগকেই বুঝানো হয়েছে যে রোগে তিনি যাদুকৃত হওয়ার পর আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)কে সুস্থতা ও আরোগ্য দান করেন। এতে হিংসুটে ইয়াহূদীদের যাদুর প্রভাব নস্যাৎ হয়ে যায়। তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ব্যর্থ

করে দেয়া হয়। তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে যাদু করা সত্ত্বেও তিনি যাদুকারীদেরকে কোন কটু কথা বলেননি এবং ধমকও দেননি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)কে সুস্থতা ও আরোগ্য দান করেন।

মুসনাদে আহমদে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) এর উপর একজন ইয়াহূদী যাদু করেছিল। এই কারণে নবী (সঃ) কয়েকদিন পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে জানান যে, অমুক ইয়াহূদী তাঁর উপর যাদু করেছে এবং অমুক অমুক কুঁয়ায় গ্রন্থি বেঁধে রেখেছে। সুতরাং তিনি যেন কাউকে পাঠিয়ে ঐ গ্রন্থি খুলিয়ে আনেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোক পাঠিয়ে তখন কুঁয়া থেকে ঐ যাদু বের করিয়ে আনান এবং গ্রন্থিখুলে ফেলেন। ফলে যাদুর প্রভাব কেটে যেতে শুরু করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ইয়াহূদীকে এ সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। এবং তাকে দেখে কখনো মুখও মলিন করেননি।

সহীহ বুখারীতে কিতাবুত তিব্বে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যাদু করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ভেবেছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গিয়েছেন, অথচ তিনি তাঁদের কাছে যাননি। হযরত সুফইয়ান (রঃ) বলেন যে, এটাই যাদুর সবচেয়ে বড় প্রভাব। এ অবস্থা হওয়ার পর একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! আমি আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছি এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন। দু'জন লোক আমার কাছে আসেন। একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসেন আমার কাছে অর্থাৎ শিয়রে যিনি বসেছিলেন, তিনি দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এর অবস্থা কি?" দ্বিতীয়জন উত্তরে বললেনঃ "এঁর উপর যাদু করা হয়েছে।" প্রথম জন প্রশ্ন করলেনঃ "কে যাদু করেছে?" দ্বিতীয়জন জবাব দিলেনঃ "লুবাইদ ইবনে আ'সাম। সে বানূ যুরাইক গোত্রের লোক। সে ইয়াহূদীদের মিত্র এবং মুনাফিক।" প্রথম জন জিজ্ঞেস করলেনঃ "কিসের মধ্যে যাদু করেছে?" দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেনঃ "মাথার চুলে ও চিরুণীতে।" প্রথমজন প্রশ্ন করলেনঃ 'কোথায়, তা দেখাও।" দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেনঃ "খেজুর গাছের বাকলে, পাথরের নিচে এবং যারওয়ান কূপে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ কূপের কাছে গমন করলেন এবং তা থেকে ওসব বের করলেন। ঐ কূপের পানি ছিল যেন মেহদীর রঙ। ওর পাশের খেজুর গাছগুলোকে ঠিক শয়তানের মাথার মত মনে হচ্ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)ঃ এ কাজের জন্যে তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ

(সঃ) একথা শুনে বললেনঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি আমাকে নিরাময় করেছেন ও সুস্থতা দিয়েছেন। আমি মানুষের মধ্যে মন্দ ছড়ানো পছন্দ করি না।"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন একটা কাজ করেননি। অথচ তাঁর মনে হতো যে, তিনি ওটা করেছেন। এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশক্রমে ঐ কূপে মাটি ভর্তি করে দেয়া হয়। এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ছয় মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সঃ) এরূপ অবস্থা ছিল।

তাফসীরে সা'লাবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীদের একটা ছেলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমত করতো। ঐ ছেলেটিকে ফুসলিয়ে ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কয়েকটি চুল এবং তাঁর চুল আঁচড়াবার চিরুনীর কয়েকটি দাঁত হস্তগত করে। তারপর তারা ওগুলোতে যাদু করে। এ কাজে সবচেয়ে বেশী সচেষ্ট ছিল লুবাইদ ইবনে আ'সাম। এরপর যাদুর গ্রন্থি বানূ যুরাইক যারওয়ান নামক কূপে স্থাপন করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর স্ত্রীদের কাছে গমন না করেও তাঁর মনে হতো যে তিনি তাঁদের কাছে গমন করেছেন। এইমন ভুলো অবস্থা দূরীকরণের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু এরকম অবস্থা হওয়ার কারণ তাঁর জানা ছিল না। ছয় মাস পর্যন্ত ঐ একই অবস্থা চলতে থাকে। তারপর উপরোল্লিখিত ঘটনা ঘটে। দুজন ফেরেশতা এসে কথোপকথনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত আলী (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আম্মার (রাঃ)কে পাঠিয়ে কূপ থেকে যাদুর গ্রন্থিগুলো বের করিয়ে আনেন। ঐ যাদুকৃত জিনিষগুলোর মধ্যে একটি ধনুকের রজ্জু ছিল, তাতে ছিল বারোটি গ্রন্থি বা গেরো। প্রত্যেক গেরোতে একটি করে সূঁচ বিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সূরা দু'টির এক একটি আয়াত পাঠ করছিলেন আর ঐ গ্রন্থিসমূহ একটি একটি করে আপনা আপনি খুলে যাচ্ছিল। সূরা দু'টি পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত গেরোই খুলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এদিকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপরোল্লিখিত দু'আ পাঠ করেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি ঐ নরাধমকে ধরে হত্যা করে ফেলবো না?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "না, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি মানুষের মধ্যে অনিষ্ট ও বিবাদ ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাই না।"[১]

---

১. এ বর্ণনায় গারাবাত ও নাকারাত রয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ঃ নাস, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৫, রুকূ’ ঃ ১)

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعُهَا : ١)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○

১। বলঃ আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের,

٢- مَلِكِ النَّاسِ ○

২। যিনি মানবমণ্ডলীর রাজা বা অধিপতি;

٣- اِلٰهِ النَّاسِ ○

৩। যিনি মানবমণ্ডলীর উপাস্য;

٤- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○

৪। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে,

٥- الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○

৫। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,

٦- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○ ع

৬। জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।

এ সূরায় মহা মহিমান্বিত আল্লাহর তিনটি গুণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি হলেন পালনকর্তা, শাহানশাহ এবং মা’বূদ বা পূজনীয়। সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর মালিকানাধীন এবং সবাই তাঁর আনুগত্য করছে। তিনি তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মা’বূদের, পশ্চাদাপসরণকারীর অনিষ্ট হতে যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দিয়ে থাকে। চাই সে জ্বিন হোক অথবা মানুষ হোক। অর্থাৎ যারা অন্যায় ও খারাপ কাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে চোখের সামনে হাজির করে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করার কাজে যারা অতুলনীয়। আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই শুধু তাদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেতে পারে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের প্রত্যেকের সাথে একজন করে শয়তান রয়েছে।”

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আপনার সাথেও কি শয়তান রয়েছে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ আমার সঙ্গেও শয়তান রয়েছে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঐ শয়তানের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেছেন, কাজেই আমি নিরাপদ থাকি। সে আমাকে পুণ্য ও কল্যাণের শিক্ষা দেয়।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়া (রাঃ) তাঁর সাথে রাতের বেলায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)ও তাঁকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। পথে দু'জন আনসারীর সাথে দেখা হলো। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে তাঁর স্ত্রীকে দেখে দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদেরকে থামালেন এবং বললেনঃ "জেনে রেখো যে, আমার সাথে যে মহিলাটি রয়েছে এটা আমার স্ত্রী সফিয়া বিনতে হুইয়াই (রাঃ)।" তখন আনসারী দু'জন বললেনঃ "আল্লাহ্ পবিত্র। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। এ কথা আমাদেরকে বলার প্রয়োজনই বা কি ছিল?" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "মানুষের রক্ত প্রবাহের স্থানে শয়তান ঘোরাফেরা করে থাকে। সুতরাং আমি আশংকা করছিলাম যে, শয়তান তোমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয় না কি।"

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন' "শয়তান তার হাত মানুষের অন্তকরণের উপর স্থাপন করে রেখেছে। মানুষ যখন আল্লাহ্র ইবাদত করে তখন সে নিজের হাত মানুষের অন্তকরণ থেকে সরিয়ে নেয়। আর যখন মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায় তখন শয়তান মানুষের অন্তকরণের উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটাই শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা এবং এটাই ওয়াসওয়াসাতুল খান্নাস।"[১]

মুসনাদে আহমাদে এমন একজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যিনি গাধার পিঠে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। গাধা একটু হোঁচট খেলে ঐ সাহাবী বলে ওঠেনঃ "শয়তান ধ্বংস হোক।" তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "এভাবে বলো না, এতে শয়তান আরো বড় হয়ে যায়, আরো এগিয়ে আসে এবং বলেঃ 'আমি নিজের শক্তি দ্বারা তাকে কাবু করেছি।' আর যদি বিসমিল্লাহ বলো তবে সে ছোট হতে হতে মাছির মতে হয়ে যায়।" এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র স্মরণে শয়তান পরাজিত ও নিস্তেজ হয়ে যায়। আর আল্লাহ্কে বিস্মরণ হলে সে বড় হয়ে যায় ও জয়যুক্ত হয়।

---

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূইয়া'লা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব বা দুর্বল।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে শয়তান তার কাছে যায় এবং আদর করে তার গায়ে হাত বুলাতে থাকে, যেমন মানুষ গৃহপালিত পশুকে আদর করে। ঐ আদরে লোকটি চুপ করে থাকলে শয়তান তার নাকে দড়ি বা মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়।" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেনঃ "তোমরা স্বয়ং নাকে দড়ি লাগানো এবং মুখে লাগাম পরিহিত লোককে দেখতে পাও। নাকে দড়ি লাগানো হলো ঐ ব্যক্তি যে এক দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করে না। আর মুখে লাগাম পরিহিত হলো ঐ ব্যক্তি যে মুখ খুলে রাখে এবং আল্লাহ্র যিক্র করে না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, শয়তান আদম সন্তানের মনে তার থাবা বসিয়ে রাখে। মানুষ যেখানেই ভুল করে এবং উদাসীনতার পরিচয় দেয় সেখানেই সে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। আর যেখানে মানুষ আল্লাহ্কে স্মরণ করে সেখানে সে পশ্চাদাপসরণ করে।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, সুখ-শান্তি এবং দুঃখ কষ্টের সময় শয়তান মানুষের মনে ছিদ্র করতে চায়। অর্থাৎ তাকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। এ সময়ে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে তবে শয়তান পালিয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শয়তানকে মানুষ যেখানে প্রশ্রয় দেয় সেখানে সে মানুষকে অন্যায় অপকর্ম শিক্ষা দেয়, তারপর কেটে পড়ে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ মানব মণ্ডলীর অন্তর সমূহে কুমন্ত্রণা দেয়। نَاسٌ শব্দের অর্থ মানুষ। তবে এর অর্থ জ্বিনও হতে পারে। কুরআন কারীমের অন্যত্র রয়েছেঃ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ অর্থাৎ জ্বিনের মধ্য হতে কতকগুলো লোক। কাজেই জ্বিনসমূহকে ناس শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত নয়। মোটকথা, শয়তান জ্বিন এবং মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে)। অর্থাৎ এরা কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে, চাই সে জ্বিন হোক অথবা মানুষ হোক। এর তাফসীর এরূপও করা হয়েছে। মানব ও দানব শয়তানরা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا -

অর্থাৎ “এভাবেই আমি মানবরূপী অথবা দানবরূপী শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি। একজন অন্যজনের কানে ধোকা-প্রতারণামূলক কথা সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যক্ত করে।” (৬ ঃ ১১২)

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হাজির হন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবূ যার (রাঃ) তাঁর পাশে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আবূ যার (রাঃ)! তুমি নামায পড়েছো কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “জ্বী, না।” তখন তিনি বললেনঃ “তা হলে উঠে নামায পড়ে নাও।” হযরত আবূ যার (রাঃ) উঠে নামায পড়লেন। তারপর বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ “হে আবু যার (রাঃ) মানবরূপী শয়তান হতে এবং দানবরূপী শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।” হযরত আবূ যার (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান আছে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হ্যাঁ”, হযরত আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) নামায কি?” তিনি জবাবে বললেনঃ “নামায খুব ভাল কাজ। যার ইচ্ছা কম পড়তে পারে এবং যার ইচ্ছা বেশী পড়তে পারে।” হযরত আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। রোযা কি?” তিনি জবাব দিলেনঃ “যথেষ্ট হওয়ার মত একটি ফরজ কাজ। আল্লাহর কাছে এর জন্যে বহু পুরস্কার রয়েছে।” হযরত আবূ যার (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ “সাদকা কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “সাদকা এমনই জিনিষ যার বিনিময় বহুগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে।” হযরত আবূ যার (রাঃ) আরয করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। কোন্ সাদকা সবচেয়ে উত্তম?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিলেনঃ “সম্পদ কম থাকা সত্ত্বেও সাদকা করা, অথবা চুপে চুপে কোন ফকীর মিসকীন ও দুঃখী জনের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।” হযরত আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন?” তিনি জবাবে বললেনঃ “হযরত আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম নবী।” হযরত আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হযরত আদম (আঃ) কি নবী

ছিলেন?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেনঃ “হ্যাঁ, তিনি নবী ছিলেন, এবং এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁর সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কথাবার্তা বলেছেন।” হযরত আবূ যার (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। রাসূল কত জন ছিলেন?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “তিনশত দশের কিছু বেশী, বলা যায় একটি বড় জামাআ'ত।” আবার এও বললেনঃ “তিনশত পনেরো।” হযরত আবূ যার (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার প্রতি নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আয়াত কোনটি?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেনঃ “আয়াতুল কুরসী অর্থাৎ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ - এই আয়াতটি।”[১]

মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার মনে এমন সব চিন্তা আসে যেগুলো প্রকাশ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় (সুতরাং এ অবস্থায় আমি কি করবো?)। নবী (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “(তুমি বলবে)ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَدَّ كَیْدَهٗ اِلَی الْوَسْوَسَةِ -

অর্থাৎ “আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যিনি শয়তানের প্রতারণাকে ওয়াস্ওয়াসা অর্থাৎ শুধু কুমন্ত্রণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, বাস্তবে কার্যে পরিণত করেননি।”

সূরা ফালাক ও নাস এর তাফসীর সমাপ্ত

আমপারাসহ পুরো “তাফসীরে ইবনে কাসীর” শেষ হলো। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা সারাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমীন!

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম নাসায়ীও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইমাম আবূ হাতিম ইবনে হিব্বানও (রঃ) অন্য সনদে এ হাদীসটি দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ)

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফ্সীর শাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, মুয়াররিখ, ফকীহ, ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল পারদর্শিতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই মর-জগতের বুকে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং যেসব মনীষী পবিত্র কুরআন। হাদীস তথা শাশ্বত সুন্নাহ্র বিজয় নিকেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তন্মধ্যে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর প্রকৃত নাম ইসামঈল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম এবং ইমাদুদ্দীন (ধর্মের স্তম্ভ) তাঁর উপাধি। সুতরাং তাঁর 'শাজরা-ই-নাসাব' বা কুলজীনামাসহ পুরো নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে নিম্নরূপঃ

আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু উমার ইবনু কাসীর ইবনু যাউ ইবনু কাসীর ইবনু যারা,[১] আল-কারশী,[২] আল-বাসারী, আদ্ দিমাশকী।

কিন্তু সাধারণ্যে তিনি ইবনু কাসীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ 'আল-বাসরী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে জন্মস্থান বাচক উপাধি এবং 'আদ্ দিমাশকী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তা'লীম ও তারবি'য়াত বাচক উপাধি।

ইমাম ইবনু কাসীর ছিলেন এক সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও বিদ্বান পরিবারের সুসন্তান। তাঁর সুযোগ্য পিতা শাইখ আবু হাফ্স শিহাবুদ্দীন উমার (রহঃ) সে অঞ্চলের খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বড় ভাই শাইখ আবদুল ওয়াহাব (রহঃ) ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা আলেম, হাদীস বেত্তা ও তাফসীরবিদ। এমনকি যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন নামক তাঁর পুত্রদ্বয়ও ছিলেন সেকালের বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন হাদীস বেত্তা।

---

[১] এই 'যারা' নামের আরবী অক্ষর বা বানানে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। হাফিয আবুল মাহাসিন তাঁর 'ذَيَّل' বা পাদটীকায় ذَال দিয়ে এবং আল্লামা ইবনুল ইমাদ তাঁর 'শাযারাতুয যাহাব' গ্রন্থে زَاء দিয়ে লিখেছেন।

[২] আলোচ্য শব্দটি নিয়েও কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর 'দুরারে কামিনাহ' গ্রন্থে এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর 'যাইলে তাবাকাতিল হুফফায' গ্রন্থে 'আল কাইসী' লিখেছেন। কিন্তু হাফিয তাকী উদ্দিন ইবনু ফাহ্দ তাঁর 'লাহাযুল আলহায' গ্রন্থে, নওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী তাঁর 'আবজাদুল উলূম' গ্রন্থে এবং মুহাম্মদ ইবনু আবদুর রহমান হামযাহ তাঁর 'মুকাদ্দামা'য় 'আলকারশী' উল্লেখ করেছেন। এই শেষোক্ত শব্দটিই শুদ্ধ ও অভ্রান্ত বলে মনে হয়। কারণ 'যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা' মুহাম্মদ নামক ইবনু কাসীরের (রহঃ) দুই পুত্ররত্নের নামের সঙ্গেও এই 'কারশী' শব্দটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সুতরাং পিতা ও পুত্রের 'নিসবাত' যে একই ধরনের হবে এতে আর এমন কী সন্দেহ থাকতে পারে?

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষাঃ

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) সিরীয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বসরার অন্তর্গত মাজদল নামক মহল্লায় ৭০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের সন-তারিখ সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য নেই বটে; কিন্তু তাঁর জন্মের তারিখ-সন নিয়ে তাঁর জীবনীকারদের মাঝে বেশ একটা মতদ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায়। আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ-১৫০৫ খ্রীঃ) তাঁর 'যায়লু তাযকিরাতিল হুফ্ফায' গ্রন্থে, আল্লামা ইবনুল ইমাম হাম্বালী (মৃঃ ১০৮৯ হিঃ-১৬৭৮ খ্রীঃ) স্বীয় 'শাযারাতুয যাহাব' গ্রন্থে [১] ইমাম ইবনু কাসীরের জন্ম সন ৭০০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফিয আবূ মাহাসিন হুসাইনী দিমাশ্কী (মৃঃ ৭৬৫ হিঃ -১৩৬৩ খ্রীঃ) তাঁর 'যাইলু তায্কিরাতিল হুফ্ফায' গ্রন্থে,[২] আল্লামা কাযী শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ-১৮৩৪ খ্রীঃ) 'আল বাদরুত তালি'[৩] গ্রন্থে, হাফিয শাইখ শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ-১৩৪৭ খ্রীঃ) স্বীয় 'তায্কিরাতুল হুফ্ফাফ'[৪] গ্রন্থের উপক্রমণিকায়, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ-১৮৮৯ খ্রীঃ) তাঁর 'আবজাদুল উলূম'[৫] গ্রন্থে ৭০১ হিজরী কিংবা তদুর্ধে বলে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৬] যাই হোক, ইবনু কাসীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিন কিংবা চার বছর বয়সের সময়ে শিশু ইবনু কাসীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৩ হিঃ মুতাবিক ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আবদুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃ বিয়োগের তিন বছর পর ৭০৬ হিজরীতে ভাইয়ের সংগে তিনি তৎকালীন ধন-ঐশ্বর্যের স্বপ্নপুরী বাগদাদ নগরীতে উপণীত হন। এই নগরী তখন শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-গরিমা, সংস্কৃতি-কৃষ্টির মর্মকেন্দ্র হিসেবে সারা বিশ্ব জাহানে শীর্ষস্থানীয়। এই কেন্দ্রবিন্দুতে হাযির হয়ে এখানেই বালক ইবনু কাসীরের জীবনের যাত্রাপথ শুরু হয়। তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম বিন আবদুর রহমান

---

১. গ্রন্থটি মিসর থেকে ১৩৫১ হিঃ মুদ্রিত। এর পুরো নাম 'শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব'।

২. এটি সমসাময়িককালে দিমাশক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩. এটি মিসর থেকে ১৩৪৮ হিঃ-১৯২৯ খ্রীঃ মুদ্রিত। এর পুরো নাম 'আল বাদরুত তালি বিমাহাসিনে মান বা'দাল কারসিন সাবি'।

৪. এটি দায়িরাতুল মা'আরিফ, হায়দরাবাদ, ডেকান থেকে মুদ্রিত।

৫. এটি ভূপালের সিদ্দীকী প্রেস থেকে ১২৯৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬. হাফিয ইবনু হাজার আল আসকলানী স্বীয় 'দুরারুল কামিনাহ্' গ্রন্থে ৭০০ হিজরী কিম্বা তার কিছু পরের সময় বলে বর্ণনা করেছেন।

ফাযারী (মৃঃ ৭২৯ হিঃ-১৩২৮ খ্রীঃ)[১] এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌নু কাযী শহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন।[২] তখনকার দিনে একটা চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, কোন শিক্ষার্থী এক নির্দিষ্ট শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করতে চাইলে তাকে সেই শাস্ত্রের কোন এক খানি সংক্ষিপ্ত পুস্তক বাধ্যতামূলকভাবে কণ্ঠস্থ করতে হতো। এ কারণে তিনি শাইখ আবু ইসহাক শীরাযী (মৃঃ ৪৭৬ হিঃ–১০৮৩ খ্রীঃ) কৃত 'আত্‌তামবীহ ফী ফুরুইস শাফীইয়াহ' নামক গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করে ৭১৮ হিজরীতে তা শুনিয়ে দেন। উসূলুল ফিকহের গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনি আল্লামা ইবনু হাজিব মালেকী (মৃঃ ৬৪৬ হিঃ–১২৪৮ খ্রীঃ) কৃত 'মুখতাসার' নামক পুস্তকটি মুখস্থ করেন। এই মুখতাসার গ্রন্থের 'শারাহ' বা ভাষ্য লিখেন আল্লামা শামসুদ্দীন মাহমুদ ইবনু আবদুর রহমান ইসপাহানী (মৃঃ ৭৪৯হিঃ -১৩৪৮ খ্রীঃ)। তাঁর কাছে গিয়েও বালক ইবনু কাসীর (রহঃ) উসূলুল ফিকহের (Principles of Jurisprudence) গ্রন্থমালা অনন্য মনে অধ্যয়ন করেন।[৩] অনুরূপভাবে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি সমকালীন মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে অনন্য মনে হাদীস শ্রবণ করেন। আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় 'যায়লু তায্‌কিরাতিল হুফ্‌ফায' গ্রন্থে বলেন سَمِعَ الْحَجَّارَ وَالطَّبْقَةَ অর্থাৎ 'হাজ্জার এবং তাঁর সমশ্রেণীর মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে তিনি (ইবনু কাসীর) হাদীস শ্রবণ করেন।

মুহাদ্দিস হাজ্জার[৪] ছাড়া তাঁর সমসাময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইবনু কাসীর একাগ্রচিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ

---

[১] ইনি 'তাম্‌বীহ' গ্রন্থে ভাষ্যকার এবং জনসাধারণ্যে 'ইবনু ফারকাহ্‌' নামে প্রসিদ্ধ।

[২] নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁঃ 'আবজাদুল উলূম' ৩য় খণ্ড (সিদ্দীকী প্রেস ভূপাল, ১২৯৫ হিঃ-১৮৭৮ খ্রীঃ) পৃঃ ৭৮০।

[৩] আল্লামা হাজী খলীফাঃ 'কাশফুয যুনূন'।

[৪] হাজ্জার ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস। সমসাময়িক বিশ্ব মুসলিম জাহানে তাঁর শিক্ষাগারের জুড়ি মেলা ভার ছিল। দূর দূরান্ত ও দেশ দেশান্তর থেকে তাঁর পাঠাগারে অসংখ্য অগণিত শিক্ষার্থী এসে অনবরত ভিড় জমিয়ে রাখতো এবং হাদীসের সনদ গ্রহণ পূর্বক স্বীয় জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করে আবার তারা নিজ নিজ দেশাভিমুখে ফিরে যেতো। সর্বসাধারণ্যে তিনি 'ইবনু শাহ্‌না' ও 'হাজ্জার' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গুণবাচক উপাধি ছিল 'মুসনিদুদ দুনিয়া' বা বিশ্ব জাহানের সনদ বর্ণনাকারী ব্যক্তি এবং 'রুহলাতুল আফাক' অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাঁর দিকে মানুষ দিক্‌-দিগন্ত থেকে যাত্রা শুরু করে। তাঁর আসল নাম ছিল আহমাদ, কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবুল আব্বাস, আর লকব ছিল শিহাবুদ্দীন। তাহলে কুলজী বা নসবনামা ছিল নিম্নরূপঃ আহমদ বিন আবি তালিব বিন আবি নয়াম নু'মা বিন হাসান বিন আলী বিন বায়ান মুকরিনী আসসালিহী। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর 'আদ্‌-দুরারুল- কামিনাহ' গ্রন্থে এবং হাফিয শামসুদ্দীন ইবনু তুলুন اَلْغُرَفُ الْعَلِيَّةُ فِىْ ذَيْلِ الْجَوَاهِرِ الْمُضِيَّةِ গ্রন্থে হাজ্জার সম্পর্কে ব্যাপক ও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর ফিরিস্তি যেমন দীর্ঘ, তেমনি তাঁর হাদীস বর্ণনার সূচীও বেশ লম্বা। অঃ পৃঃ দ্রঃ

১) বাহাউদ্দীন বিন কাসিম বিন মুযাফ্ফর বিন আসাকির (মৃঃ ৭২৩ হিঃ-১৩২৩ খ্রীঃ)

২) শাইখুয্ যাহিরিয়া আফীফুদ্দীন ইসহাক বিন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃঃ ৭২৫-১৩২৪খ্রীঃ)

৩) ঈসা ইব্নুল মুত্ইম।

৪) মুহাম্মদ বিন যরাদ।

৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু সুয়াইদী (মৃঃ ৭১১ হিঃ-১৩১১ খ্রীঃ)

৬) ইবনুর রাযী।

৭) হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মযযী শাফিঈ (মৃঃ৭৪২ হিঃ১৩৪১ খ্রীঃ)।[১]

৮) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমদ ইবনু তাইমীয়া আল হাররানী (মৃঃ ৭২৮ হিঃ - ১৩২৭ খ্রীঃ)।[২]

৯) আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহবী (মৃঃ৭৪৮ হিঃ - ১৩২৭ খ্রীঃ।[৩]

১০) আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আস-শীরাযী (মৃঃ ৭৪৯ হিঃ১৩৪৮ খ্রীঃ)।

হাফিয ইবনু কাসীর (রঃ) উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনু আবদুর রহমান মযযী শাফিঈ (মৃঃ ৭৪২ হিঃ-১৩৪১ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর প্রিয়তমা কন্যার সঙ্গে

হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি এত দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, দাদা এবং পৌত্রদেরকে স্বীয় ছাত্র হিসেবে এবং সঙ্গে পড়াবার তিনি সুযোগ লাভ করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দিমাশক নগরী এবং অন্যান্য স্থানে শুধুমাত্র সহীহ বুখারীই তিনি ৭০ (সত্তর) বারের বেশী পড়িয়েছিলেন। হাদীসের হাফিযগণ তাঁর কাছ থেকে নির্বাচিত হাদীসগুলোর সবক নিতেন এবং দূর-দূরান্তর ও দেশ-দেশান্তর থেকে হাদীস শিক্ষার্থে তাঁর কাছে ছুটে আসতেন এবং তাঁদের হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করতেন। অবধারিত মৃত্যুর মাত্র এক দিন আগে মুহিব উদ্দিন ইবনুল মুহিব তাঁর কাছে বুখারী শরীফ শুরু করেন। পরের দিন যুহরের নামায পর্যন্ত বুখারী শরীফের সবক দান চলছিল, এমন সময় আকস্মিকভাবে যুহরের নামাযের অব্যবহিতপূর্বে ৭৩০ হিজরীর ২৫শে সফরে এ প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা হাজ্জার পরলোক গমন করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

[১] এঁর রচিত 'তাহযীবুল কামাল' নামক অনবদ্য গ্রন্থটি হায়দরাবাদ ডেকানের 'দায়িরাতুল মা'আরিফ' প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এর সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

[২] এঁর জীবন কথা ও সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্রঃ শিহাবুদ্দীন ফজল উমরীকৃত 'মাসালিকুল আবসার', ইবনু রজব হাম্বালী কৃত 'তাবাকাত', ইবনু শাকির কৃত 'ফওয়াতুল অফিয়াত', শাইখ মারঈ কৃত 'কাওয়াকিবুদ্ দুররিয়াহ্', নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী কৃত 'আত্তাজুল মুকাল্লাল' (সিদ্দীকী প্রেস ভূপাল, ১২৯৯ হিঃ) পৃঃ ২৮৮।

[৩] এঁর 'তাযকিরাতুল হুফফায' নামক অমর গ্রন্থটি হায়দারাবাদ ডেকানের, দায়িরাতুল মা'আরিফ' থেকে মুদ্রিত।

হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই শুভ বন্ধনের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে এই ওস্তাদ-শাগরিদের পবিত্র সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ-নিবিড় এবং সুদৃঢ় হয়।[১] সুতরাং এই শ্রদ্ধাস্পদ মহান শিক্ষকের অন্তহীন স্নেহ মমতার ছত্রছায়ায় বহুদিন পর্যন্ত অবস্থান করে তিনি পূর্ণমাত্রায় উপকৃত হয়েছিলেন এবং এই সুবর্ণ সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। বেশ কিছুকাল ধরে তিনি এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তথা স্নেহময় শ্বশুরের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী তাঁর কাছ থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন। এভাবেই তিনি পবিত্র হাদীসের পঠন পাঠন ও অধ্যয়নে সম্পূর্ণতা অর্জন করতে সমর্থ হন।এ প্রসঙ্গে আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ-১৫০৫ খ্রীঃ) বলেনঃ تَخَرَّجَ بِالْمِزِّىْ وَ لَازَمَهُ وَ بَرَعَ

অর্থাৎ 'হাফিয জামালুদ্দীন মিয্‌যীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তিনি বিপুল ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করেন।'[২]

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনু তাইমীয়ার (মৃঃ ৭২৮ হিঃ-১৩২৭ খ্রীঃ) সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাঁর কাছ থেকেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ-১৪৪৮ খ্রীঃ) বলেনঃ মিসর থেকে ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী[৩] এবং ইউসুফ খুতনী[৪] প্রমুখ সমসাময়িক মুহাদ্দিসরা তাঁকে হাদীস অধ্যাপনার স্পষ্ট অনুমতি দান করেন। এভাবে মহামতি ইমাম ইবনু কাসীর মুসলিম জগতের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বিভিন্ন উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর ও তারিখের প্রায় সকল শাখায় এমন অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানার্জন করেন যে, সারা

---

[১] 'আল-বাঈসুল হাসীস' শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীসঃ সম্পাদনাঃ আহমদ শাকিরঃ মুকাদ্দিমাঃ আবদুর রহমান হামযাহ (দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়া, বাইরুত) পৃঃ ১।

[২] 'যায়লু তাবাকাতিল হুফফায' (দিমাশ্‌ক প্রেস) পৃঃ ১৯৪।

[৩] সম্ভবতঃ এঁর পুরো নাম হাফেজ আমিনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম ওয়ানী (মৃঃ ৭৩৫ হিঃ-১৩৩৪ খ্রীঃ)। আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় 'যায়লু তাযকিরাতিল হুফফায' গ্রন্থে এঁর জীবন কথা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং তাঁকে হাদীসের হাফিয রূপে আখ্যায়িত করেন। আল্লামা হাফিয আবদুল কাদের কারশী (মৃঃ ৭৭৫ হিঃ-১৩৭৩ খ্রীঃ) তাঁর কাছে হাদীস শরীফের সবক গ্রহণ করেন এবং স্বীয় 'জওয়াহিরুল মজিয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়া' গ্রন্থে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁকে اَلْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ নামক অনুপম উপাধিতেও ভূষিত করেন।

[৪] ইনি মিসরের তদানীন্তন প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা বদরুদ্দীন ইউসুফ ইবনু উমার খুতনী। স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে তিনি 'মুসনাদুল বিলাদিল মিসরিয়াহ' উপাধিতে ভূষিত হন। 'আলী ইসনাদে' (যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনা সূত্রে মাধ্যম অতি অল্প) সত্যিই তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। তিনি ৭৩১ হিঃ মুতাবিক ১৩৩০ খ্রীঃ ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকী, আহমদ দিম্‌ইয়াতী এবং হাফিয আবদুল কাদির কারশীর তিনি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন। এই শেষোক্ত মুহাদ্দিস অর্থাৎ হাফিয কারশী স্বীয় 'জওয়াহিরুল মজিয়াহ' গ্রন্থে অতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ করেন।

মুসলিম জাহানের আহলে সুন্নাহ এবং অন্যান্যদের কাছেও অপ্রতিদ্বন্ধী ইমাম হওয়ার গৌরবময় আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হন। তাঁর অপরিতৃপ্ত ও অনন্য সাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান-পিপাসা, অসাধারণ ধীশক্তি, অপরিসীম বিদ্যাবত্তা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে শৈশব এবং কৈশোর থেকেই। হাদীস ও তাফসীর ছাড়া ফিকাহ, অসূলে ফিকাহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, তারীখে ইসলাম প্রভৃতিতেও তিনি সমান দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আল্লামা হাফিয ইবনুল ইমাদ হাম্বালী (মৃঃ ১০৮৯ হিঃ-১৬৭৪ খ্রীঃ) ইবনু হাবীব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

اِنْتَهَتْ اِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْعِلْمِ فِي التَّارِيْخِ وَ الْحَدِيْثِ وَ التَّفْسِيْرِ

'ইসলামের ইতিহাস, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল রাজত্ব তাঁর কাছে গিয়েই শেষ সীমান্তে উপনীত হয়েছে।'[১]

প্রথিতযশা ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল মাহাসিন জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন সাইফুদ্দীন বিন তাগরীবিরদী (মৃঃ ৮৭৪ হিঃ -১৪৬৯ খ্রীঃ) اَلْمَنْهَلُ الصَّافِيْ اَلْمُسْتَوْفِيْ بَعْدَ الْوَا নামক গ্রন্থে বলেনঃ

وَكَانَ لَهُ اِطِّلَاعٌ عَظِيْمٌ فِي الْحَدِيْثِ وَ التَّفْسِيْرِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَرَبِيَّةِ

অর্থাৎ হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।[২] অনুরূপভাবে হাফিয আবুল মাহাসিন হুসাইনি দিমাশ্‌কী (মৃঃ ৭৬৫ হিঃ-১৩৬৩ খ্রীঃ) তাঁর 'যাইলু তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায নামক গ্রন্থে বলেনঃ

وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَ التَّفْسِيْرِ وَ النَّحْوِ وَ اَمْعَنَ النَّظْرَ فِي الرِّجَالِ وَ الْعِلَلِ

অর্থাৎ ফিকাহ শাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীসের 'রিজাল' (রাবী বা বর্ণনাকারীগণ) ও হাদীসের 'ইলাল' (রাবীদের বর্ণনা সূত্রের প্রছন্ন দোষ-ত্রুটি নির্ণয়) প্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ম ও গভীর।

হাদীস শাস্ত্রে এই অগাধ জ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টির কারণেই তিনি পরবর্তীকালে 'হুফ্‌ফাযুল হাদীস' নামক উঁচু দরের হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের পর্যায়ভুক্ত হতে পেরেছিলেন। শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামযাহ বলেনঃ

---

[১] হাফিয ইবনুল ইমাদঃ 'জওয়াহিরুল মজিয়াহ্' ফী তাবাকাতিল হানাফীয়া'ঃ হায়দরাবাদ ডেকান, দায়িরাতুল মা'আরিফ প্রেস, ১৩৩২ হিঃ পৃঃ ১৩৯।

[২] আবুল মাহাসিন জামালুদ্দীন তাগরীবিরদীঃ 'আল মানহালুস সাফী'ঃ পৃঃ ৩৪৫; হাজী খলীফাঃ 'কাশফুয যুনূন'ঃ Edited by Gustav Flugel, Leipzig: (1835) p.42-49; Also see: ``Wafayat-al Ayan' by ibn Khallikan No. 28 Gottingen, 1835; হাফিয শামসুদ্দীন যাহবী 'তাযকিরাতুল হুফফায' ২য় খণ্ডঃ Edited by sayid Mustafa Ali: Hyderabad, India, 1330: `The Encyclopaedia of Islam': Edited by A.G. Wensink, Vol, 11 Part 1 Sup pl I (Luzac & Co. London, 1934) p.393,

"وَلَقَدْ كَانَ لِلْإِمَامِ ابْنِ كَثِيْرٍ حَيَاةٌ عَلَمِيَّةٌ حَافِلَةٌ بِالْجُهْدِ فِى التَّحْصِيْلِ وَ التَّصْنِيْفِ فِىْ عَصْرٍ مَمْلُوْءٍ بِالْأَكَابِرِ مِنْ عُلَمَاءِ النَّقْلِ وَ الْعَقْلِ كَمَا سَتَقِفُ عَلٰى ذَالِكَ (اَلْبَاعِثُ الْحَثِيْثُ)"

'নিঃসন্দেহে ইমাম ইবনু কাসীর সারা জীবন ধরে জ্ঞান চর্চা করেছেনঃ এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি পরিশ্রম কম করেননি। অথচ এমন যুগে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন যখন হাদীস, তাফসীর ও অন্যান্য শাস্ত্রের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের কোনই অভাব ছিল না।[১]

হাফিয শামসুদ্দীন যাহবী স্বীয় 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' নামক অনবদ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশিষ্ট হাদীস, অধ্যাপকমণ্ডলীর পরিচয় প্রদানকালে ইমাম ইবনু কাসীরের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। অতঃপর হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ-১৫০৫ খ্রীঃ) স্বীয় 'যাইলু তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' গ্রন্থে ইবনু কাসীরের বিস্তৃত জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং আল্লামা আবুল মাহাসীন হুসাইনীও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।[২]

কাব্য চর্চায় ইবনু কাসীর (রহঃ)ঃ

ইমাম ইবনু কাসীর কাব্য রচনায় ছিলেন পারঙ্গম ও সিদ্ধহস্ত। তাঁর স্বরচিত কবিতামালা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠায় বিচ্ছিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে আমরা তাঁর কবিতা থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছিঃ

تَمُرُّ بِنَا الْاَيَّامُ تَتْرٰى وَ اِنَّمَا * نُسَاقُ اِلَى الْاٰجَالِ وَ الْعَيْنُ تَنْظُرُ

দিনের পর দিন অতীতের অন্তহীন পথে বিলীন হতে চলেছে, আর আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

فَلَا عَائِدٌ ذَاكَ الشَّبَابُ الَّذِىْ مَضٰى * وَ لَا زَائِلٌ هٰذَا الْمَشِيْبُ الْمُكَدَّرُ

অতিক্রান্ত জীবন যৌবন কোন দিনই ফিরে পাবার নয়, আর এই ক্লেদযুক্ত বার্ধক্যও আদৌ দূরে সরার নয়।[৩]

শেষের চরণটিতে ذَاكَ الشَّبَابُ স্থলে صَفْوُ الشَّبَابِ হলে খুব ভাল হতো।

---

[১] শাইখ মুহাম্মদ আবদুর রায্‌যাক হামযাহঃ 'আল-বাইসুল হাদীস' গ্রন্থের উপক্রমণিকাঃ পৃঃ ১৩।

[২] হাফিয আবূল মাহাসিন হুসাইনী দিমাশকীঃ 'যাইলু তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায'ঃ (দিমাশক থেকে মুদ্রিত) পৃঃ ১৮৪; হাজী খলীফাঃ 'কাশ্‌ফুয যুনূন'ঃ পৃঃ ২৩৪, মুহাম্মদ শফী এম, এ, ডি, ও, এল, (পাঞ্জাব) সম্পাদিত 'দায়িরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া'ঃ '১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৬৫৪; ডঃ মুহাম্মাদ হুসাইন আয্‌যাহবীঃ 'আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন' ঃ ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ (১৯৭৬ খ্রীঃ) পৃঃ ২৪২-৪৩, আল্লামা শাইখ দাউদীঃ 'তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরূন'ঃ পৃঃ ৩২৭।

[৩] নওয়াব সিদ্দকী হাসান খাঁ ভূপালীঃ 'আবজাদুল উলূম'ঃ ৩য় খণ্ড (সিদ্দীক প্রেস ভূপাল) পৃঃ ৭৮০; 'তাফসীর ইবনু কাসীর' উর্দু অনুবাদের শুরুতে মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানীর ভূমিকাঃ পৃঃ ৪; মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী কৃত 'ইবনু কাসীর' শীর্ষক প্রবন্ধঃ মাসিক 'তরজমানুল হাদীস' ১ম সংখ্যাঃ পৃঃ ৩১।

ইমাম ইবনু কাসীরের প্রতি সমসাময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

একবার হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকীকে (মৃঃ ৮০৬ হিঃ- ১৪০৩ খ্রীঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ 'ইমাম মুগলতাঈ (৭৬২ হিঃ-১৩৬০ খ্রীঃ), ইমাম ইবনু কাসীর, ইবনু রাফে, হাফিয হুসাইনী এই চারজন সমসাময়িক মনীষীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? আল্লামা হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ এঁদের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় জ্ঞানে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী হলেন আল্লামা মুগলতাঈ, হাদীসের মূল অংশ ও ইতিহাস সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হচ্ছেন ইমাম ইবনু কাসীর, আর হাদীস শাস্ত্রের অনুসন্ধান বিশারদ এবং বিভিন্ন প্রকারের হাদীস সম্পর্কে অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হচ্ছেন ইবনু রাফে এবং স্বীয় উস্তায, সমসাময়িক মুহাদ্দিস ও হাদীসের বর্ণনা সূত্র সম্পর্কে অধিক অবহিত হলেন হাফিয হুসাইনী দিমাশকী (মৃঃ ৭৬৫ হিঃ-১৩৬৩ খ্রীঃ)।

হাফিয শামসুদ্দীন যাহবী (মৃঃ৭৪৮ হিঃ-১৩৪৭ খ্রীঃ) তাঁর 'আল-মুজামুল মুখতাস' এবং 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে বলেনঃ

'ইবনু কাসীর একজন খ্যাতনামা মুফ্তী (ফতওয়া প্রদানে বিশেষজ্ঞ), বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরকার এবং রিজাল শাস্ত্রে[১] বিশেষ পারদর্শী। হাদীসের মতন (মূল অংশ) সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদীসের তাখ্রিজ (অজ্ঞাত, অখ্যাত সনদকে খুঁজে বের করেছেন, আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন, গ্রন্থরাজি রচনা করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন।[২]

---

[১] অর্থাৎ হাদীস সংগ্রহ বিজ্ঞান। বিভিন্ন কালে স্বার্থান্ধ ও মিথ্যা ভাষীরা রাসূলের বাণী বলে যেসব স্বরচিত মতামত প্রচারের প্রয়াস পেয়েছে, মুহাদ্দিসগণ অতি কষ্টে সৃষ্টে সেগুলো সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই মনগড়া হাদীসের প্রাচুর্য দেখে প্রত্যেক হাদীস সংকলয়িতার এটাই প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, যেসব রাবী (বর্ণনাকারী) আঁ- হযরতের মুখ-নিঃসৃত বাণী সূত্র পরম্পরায় তাঁর কান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁরা কি প্রত্যেকেই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিশস্ত ও সন্দেহ বিমুক্ত বলে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন? অনুরূপভাবে তাঁদের মধ্যে কে বিশ্বাসপরায়ণ, কে অবিশ্বস্ত, কে সন্দেহ বিমুক্ত এবং সন্দেহযুক্ত এটাও বিচার্য বিষয়। এরূপে হাদীসের সত্যাসত্যতা বিচারকল্পে রাবীগণের জীবন রচিত সম্বলিত যে একটি বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠে, সেটাই রিজাল শাস্ত্র। বস্তুতঃ এই হাদীস সংগ্রহ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণকে যে শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, রাবীগণের জীবন চরিত সংগ্রহের ব্যাপারে আরও অধিক কষ্ট অকাতরে স্বীকার করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের বিচার বিশ্লেষণমান ছিল অত্যন্ত কঠোর ও নিখুঁত। এ কারণেই লক্ষ লক্ষ হাদীস মুহাদ্দিসগণের সংকলন গ্রন্থ থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই লক্ষাধিক হাদীসকে যাচাই-বাছাই করে শুধুমাত্র নির্ভুল ও অকাট্য প্রমাণিত হাদীসগুলোকে সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা বেশ একটা দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। রাবী বা বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে এই যুক্তি ভিত্তিক আলোচনা 'রিজাল শাস্ত্র' নামে আবহমানকাল বিশ্ব মুসলিমের কাছে অতীত ঐতিহ্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে রয়েছে।

[২] হাফিয যাহবীঃ 'আল মুজামুল মুখতাস' এবং তাযকিরাতুল হুফ্ফায' (দারিয়াতুল মা'আরিফ প্রেস, হায়দরাবাদ ডেকান); আল্লামা ইবনুল ইমাদঃ 'শাযারাতুয-যাহাব'ঃ ষষ্ঠ খণ্ডঃ পৃঃ ২৩১-২৩৩; আল্লামা দাউদীঃ 'তাবাকাতুল মুফাস্সিরীনঃ পৃঃ ৩২৭।

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইবনু কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ 'তিনি হাদীসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম, বক্তৃতায় সুনিপুণ এবং বহু গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী।'

আল্লামা শাইখ ইবনুল ইমাদ হাম্বালী (মৃঃ ১০৮৯ হিঃ- ১৬৭৮ খ্রীঃ) ইমাম ইবনু কাসীর (রঃ) কে 'আল হাফিযুল কাবীর' বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর বলে আখ্যায়িত করেন।[১]

অনুরূপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইবনুল হুজ্জি (মৃঃ ৮১৬ হিঃ-১৪১৩ খ্রীঃ) স্বীয় শ্রদ্ধাষ্পদ উস্তাদ (ইবনু কাসীর) সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেনঃ

اَحْفَظُ مَنْ اَدْرَكْنَاهُ لِمُتُوْنِ الْاَحَادِيْثِ وَ اَعْرَفُهُمْ بِجَرْحِهَا وَ رِجَالِهَا وَ صَحِيْحِهَا وَ سَقِيْمِهَا وَ كَانَ اَقْرَانُهُ وَ شُيُوْخُهُ يَعْتَرِفُوْنَ لَهُ بِذٰلِكَ وَ مَا اَعْرِفُ اَنِّىْ اِجْتَمَعْتُ بِهٖ عَلٰى كَثْرَةِ تَرَدُّدِىْ اِلَيْهِ اِلَّا وَ اسْتَفَدْتُّ مِنْهُ ـ

'আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি (ইবনু কাসীর) হাদীসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে, হাদীস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ-দুর্বল হাদীস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সমসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমতে গিয়ে উপনীত হয়েছি, কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি।[২] আল্লামা হাফিয উবনু নাসিরুদ্দীন আদ্-দিমাশকী (মৃঃ ৮৪২হিঃ-১৪৩৮ খ্রীঃ) তাঁর (ইবনু কাসীরের) প্রসঙ্গে বলেনঃ

---

১. আবদুল হাই ইবনুল ইমাদঃ 'শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারে মান্ যাহাব' ঃ ষষ্ট খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ২৩৮; ইবনু কাসীরঃ 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' (মাজেদীয়া প্রেস, মক্কা মুকাররামাঃ ১৩৫৩ হিঃ)-এর শুরুতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রায্যাক হামযাহ কৃত 'হায়াতুল ইমাম ইবনু কাসীর' শীর্ষক উপক্রমণিকাঃ পৃঃ ১৪, ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন আয্যাহবীঃ আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন'ঃ ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ (দারুল কুতুবিল হাদীসাহ (১৯৭৬ সাল) পৃঃ ২৪৩; হাফিয ইবনু হাজারঃ 'আদ্দুরারুল কামিনা'ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৪।

২. মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরীঃ 'ইমাম ইবনু কাসীর' শীর্ষক প্রবন্ধঃ মাসিক 'তরজমানুল হাদীস'ঃ ১১শ বর্ষঃ ১ম সংখ্যাঃ পৃঃ ৩২; ইমাম ইবনু কাসীর কৃত 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস'-এর ব্যাখ্যা 'আল বাইসুল হাসীস'-এর শুরুতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রায্যাক হামযাহকৃত 'হায়াতুল ইমাম ইবনু কাসীর' শীর্ষক উপক্রমণিকা (দারুল কুতূবিল ইলমিয়া, বাইরুত, ১৯৫১) পৃঃ ১৬; আল্লামা কিনানীঃ 'আর্‌রিসালাতুল মুসতাতরাফা' পৃঃ ১৪৬।

اَلشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّيْنِ ثِقَةُ الْمُحَدِّثِيْنَ عُمْدَةُ
الْمُؤَرِّخِيْنَ عَلَمُ الْمُفَسِّرِيْنَ -

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের নির্ভর, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা'।[১] হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হিঃ)[২] তাঁর 'আদ্‌দুরারুল কামীনা' গ্রন্থে বলেনঃ

وَ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيْثِ مُطَالَعَةً فِيْ مُتُوْنِهٖ وَ رِجَالِهٖ وَ كَانَ كَثِيْرُ الْاِسْتِحْضَار
حُسْنُ الْمُفَاكَهَةِ صَارَتْ تَصَانِيْفُهٗ فِيْ حَيَاتِهٖ وَ انْتَفَعَ النَّاسُ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِهٖ وَ
لَمْ يَكُنْ عَلٰى طَرِيْقِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِيْ تَحْصِيْلِ الْعَوَالِيْ وَ تَمْيِيْزِ الْعَالِيْ مِنَ

---

১. আল্লামা ইবনু নাসীরুদ্দীন দিমাশ্‌কীঃ 'আর-রাদ্দুল ওয়াফিরঃ পৃঃ ২৬৯; ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন আয্‌যাহাবীঃ 'আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরূন' ১ম খণ্ডঃ ২য় সংস্করণ (পুর্বোক্ত) পৃঃ ২৪২-৪৩।

২. হাজার তার পিতৃপুরুষের নাম। ৭৭৩ হিঃ মিসরের মাটিতে তাঁর জন্ম। ৪ বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগের পর কুরআন হিফ্য ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। ১১ বছর বয়সে হজ্জ পালনার্থে মক্কা শরীফ গিয়ে সেখানে বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থাদি পাঠ করেন। ৮০২ হিজরীতে গিয়ে কাসেম, হাজ্জার এবং তাকিউদ্দীন সুলাইমান প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করে তা বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। অতি শৈশব থেকেই তাঁর অনন্য মেধাশক্তির বিকাশ ঘটে। ৮২৭ হিজরী থেকে নিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর্যন্ত তিনি কায়রো ও তৎপার্শ্বস্থ দেশসমূহের কাযী পদে নিয়োজিত থাকেন। এছাড়া জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্মীয় বিদ্যা-বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের প্রচার, প্রসার, অধ্যাপনা, গ্রন্থ সংকলন ও ফতওয়া প্রদান কার্যে অতিবাহিত করেন। প্রসিদ্ধ মাহমূদিয়া গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান, জামে' আযহার প্রভৃতির খতীব এবং কায়রোর বড় বড় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা নিকেতনে বহুকাল ধরে তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা দেড়শতেরও অধিক। অধিকাংশ গ্রন্থ হাদীস, রিজাল শাস্ত্র ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় হলেও তন্মধ্যে এমন বহু সংকলন রয়েছে, যাতে আরবী সাহিত্য, ফিকাহ শাস্ত্র, উসূল, কালাম প্রভৃতি নানারকম বিদ্যার রয়েছে অপূর্ব সমাবেশ। তাঁর এই দেড় শতাধিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ বুখারীর ভাষ্য 'ফাতহুল-বারী'ই হচ্ছে অনবদ্য অবদান। এই বিশ্ব বিশ্রুত মহাগ্রন্থখানি হাফিয আসকালানী (৮১৭ হিঃ) লিখতে শুরু করেন। দীর্ঘ ২৫ বছরের একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তার অমৃত ফল হিসেবে এই মহামূল্য গ্রন্থটি সমাপ্ত করে তিনি তদানীন্তন মুসলিম জাহানকে উপহার দিতে সমর্থ হন। এই অবিস্মরণীয় অনবদ্য রচনার পরিসমাপ্তি উপলক্ষে হাফিয ইবনু হাজার স্বয়ং পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে দেশস্থ আপামর জনসাধারণকে ওলিমার দাওয়াত দেন। আমন্ত্রিত হাজিরান মজলিসে বড় বড় উলামায়ে কিরামের খিদমতে তিনি এই শ্রেষ্ঠ কীর্তি পেশ করেন। উপস্থিত রাজা-বাদশাহগণ সুবর্ণ মুদ্রায় ওজন করে তাঁর এই মহামূল্য গ্রন্থটি খরিদ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনার কিছুকাল পরই স্বনামধন্য গ্রন্থকার উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে আখেরাতের অবিনশ্বরলোকে যাত্রা করেন।

'হাদিউস সারী' বা 'মুকাম্মাতুল ফাতহ' নামক 'ফাতহুল বারীর' একখানি তথ্যসমৃদ্ধ ও গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা তিনি ইতিপূর্বেই রচনা করেছিলেন। (দ্রঃ মৎপ্রণীত 'ইমাম বুখারীঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১৯৭৯)।

النَّازِلِ وَ نَحْوِ ذَالِكَ مِنْ فُنُوْنِهِمْ وَ اِنَّمَا هُوَ مِنْ مُحَدِّثِى الْفُقَهَاءِ وَ اَجَابَ السُّيُوْطِى عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ "اَلْعُمْدَةُ فِىْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ عَلٰى مَعْرِفَةِ صَحِيْحِ الْحَدِيْثِ وَ سَقِيْمِهٖ وَ عِلَلِهٖ وَ اخْتِلَافِ طُرُقِهٖ وَ رِجَالِهٖ جَرْحًا وَ تَعْدِيْلًا وَ اَمَّا الْعَالِىْ وَ النَّازِلُ وَ نَحْوُ ذَالِكَ: فَهُوَ الْفُضْلَاتُ لَامِنْ اُصُوْلِ الْمُهِمَّةِ اهـ"

অর্থাৎ 'হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর আর তিনি রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজি চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে'।

এ পর্যন্ত হাফিয ইবনু হাজার তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি কিছুটা সমালোচকের ভূমিকাও পালন করেছেন। এ করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

ইবনু কাসীর সনদ বা বর্ণনাসূত্রে পরস্পরের মধ্যে আলী ও নাযিলের[১] মাঝে তেমন কোন পার্থক্য প্রদর্শন করেন না। অনুরূপভাবে মুহাদ্দিস সুলভ এ ধরনের অন্যান্য শিল্প, শাস্ত্র ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিও তিনি এতটা উৎসাহী ছিলেন না। সুতরাং তাঁকে ফকীহগণের মুহাদ্দিস বলা যেতে পারে।'

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন নিম্নরূপঃ 'আমি বলি, হাদীস শাস্ত্রের মুখ্য বস্তু হচ্ছে বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস, বর্ণনাসূত্রের সূক্ষ্মতম দোষ-ত্রুটি, বিভিন্ন রকমের বর্ণনাসূত্র সম্পর্কে অবগতি এবং রিজাল বা চরিত অভিধান-শাস্ত্র অর্থাৎ রাবীদের ভাল মন্দ হওয়ার ব্যাপারে সম্যক পরিচিতি ইত্যাদি। এছাড়া সনদের 'আলী' কিংবা 'নাযিল' হওয়া-এগুলো হচ্ছে একটা অতিরিক্ত ব্যাপার, মুখ্য বস্তু নয়।'

প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা আল্লামা যাহিদ বিন হাসান[২] আল-কাওসারী (মৃঃ ১৩৭১ হিঃ-১৯৫১ খ্রীঃ) ছিলেন কায়রোর একজন খ্যাতিমান আলেম ও মুহাদ্দিস এবং উসমানী শাসনামলের একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। তিনিও এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

---

১. হাদীসের যে সনদ বা বর্ণনারসূত্র পরম্পরায় রাবীদের সংখ্যা অল্প হয় তাকে 'আলী সনদ' বলা হয়। আর যেসূত্র পরম্পরায় রাবীদের সংখ্যা বেশী হয় তাকে 'নাযিল' বলে। ফকীহগণ মাসয়ালা নিরূপণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র হাদীসের 'মতন' বা মূল অংশের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকেন। সনদ বা সূত্র পরম্পরার প্রতি তাঁরা ততটা ভ্রূক্ষেপ করেন না। সনদকে তাঁরা শুধু এতটুকুই মূল্য দিয়ে থাকেন যেন তার প্রতিটি রাবীই বিশ্বাসভাজন ও গ্রহণযোগ্য হন। পক্ষান্তরে, মুহাদ্দিসগণের কাছে এর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বেশী। সনদের মধ্য থেকে একটি মাত্র রাবীর সংখ্যা যদি কম করা সম্ভব হয় তবে এজন্যে দীর্ঘ পথের পরিক্রমা তাঁদের কাছে আরও প্রশংসনীয়। মুহাদ্দিসগণের জীবনে এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ভুরি ভুরি নজীর আমরা পেয়ে থাকি। (মৎ প্রণীত 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)

২. মৎ প্রণীত 'ইমাম মুসলিম' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৭৯ পৃঃ ৪৮)।

'হাফিয ইবনু কাসীর যদিও হাদীসের 'মতন' মুখস্থ করার ব্যাপারে ছিলেন বেশী অভ্যস্ত, তবুও তাঁর কাছ থেকে এটা কোন দিনই প্রত্যাশা করা যায় না যে, তিনি রাবীদের স্তরসমূহে ভেদ-নীতির কোন ধার ধারতেন না। অবশ্য তিনি এ কাজটি ভালভাবেই করতেন। রাবী বা বর্ণনাকারীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'আলী' ও 'নাযিল'-এর মাঝে পার্থক্য তিনি অবশ্যই করতেন। এই ভেদ-নীতি ও পার্থক্যের ব্যাপারটা তো ঐ সব মুহাদ্দিসের কাছেও গোপন থাকে না যাঁরা ইবনু কাসীর অপেক্ষা অনেক নিম্ন স্তরের। আর বিশেষ করে শাইখ জামাল ইউসুফ ইবনুয্ যাকী আল মিয্যী (মৃঃ ৭৪২হিঃ- ১৩১৪ খ্রীঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যখন বহুদিন ধরে তিনি তাঁর কাছে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর 'তাহযীবুল কামাল' নামক গ্রন্থটি নিষ্ঠা ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্দ্ধনসহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করে ছিলেন'।[১]

ঐতিহাসিকগণও ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ)-এর সর্বতোমুখী প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল ইমাদ (মৃঃ ১০৯৮ হিঃ- ১৬৭৮ খ্রীঃ) বলেনঃ

يُشَارِكُ فِى الْعَرَبِيَّةِ يَنْظُمُ نَظْمًا وَسَطًا اهـ كَانَ كَثِيرُ الْاِسْتِحْضَارِ قَلِيلُ النِّسْيَانِ جَيِّدُ الْفَهْمِ -

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বস্তুকে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হতো। আর তিনি মেধাবীও কম ছিলেন না।[২] আরবী সাহিত্যও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতাও তিনি রচনা করতেন'।

শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদান, আল্লাহর গুণগান ও রসিকতাঃ

ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন গ্রন্থ রচনা, ফতওয়া প্রদান এবং অধ্যাপনার মহান পেশায়। তাঁর শ্রদ্ধেয় **শিক্ষক** আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তেকালের (৪৭৮ হিঃ-১৩৪৭ খ্রীঃ) পর তিনি দিমাশকের সুপ্রসিদ্ধ 'উম্মু সাহিল' ও 'তান্কযিয়াহ' নামক **শিক্ষায়তনে হাদীস** অধ্যাপনার মহান পদে অভিষিক্ত হন। এ সময়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আল্লাহর গুণগান ও যিক্র আয্কারে মাশগুল থাকতেন।[৩] জীবনে তিনি এত ফতওয়া প্রদান করেছেন যে, সেগুলো পৃথক গ্রন্থকারে সংকলিত হতে পারে।

---

১. আল্লামা মুহাদ্দিস যাহিদ আল-কাউসারীঃ 'যুয়ূল তাযকিরাতিল হুফ্ফাযে'র তা'লিকাত'।

২. আল্লামা ইবনুল ইমাদ হাম্বালীঃ 'শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান্ যাহাব' (১৩৫১ হিঃ মিসর থেকে মুদ্রিত) পৃঃ ১৯৭।

৩. 'ইবনু কাসীর উর্দু তাফসীর'ঃ '১ম খণ্ডের শুরুতে মাওলানা আবদুর রশীদ নোমানী কৃত 'হায়াতু ইবনু কাসীর' (নুর মুহাম্মদ, তিজারাতু কুতুব করাচী, আরামবাগ) পৃঃ ৬; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানঃ 'আবজাদুল উলূম'ঃ ৩য় খণ্ড (পূর্বোক্ত) পৃষ্ঠা ৭৮০; হাজী খলীফাঃ 'কাশফুয্ যুনূন' (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২৩৪, মুহাঃ শফী এম, এ, ডি,ও,এল, সম্পাদিতঃ 'দায়িরায়ে মাআ'রিফে ইসলামীয়া'ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ৪৫৪।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু হাবিব বলেনঃ إِمَامٌ ذِى التَّسْبِيْحِ وَ التَّهْلِيْلِ তিনি সদা প্রফুল্ল চিত্ত, খোশ মেজাজ ও খোশ্ আখলাক ব্যক্তি ছিলেন। কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার সময়ে তিনি সরস ও মূল্যবান উপমা ও দৃষ্টান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আস্‌কালানী তাঁর কিছুটা সমালোচনা[১] করলেও বারবারই তাঁর ভূয়সী প্রশংসায় মুখর হয়েছেন এবং তাঁকে 'হুসনুল মুফাকাহা' বা 'উত্তম রসিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ-১৪০৩ খ্রীঃ)[২] ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে আল্লামা শাইখ আলাউদ্দীন ইবনু তুর্কমানীর[৩] বিশিষ্ট শাগরিদ এবং তাঁরই লালিত পালিত মন্ত্রশিষ্য। তিনি শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকীউদ্দীন সুবকীর[৪] শিক্ষাকেন্দ্রে যখন উপস্থিত হন, তখন শাইখুল ইসলাম তাঁকে সমাদরে সসম্মানে বসিয়ে এবং উপস্থিত সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাঁর বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তখন ইমাম ইবনু কাসীর বলেনঃ আমার তো মনে হয় যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রৌদ্রতপ্ত (মাউন মুশাম্মাস) পানি দ্বারা অজু করার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, ইনি সেই হাদীসটিই হয়তো খুঁজে বের করতে পারবেন না।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কঃ

ইবনু কাসীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইবনু তাইমিয়ার[৫] সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিড় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্‌তাদের প্রভাববিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ় ভাবে।

---

[১] 'কাশফুয্‌যুনূন' লেখক মোল্লা কাত্তিব চাল্‌পী, ইবনু হাজার সম্পর্কে মন্তব্য করেনঃ

كان قلم ابن حجر سئيا فى مَثَالِب الناس و لسانه حسنا و ليته عكس ليبقى الحسن

(كشف الظنون و ضمن الجواهر و الدرر)

[২] ইনি 'তাকরীবুল আসানীদ' এবং 'যাইলু জামেউত তাহসীল' নামক কিতাবদ্বয়ের লেখক। প্রথমোক্ত গ্রন্থটির ৮ খণ্ডে শারাহ লিখে প্রকাশ করেন তারই পুত্র আবূ যুরআ' ইরাকী। আর শেষোক্তটির ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর অপর পুত্র ওয়ালী উদ্দীন ইরাকী। তিনি 'যাইনুল মীযান' নামেও ইমাম যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের দুই খণ্ডে পরিশিষ্ট লিখেছেন। এছাড়া তিনি আহমদ বিন আইবাক দিময়াতী কৃত রাবীদের জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধীয় কিতাবের আরও একটি পরিশিষ্ট লিখেছেন। 'আলফিয়া', 'তাখরীজে আহাদিসে ইয়াহিয়াউল উলূম, প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি লেখক। তাঁর পুরো নাম আবদুর রহীম বিন সুলাইমান শাফিঈ। (নূর মুহাম্মদ আজমীঃ 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস'ঃ পৃঃ ১৩৪)।

[৩] ইনি 'আল-জওহারুন নাকী ফীরাদ্‌দি আলাল বায়হাকী' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ৭৬৩ হিঃ-১৩৬১ খৃঃ মৃত্যু।

[৪] ইনি বহু দিন ধরে মিশরের প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'শিফাউস সাকাম' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের তিনি লেখক। ৭৫৬ হিঃ-১৩৫৫ খৃঃ মৃত্যু।

[৫] এই স্বনাম ধন্য মনীষীর নাম আহমদ বিন আবদুল হালীম, উপনাম আবুল আব্বাস, তাকীউদ্দীন তাঁর জনপ্রিয় উপাধি এবং ইবনু তাইমিয়া নামে তিনি সবার কাছে (অঃ পৃঃ দ্রঃ)

ইবনু কাসীর অধিকাংশ মাস্‌য়ালায় হাফিয ইবনু তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইবনু কাযী শাহাবা স্বীয় 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেনঃ

كَانَتْ لَهُ خُصُوصِيَّةٌ بِابْنِ تَيْمِيَّةَ وَ مُنَاضَلَةٌ عَنْهُ وَ اِتِّبَاعٌ لَهُ فِى كَثِيْرٍ مِّنْ اَرَائِهِ وَ كَانَ يُفْتِى بِرَأْيِهِ فِىْ مَسْئَلَةِ الطَّلَاقِ وَ امْتُحِنَ بِسَبَبِ ذَالِكَ وَاُوْذِىَ ۔

আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইবনে তাইমিয়ার মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরণ করতেন। তিন তালাকের মাস্‌য়ালাতেও তিনি ইবনে তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন।[1] এ কারণে তাঁকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

সুপরিচিত। তাইমিয়া ছিল আসলে তাঁর পিতামহের মায়ের নাম। তিনি অতি শিক্ষিতা ও বিদুষী মহিলা ছিলেন। এঁর নামের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে তিনি ইবনে তাইমিয়া নাম ধারণ করেন। যয়নাব নামেও আরও একজন উচ্চ শিক্ষিতা বিদুষী মহিলার কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১২৬৩ খ্রীঃ দিমাশ্‌কের নিকট হার্রান নামক স্থানে তাঁর জন্ম। তিনি শৈশব থেকেই ছিলেন অনন্য প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী। অল্প বয়সেই তাফসীর, হাদীস, আদব, দর্শন ফিকাহ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। শৈশব ও কৈশোর থেকেই তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী এই অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তি দেখে বিমুগ্ধ হতেন। বিজ্ঞ পিতার ইন্তিকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত শিক্ষায়তনে উত্তরাধিকার সূত্রে অধ্যাপনার দায়িত্বভার অর্পিত হয় সুযোগ্য সন্তান ইবনে তাইমিয়ার উপর। তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তবে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি পদ অলংকৃত করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি শুধু সাধারণ বিদ্যাবত্তা এবং সকল শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারীই ছিলেন না বরং মসির সঙ্গে অসি চালনার ক্ষেত্রেও তিনি সুদক্ষ সৈনিক ছিলেন। এভাবে শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থাতেই তিনি জাতির মূল্যবান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিদানে জাতি তাঁর প্রতি চালিয়েছে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। তিনি একাধিকবার কারারুদ্ধ হন। এমন কি বন্দীশালায় তাঁর দুই ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বহুদিন পর্যন্ত বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। বন্দী যুগে তাইমিয়া কুরআন মজীদের বিশিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর লিখতে এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী প্রনয়ণ ও সংকলন করতে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু এতেও নিষেধাজ্ঞা হলে তিনি কয়লা দ্বারা লেখা সমাপ্ত করেন। এভাবে তাঁর প্রায় ত্রিশাধিক গ্রন্থাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। জনৈক ইয়াহূদীর প্রশ্নোত্তরে উপস্থিত ক্ষেত্রেই তিনি ১৮৪টি কবিতা লিখে সমাপ্ত করেন। এভাবে প্রতিটি গ্রন্থই তিনি রচনা করেন সম্মুখে কোন সহায়ক গ্রন্থ না রেখে। তাঁর রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো খানা।

[1] ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে একই মজলিসে তিন তালাক দেওয়া হলে তা একই তালাক রেজয়ী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এটাই ছিল তাঁর অপরাধের মূল কারণ। এই কারণে সমসাময়িক কূপমণ্ডুক আলেমগণ ফতওয়া কার্য থেকে বিরত থাকার জন্যে তাঁর প্রতি রাজ নিষেধাজ্ঞা জারী করায়। এই অন্যায় ও অবৈধ আদেশকে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সত্য গোপন মহাপাপ মনে করে এই আদেশ প্রতিপালন করতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে রাজাদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁকে পুনরায় বন্দী করা হয়।

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষভাগে হাফিয ইবনু কাসীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরীর ২৬শে শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার এই মহামনীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে আখেরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দিমাশকের সুপ্রসিদ্ধ কবর স্থান 'সুফীয়া'তে স্বীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর মহা প্রয়াণে তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত শিষ্য শাগরিদরা বেদনাবিধুর প্রাণে যে হৃদয় বিদারক 'মর্সিয়া বা শোক গাঁথা আবৃত্তি করেন, তন্মধ্যে নিম্নের পংক্তি দুটি উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

لَفَقَدَكَ طُلَّابُ الْعُلُومِ تَاَسَّفُوْا * وَجَارُوْا بِدَمْعٍ لَا يَبِيْدُ غَزِيْرٌ
وَلَوْ مَزَجُوْا مَاءَ الدَّمْعِ بِالدِّمَاءِ * لَكَانَ قَلِيْلًا فِيْكَ يَا ابْنَ كَثِيْرٌ

'চিরদিনের মতো তোমাকে হারিয়ে তোমার প্রিয় শিক্ষার্থীগণ আজ হা-হুতাশ করে ফিরছে, আর এ অজস্র ও অকৃপণ ধারায় অশ্রু বিসর্জন করছে যে, কোন ক্রমেই তা' রুদ্ধ হবার নয়। যদি তারা সেই অশ্রুধারার সঙ্গে তাজা শোনিত সংমিশ্রিত করে দিত, তবুও 'হে ইবনু কাসীর। এটা তোমার ব্যাপারে যৎসামান্য বলেই গণ্য হতো'।

হাফীয ইবনু কাসীরের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দুই পুত্ররত্ন ইসলাম জগতে বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। এঁদের একজন হচ্ছেন যাইনুদ্দীন আবদুর রহমান আল-কারশী। (মৃঃ৭২৯হিঃ - ১৩২৮ খ্রীঃ) এবং অপরজন বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ আল-কারশী।[১]

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) রচিত গ্রন্থমালাঃ

আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত তাফসীরুল কুরআন, হাদীসে রাসূল (সঃ), সীরাতুন্নবী (সঃ), ইতিহাস, ফিকাহ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দলমত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারগণ তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন। স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ-১৩৪৭ খ্রীঃ) বলেনঃ 'লাহু

---

[১] ফিলিস্তিনের অন্তর্গত 'রামলা' নামক স্থানে এঁর মৃত্যু হয় (৮০৩ হিঃ-১৪০০ খ্রীঃ)। এঁরা দুই ভাই অর্থাৎ যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানদ্বয় পিতার মতোই 'কারশী' হিসেবে 'মানসুব' হয়ে সে যুগের খ্যাতিমান হাদীসবেত্তা ও তাফসীরকাররূপে সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্রঃ মৎ প্রণীত 'ইমাম নাসাঈঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৭৯) পৃঃ ৩৭,৩৮।

তাসানীফু মুফীদাহ' অর্থাৎ তাঁর রচিত গ্রন্থমালা বেশ উপকারী।[১] আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আস্কালানীর মতে 'তাঁর (ইবনু কাসীরের) জীবদ্দশাতেই তাঁর মহামূল্য গ্রন্থাবলী বিভিন্ন নগর বন্দরে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং তাঁর মৃত্যুর পর দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকল লোকই তদ্বারা বেশ লাভবান ও উপকৃত হয়'।[২] আল্লামা কাযী শওকানী[৩] (মৃঃ ১২৫০ হিঃ-১৮৩৮ খ্রীঃ) এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِتَصَانِيْفِهِ لَا سِيَّمَا بِالتَّفْسِيْرِ 'তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী দ্বারা বিশেষতঃ তাফসীর দ্বারা জনগণ লাভবান ও উপকৃত হয়।

এছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছেঃ

كَانَ مُقْرِئًا مُتْقِنًا وَرَاوِيًا لِلْحَدِيْثِ مُوْثُوْقًا كَمَا كَانَ مُفَسِّرًا وَمُؤَرِّخًا مَعْرُوْفًا

---

১. আল্লামা হাফিয যাহাবীঃ তায্কিরাতুল হুফ্ফার (দায়িরাতুল মা'আরিফ হায়দরাবাদ ডেকান) পৃঃ ৭১।

২. ইবনু হাজার আসকালানীঃ 'আদ্দুরারুল কামীনাহ'ঃ পৃঃ ২৮৬।

৩. এই প্রখ্যাত মনীষীর আসল নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম আবূ আলী। ইনি ১১৭৩ হিজরীতে সান্আ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সানআর অনতিদূরে পর্বত সংলগ্ন এই শওকান' নামক ক্ষুদ্র শহরটি অবস্থিত। তিনি স্বীয় পিতা এবং আল্লামা কাওকাবানী প্রমুখের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করে ছাত্রাবস্থাতেই অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের কাজ আঞ্জাম দিতে শুরু করেন। ১৩১০ হিঃ তিনি স্বীয় শিক্ষকবৃন্দের ইঙ্গিতে ও পরামর্শক্রমে 'মুন্তাকাল আখবার' নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানির এক সুচিন্তিত ও অনুপম ভাষ্য লিখে ৮ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এর নাম 'নায়নুল আওতার'। সর্বপ্রথম এটি ২০ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পরে সংক্ষেপিত হয়। এছাড়া আরও ১১৬খানি গ্রন্থের তিনি লেখক ও সংকলক। ইয়ামেনের প্রধান বিচারপতি ইয়াহ্ইয়া বিন সালেহর মৃত্যুর পর খলিফা মানুসর বিল্লাহ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১২০৯ হিঃ তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বেশ সূচারুরূপে তিনি এই মহান দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে ফিরকায়ে যয়দিয়া এবং গোঁড়া শিয়া সম্প্রদায় তাঁর বিরোধিতায় বেশ তৎপর হয়ে উঠে। তাঁর প্রতি তারা নানারূপ কটূক্তি, অকথ্য অশ্রাব্য গালি এবং মিথ্যা দোষারোপ করে ভীষণ আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু রাজ দরবারের আনুকূল্য ও হস্তক্ষেপ হেতু বিরোধিদের কেউ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে সাহস করেনি। পরিণামে সত্য জয়যুক্ত এবং মিথ্যা পর্যুদস্ত হতে বাধ্য হয়। আল্লামা শওকানী কৃত 'আল বাদ্রুত্তালে' 'দালীলুত্ তালিব', 'দুরারুল বাহিয়াহ', 'ইরশাদুল গাবী ইলা মাযহাবি আহলিল বাইত ফী সাহাবিন্নাবী', 'হাশিয়া তালাবুল আদাব', 'কাওয়াইদুল মাজমুয়া' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তাঁর জীবন-কথা ও দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর দুইজন ছাত্র আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁর যুগে ইয়ামেন থেকে পাক-বাংলা ভারতের ভূপাল নগরে আগমন করেন। এঁদের একজন হচ্ছেন যয়নুল আবেদীন বিন মুহসিন আনসারী এবং অপরজন শাইখ হুসাইন বিন মুহসিন আনসারী। এঁরা উভয়েই ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্সির। এঁদের এবং ভূপালের নওয়াব সিদ্দীক হাসান মরহুমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাক-বাংলা ভারতে কাযী শওকানী সংকলিত গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে তিনজন মনীষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন আলী বিন মুহাম্মদ, আহমদ বিন মুহাম্মদ এবং ইয়াহিয়া বিন মুহাম্মদ শওকানী। ২য় পুত্র পিতার সমস্ত ফতোয়াগুলোকে ১২৬২ সনে 'আল-ফাতহুর্ রাব্বানী' নাম দিয়ে সংগৃহীত করেন।

অর্থাৎ 'তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদানকারী, হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে ছিলেন নির্ভরযোগ্য, যেমন তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরকার এবং ঐতিহাসিক'।

তাঁর রচিত সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থাবলী ও পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে যে গুলোর আমরা হদিস খুঁজে পেয়েছি, নিম্নে তার মোটামুটি একটা তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

(১) اَلتَّكْمِيْلُ فِىْ مَعْرِفَةِ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْمَجَاهِيْلِ 'আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী মা'রিফাতিস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফায়ে ওয়াল্‌মুজাহিল'। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্‌পী তাঁর অমর গ্রন্থ 'কাশফুয যুনূনে' এই গ্রন্থখানির 'আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী আসমাইস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং 'ইখতেসারু উলূমিল হাদীস' নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের (চরিত-অভিধান শাস্ত্র বা রাবীদের জীবনী সংগ্রহ বিজ্ঞান) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা 'হুসাইনী' দিমাশকীর আলোচনা মতে এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।[১] লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ বিন আবদুর রহমান মিয্‌যীর 'তাহযীবুল কামাল' এবং হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেনঃ

هُوَ اَنْفَعُ شَيْئًا لِلْفَقِيْهِ الْبَارِعِ وَكَذَالِكَ لِلْمُحَدِّثِ

'আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষেও উপকারী।

(২) اَلْهَدْىُ وَالسُّنَنُ فِىْ اَحَادِيْثِ الْمَسَانِيْدِ وَالسُّنَنِ 'আল-হাদয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান'। এই গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসানিদ' নামেও প্রসিদ্ধ। এতে 'মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বাল', 'মুসনাদ বায্‌যার' 'মুসনাদ আবূ ইয়ালা', 'মুসনাদ ইবনু আবি শায়বা', এবং সিহাহ–সিত্তার রিওয়ায়িতগুলোকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

---

[১] আবুল মাহাসিন হুসাইনী দিমাশ্‌কীঃ 'যাইলু তাযকিরাতিল হুফ্‌ফায (দিমাশক থেকে মুদ্রিত) পৃঃ ১৫৪; নওয়াব সিদ্দকী হাসান খাঁঃ আবজাদুল উলূম'ঃ ৩য় খণ্ড (ভূপালের সিদ্দীক প্রেস থেকে মুদ্রিত) পৃঃ ৭৮০; আহমদ শাকির সম্পাদিত 'শারাহ ইখতিসার উলূমিল হাদীসের' শুরুতে আবদুর রহমান হামযার মুকাদ্দিমাঃ পৃঃ ১৭।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কাওসারী[১] (মৃঃ ১৩৭১ হিঃ-১৯৫১ খ্রীঃ) বলেনঃ 'হুয়া মিন আনফায়ি কুতুবিহি' অর্থাৎ এই আলোচ্য পুস্তকটি গ্রন্থকারের অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থাবলীর অন্যতম'। এর হস্তলিখিত একটি কপি মিসরের 'দারুল কুতুবিল মিসরিয়া'য় সংরক্ষিত রয়েছে।

(৩) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ 'তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ। এই গ্রন্থে শাফি'ঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এর হস্তলিখিত একটি কপি শাইখ আবদুর রায্যাক হামযাহ (ইমাম ইবনু কাসীরের জীবনীকার) শাইখ হুসাইন বাসালামার কাছে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন।

(৪) مَنَاقِبُ الشَّافِعِى 'মানাকিবুশ শাফিঈ' এই পুস্তকে ইমাম[২] শাফিঈর (মৃঃ ২০৪ হিঃ- ৮২০ খ্রীঃ) অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। লেখক তাঁর অনবদ্য অবদান 'আল-বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ'-এর মধ্যে ইমাম শাফিঈর বিবরণ দিতে গিয়ে এই আলোচ্য পুস্তকেরও উল্লেখ করেছেন। এর হস্তলিখিত কপিটি 'তাবাকাতুশ শাফিঈয়ার' সঙ্গে সংযুক্ত ও একত্রিত। হাজী খলীফা তাঁর 'কাশফুয্যুনূন' গ্রন্থে এই পুস্তকটির নাম اَلْوَاضِحُ النَّفِيْسُ فِى مَنَاقِبِ الْاِمَامِ اِبْنِ اِدْرِيْس 'আল ওয়াযিহুন নাফীস ফী মানাকিবিল ইমাম ইবনি ইদ্রীস বলে উল্লেখ করেছেন।

(৫) تَخْرِيْجُ اَحَادِيْثِ اَدِلَّةِ التَّنْبِيْهِ 'তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাতিৎ তামবীহ'।

(৬) تَخْرِيْجُ اَحَادِيْثِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ 'তাখরীজু আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব' গ্রন্থকার তাঁর ছাত্র জীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে ইবনুল হাজিরের[৩]

---

[১] পুরো নাম যাহিদ বিন হাসান আল-কাওসারী (মৃঃ ১৩৭৪ হিঃ-১৯৫১ খ্রীঃ) তিনি এ যুগের একজন প্রখ্যাতনামা মনীষী। প্রথমে ইস্তাম্বুল ও পরে মিসরের কাইরোর অধিবাসী হয়েছিলেন। মুসতাফা কামাল কর্তৃক ইস্তাম্বুল থেকে নির্বাসিত হয়ে মিসরের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হাদীস বিষয়ক গ্রন্থমালার লেখক ও পত্রিকার সম্পাদক।

[২] 'আস্‌কালান' কিংবা মক্কার মিনায় তাঁর জন্ম (১৫০ হিঃ-৭৬৭ খৃঃ) ৭ বছর বয়সে কুরআন হেফ্‌য করে মক্কার মুফতীয়ে আজমের কাছে ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। অতঃপর মদীনা গিয়ে ইমাম মালেকের ছাত্র হন। কিন্তু তিনি ইমাম আহমাদের (রহঃ) আবার শিক্ষকও ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সমসাময়িক উলামা তাঁকে ফতওয়া দানের অনুমতি দেন। শেষ জীবন তিনি মিসরে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন (২০৪ হিঃ-৮২০ খ্রীঃ)। ফিকাহ শাস্ত্রে সে যুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। উপরন্তু তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাঁর মোট গ্রন্থের সংখ্যা ১১৪টি। তন্মধ্যে 'কিতাবুল উম্ম' তাঁর অবিস্মরণীয় অনবদ্য অবদান। এতে বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। 'মুসনাদ' তাঁর একটি স্বতন্ত্র হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে কোন ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন।

[৩] ইবনু হাজিবের উপরিউক্ত গ্রন্থ দু'টির ভাষ্য বা শরাহ লিখেছেন আল্লামা শামসুদ্দীন মাহমুদ বিন আবদুর রহমান ইস্পাহানী। এই ভাষ্যকারের কাছ থেকেই ইবনু কাসীর আলোচ্য গ্রন্থদ্বয় পড়েছিলেন এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের আলোকে তিনি উভয় গ্রন্থেরই বর্ণনাসূত্র বিস্তারিতভাবে প্রদান করেছেন।

'তামবীহ' ও মুখতাসার' নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তকদ্বয় কণ্ঠস্থ করেছিলেন–সে যুগের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী।

(৭) شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ 'শারহু সাহীহিল বুখারী'। গ্রন্থকার ইবনু কাসীর বুখারী শরীফের এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ কিছুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' সম্পূর্ণ করতে পারেননি। হাজী খলীফা তাঁর 'কাশফুয্যুনূন' গ্রন্থে বলেন যে, এটি শুধুমাত্র প্রাথমিক অংশেরই ভাষ্য। গ্রন্থকার তাঁর 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এই ভাষ্যটির উল্লেখ করেছেন।

(৮) اَلْاَحْكَامُ الْكَبِيْرُ 'আল-আহ্কামুল কাবীর'। এ গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহ্কাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু 'কিতাবুল হজ্জ' পর্যন্ত পৌঁছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ইবনু কাসীর তাঁর 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। মাওলানা নুর মুহাম্মদ 'আজমী সাহেব 'আহ্কামে সুগরা' নামে তাঁর আরও একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য হাদীসবেত্তাদের অনুকরণে হাফিয ইবনু কাসীর 'আহ্কামে উসতা' নামকরণে এ জাতীয় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি।[১]

(৯) اِخْتِصَارُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর 'মিনহাযুল উসূল ফী ইসতিলাহি আহাদীসির্ রাসূল' গ্রন্থে এর নাম اَلْبَاعِثُ الْحَثِيْثُ عَلٰى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ 'আল বা'ইসুল হাদীস 'আলা মা'রিফাতে উলূমিল হাদীস' বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইবনুস সালাহ (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ) লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসূলুল হাদীসের কিতাব 'উলূমিল হাদীস' ওরফে 'মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ' مُقَدِّمَةُ اِبْنِ الصَّلَاحِ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ইবনু কাসীর এর স্থানে স্থানে বহু সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে সংযোজন করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার 'আসকালানী এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেনঃ لَهُ فِيْهِ فَوَائِدُ অর্থাৎ বহু উপকারী বিষয়বস্তুর সমাবেশ এতে রয়েছে। এই উপকারী বিষয়গুলো সবই ইবনু কাসীরের সংযোজনকৃত। এটি কতবার কত দেশের কত প্রেস থেকে যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে সত্যিই তার ইয়ত্তা নেই। আমার কাছে সংরক্ষিত যে নতুন সংস্করণটি রয়েছে তা'

---

[১] মাওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমীঃ 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' ২য় মুদ্রণঃ ঢাকা, ১৯৭৫ঃ পৃঃ ১২৯ ; আবুল কাসেম মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরীঃ হাফিয ইবনে কাসীরঃ মাসিক তরজমানুল হাদীস, একাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃঃ ৭৪; মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানীর 'হায়াতু ইবনু কাসীর' (উর্দু প্রবন্ধ)ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী অনূদিত উর্দু তাফসীরে ইবনু কাসীরের শুরুতে প্রকাশিত পৃঃ ৯।

নিখুঁতভাবে মুদ্রিত হয়েছে 'দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়া' বৈরুত থেকে। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১৫২। আসলে এটি ইখতিসারু উলূমিল হাদীসের শারাহ্ বা ভাষ্য। এটি সুন্দরভাবে এডিট করেছেন আহমদ মুহাম্মদ শাকির। এর শুরুতে রয়েছে শাইখ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক হামযাহ্ কৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং হাফিয ইবনু কাসীরের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা।

(১০) مُسْنَدُ الشَّيْخَيْنِ 'মুসনাদুস শাইখাইন'। এতে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইবনু কাসীর (রহঃ) তাঁর 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে আর একখানি 'মুসনাদে উমর' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

(১১) اَلسِّيْرَةُ النَّبَوِيَّةُ 'আসসীরাতুন নবভীয়াহ'। এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ।

(১২) اَلْفُصُوْلُ فِىْ اِخْتِصَارِ سِيْرَةِ الرَّسُوْلِ 'আল-ফুসূল ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল'। এটি হযরত রসূলে আকরাম (সঃ)-এর একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। হাফিয ইবনু কাসীর স্বয়ং তাঁর তাফসীরে সূরা 'আল আহযাবে' খন্দক বা পরিখা যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। এর একখানি হস্তলিখিত কপি মদীনা মুনাওয়ারার 'শাইখুল ইসলাম' গ্রন্থাগারে আজও সংরক্ষিত রয়েছে।

(১৩) كِتَابُ الْمُقَدِّمَاتِ 'কিতাবুল মুকাদ্দিমাত'। গ্রন্থকার স্বীয় 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'মুখাতাসারু মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ্' গ্রন্থেও তিনি এর বরাত দিয়েছেন।

(১৪) مُخْتَصَرُ كِتَابِ الْمَدْخَلِ لِلْاِمَامِ بَيْهَقِىْ 'মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লিল ইমাম বাইহাকী'। এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস'-এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমদ বিন হুসাইন আল বাইহাকী (৪৫৮ হিঃ) কৃত 'কিতাবুল মাদখালের' সংক্ষিপ্ত সার।

(১৫) رِسَالَةُ الْاِجْتِهَادِ فِىْ طَلَبِ الْجِهَادِ 'রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ'। খ্রীষ্টানরা যখন 'আয়াস' দূর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকাখানি আমীর মনজাকের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

(১৬) رِسَالَةٌ فِىْ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ 'রিসালাতুন ফী ফাযায়িলিল কুরআন।এটি মিসরের 'আল-মানার' এবং অন্যান্য প্রেস থেকে তাফসীর ইবনু কাসীরের সাথে এর পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। বুলাক প্রেস থেকে মুদ্রিত কপিতে এই পুস্তিকাটি নেই। গ্রন্থকারের যে কপির সঙ্গে মক্কা শরীফের কপিটি

মিলানো হয়েছে তাতে এটি পাওয়া যায়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮। এটি হাদীস ও কুরআনের আলোকে লিপিবদ্ধ অত্যন্ত প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক।

(١٧) مُسْنَدُ اِمَامِ اَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلَ 'মুসনাদ ইমাম আহমদ ইবনু হামবাল' মহামতি ইমাম আহমদ ইবনু হামবালের (রহঃ) বিরাট বিশাল মুসনাদ গ্রন্থখানিকে বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে সুবিন্যস্ত করে এবং তার সঙ্গে ইমাম তাবরানীর মু'জাম ও আবূ য়া'লার মুসনাদ থেকে অতিরিক্ত হাদীসগুলো তার মধ্যে সন্নিবেশিত করে এই গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছে।

(١٨) اَلْبِدَايَةُ وَ النِّهَايَةُ 'আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া। ইবনু কাসীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির প্রাথমিককাল থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। প্রথমে নবী ও রাসূলগণ ও পরে প্রাচীন জাতির তথা বিগত উম্মতদের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষে সীরাতে নবভী (সঃ)-এর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর খিলাফতে রাশেদা থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে এই পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি তথা রোয কিয়ামতের আলামতসমূহ এবং আখিরাত বা পরজগতের অবস্থার কথাও ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাশফুয্‌যুনূন' গ্রন্থে বলেনঃ

اِعْتَمَدَ فِىْ نَقْلِهِ عَلَى النَّصِّ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فِىْ وَقَائِعِ الاُلُوْفِ السَّالِفَةِ وَمَيَّزَ بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَ السَّقِيْمِ وَالْخَبَرِ الْاِسْرَائِيْلِىْ وَغَيْرِهِ (كشف الظنون)

অর্থাৎ 'পূর্বকালের শত সহস্র বছরের ঘটনাসমূহের বিবরণ পবিত্র কুরআন ও শাশ্বত সুন্নাহর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে পেশ করা হয়েছে এবং সহীহ ও দুর্বল এবং ইস্রাঈলীয় রেওয়ায়েতগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে'।

মোটকথা ইমাম ইবনু কাসীর এই অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থের 'ইস্রাঈলিয়াত' বা অলীক ও আজগুবি ঘটনাসমূহকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাগরী বিরদী আলোচন্য গ্রন্থ সম্পর্কে বলেনঃ هُوَ فِىْ غَايَةِ الْجَوْدَةِ অর্থাৎ 'গ্রন্থখানি অতীব চমৎকার।

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা হাফিয বদরুদ্দীন মাহমুদ 'আইনী রচিত ইতিহাস গ্রন্থটির অধিকাংশই এ গ্রন্থকে অবলম্বন ও ভিত্তি করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উত্তরসূরীরাও একে সামনে রেখে তাঁদের নিজ নিজ ইতিহাসকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর করে প্রণয়ন করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী আলোচ্য গ্রন্থের একখানি সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেন।

আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর অবধারিত মৃত্যুর দুই বছর আগ পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সীরাতুন্নবী অংশকে বেশ চমৎকার ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(১৯) تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ 'তাফসীরুল কুরআনিল্ কারীম' বা 'তাফসীর ইবনু কাসীর'। পবিত্র কুরআনের এই সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন لَمْ يُؤَلَّفْ عَلٰى نَمَطِهٖ مِثْلُهٗ অর্থাৎ এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধই হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ বিন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন هُوَ مِنْ اَفْيَدَ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ بِالرِّوَايَةِ। 'রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী'।[1]

সত্য কথা বলতে কি, হাফিয ইবনু কাসীর সর্বমোট যে বিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মধ্যে এই তাফসীরুল কুরআনিল কারীমই তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, অবিস্মরণীয় ও অমর অবদান। এর প্রতি খণ্ডের পাতায় পাতায় পরিস্ফুট রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর পরিশ্রম, গবেষণা সুলভ অনুসন্ধিৎসা, অধ্যয়ন ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের ছাপ।

এমনিতেই প্রাচীন যুগে রচিত তাফসীর গ্রন্থের বহুলাংশই আজ অনন্ত কাল সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। আজ তাদের অস্তিত্ব এই পৃথিবীর কোন অংশেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার এমন কতগুলো তাফসীর গ্রন্থও রয়েছে যেগুলো এখনও হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির আকারে আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে দিনের আলো দেখতে সক্ষম হয়েছে তন্মধ্যে এই আলোচ্য 'তাফসীর ইবনু কাসীর' বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। 'তাফসীরে মান্কূল' বা রিওয়ায়িতমূলক তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সময়ের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের তাফসীর হলো তাফসীর ইবনু জারীর তাবারী। তাফসীর ইবনু কাসীরের মধ্যে অন্যান্য তাফসীরসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলোর সংযোগ ও সমন্বয় সাধিত হয়েছে। অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা মাসয়ালাসমূহকে প্রতিপন্ন করার দিক থেকে এক দিকে যেমন এতে তাফসীর ইবনু জারীর তাবারীর বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে, তেমনি অপূর্ব ভাষা শৈলী ও বর্ণনা পদ্ধতির লালিত্যের দিক দিয়ে 'তাফসীর কুরতুবী ও মা'আলিমুত্ তানযীলের সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আরবী শব্দমালার পার্থক্যসহ প্রতিটি হাদীসের 'সিলসিলায়ে সনদ' বা বর্ণনাক্রম দ্বারা নির্ভরযোগ্য করে এর গুরুত্ব ও মূল্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হয়েছে। এছাড়া

---

১. শাইখ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক বিন হামযাহঃ তরজমাতুল ইমাম ইবনু কাসীরঃ ২য় সংস্করণ, দারুল কুতুব, বৈরুতঃ পৃঃ ১৬, ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন যাহবীর 'আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূনঃ ১ম খঃ, ২য় সংস্করণঃ ১৯৭৬, দারুল কুতুবঃ পৃঃ ২৪৪; মাওলানা আলীমুদ্দীন 'আরবী ভাষায় কুরআনের তাফসীরঃ সাপ্তাহিক আরাফাতঃ ১১শ বর্ষ, কুরআন সংখ্যা।

বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের দুর্বোধ্য ও জটিল অংশগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ছাড়াও এতে দ্ব্যর্থবোধক শব্দমালার রয়েছে আভিধানিক তাৎপর্য ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ। আরও রয়েছে এতে শানিত যুক্তির সূক্ষ্ম মানদণ্ডে এবং কষ্টি পাথরে যাচাই করে অকাট্য দলীল প্রমাণের আলোকে কতগুলো ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন। মোটকথা, এটি বিদআত থেকে মুক্ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য গ্রন্থের কোথাও দুরূহতা বা জটিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। প্রায় সর্বত্রই বর্ণনা রীতির পারিপাট্য, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা এবং প্রাঞ্জলতার জন্যে আলোচনা হয়েছে প্রাণবন্ত। বিতর্কমূলক বিষয়ে হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্তি ও ঐতিহাসিকের নির্লিপ্ততা রক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। হাদীস ভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্যই এসব ক্ষেত্রে তাঁকে আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়েছে। কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তথ্য বিচার -বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁর অভিমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু কোথাও ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছেন বলে মনে হয় না।

এ কথা সত্য যে, হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর আলোচ্য তাফসীরে তাঁর পূর্বসূরী ইবনু জারীর তাবারীর রচনা রীতি, ঐতিহাসিক ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাবারীর তাফসীরে 'ইস্রাঈলিয়াত' নামক যেসব অপ্রামাণ্য ও জাল হাদীস ভিত্তিক উপাখ্যান ও বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলোকে যাচাই বাছাই করে ইবনু কাসীর বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে একে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ তাফসীরে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এসব ন্যায়সঙ্গত কারণেই একে 'তাফসীরে সালাফী' নামে অভিহিত করা হয়।[1]

এই সর্বজনপ্রিয় বিরাট তাফসীর গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম মিসরের বোলাক প্রেস থেকে ১৩০১ হিঃ মুতাবেক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ -১৮৮৯খৃঃ) কৃত তাফসীর 'ফাতহুল বায়ানে'র হাশিয়ায় মোট ১০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। অতঃপর এটি আল্লামা হুসাইন বিন মাসউদ আল-ফাররা আল-বাগাভী (মৃঃ ৫১৬ হিঃ -১১২২খৃঃ) কৃত তাফসীর 'মাআলীমুত্ তানযীলে'র সঙ্গে মিসরের কোন এক প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তারপর ১৩৫৬ হিজরী মুতাবেক ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এটি আলাদাভাবে মিসরের আল-হালাবী প্রেস থেকে বড় বড় চার খণ্ডে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরও কয়েকবার একাধিক স্থান থেকে এটি প্রকাশিত

---

[1] আঃ কাঃ মুহাম্মদ আদমুদ্দীনঃ 'ইলমে তাফসীর'ঃ 'আজাদ ঈদ সংখ্যাঃ ১৩৫৩/১৯৪৬ খ্রীঃ পৃঃ ৭৩; শাইখ আবদুর রায্যাক হামযাহঃ মুকাদ্দিমা ইখতিসারু উলূমিল হাদীস ওয়া তরজমাতুল মুয়াল্লিফ'ঃ দারুল কুতুব, বৈরুতঃ পৃঃ ১৬-১৭, ডঃ মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবীঃ 'আত্তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন'ঃ ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণঃ দারুল কুতুবিল হাদীসিয়াহঃ ১৯৭৬ সালঃ পৃঃ ২৪৪; মাওলানা আলীমুদ্দীনঃ আরবী ভাষায় কুরআনের তাফসীরঃ সাঃ 'আরাফাত' পৃঃ ৭০-১১ শ বর্ষঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারীঃ ১৯৬৮ঃ

হয়। সর্বশেষে মরহুম শাইখ আহমদ শাকির এই তাফসীরের মধ্যে উল্লিখিত হাদীসমূহের সনদ বা বর্ণনাসূত্রকে বাদ দিয়ে মিসর থেকে প্রকাশ করেন। তাফসীর ইবনু কাসীরের অপূর্ব জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বের কথা অনুধাবন করে মহাগুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াওয়াড় এলাকার মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী[১] একে উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। এই উর্দু অনুবাদ প্রথমে 'আখবারে মুহাম্মদী' নামক দিল্লী থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত এক পাক্ষিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর গ্রন্থকারের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৩৫০ হিঃ মুতাবিক ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে। এখন এটি একই সঙ্গে পাক-ভারতের বহু প্রেস থেকে হাজার হাজার কপি করে মুদ্রিত হচ্ছে। আর কাটতিও হচ্ছে প্রচুর।

---

[১] বোম্বাই প্রদেশের (বর্তমান মহাগুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াওয়াড় এলাকার জুনাগড় শহরে সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ মাইমান বংশে তাঁর জন্ম। পিতা ইব্রাহীম সাহেব ও মাতা হাওয়া বিবি ছিলেন উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। ২২ বছর বয়সে জুনাগড়ের বুক থেকে দিল্লীর মাটিতে আগমন করে তিনি লেখা পড়া শুরু করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করে এখানেই তিনি 'মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া' নামে একটি নির্ভেজাল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ পত্তন করেন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষায়তন দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞান পিপাসুকে জ্ঞানালোক দান করেছে। ১৯২১ সালে দিল্লী থেকে তিনি 'আখবারে মুহাম্মদীয়া' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা নিজস্ব সম্পাদনায় বের করেন। তাঁর অনুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় দেড় শতেরও অধিক। এগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে এ থেকেই কিছুটা আঁচ করা সম্ভব যে, লেখকের জীবদ্দশায় কোন কোন বইয়ের নয় দশটি সংস্করণও বের হয়। এছাড়া তাঁর বেশ কিছু বই বাংলা, ইংরেজী, গুজরাটি এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মৌলিক গ্রন্থাবলী ছাড়া অনুবাদ সাহিত্যে মওলানা মুহাম্মদ সাহেব শুধু যে আড়াই হাজার পৃষ্ঠব্যাপী তাফসীর ইবনু কাসীরের তরজমা লিখেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, বরং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মদ হায়াতকৃত 'ফাতহুল গফুর ফী অজ্ইল আয়দী', আল্লামা শাইখ তাকীউদ্দীন সুবকী কৃত 'রিসালা জুয্ই রাফ্ইল ইয়াদাইন' এবং শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের (রহঃ) ই'লামুল মুয়াক্কি'য়ীন' প্রভৃতি গ্রন্থমালাকেও উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থটি পূর্ণ সাত খণ্ডে সমাপ্ত। এটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই ইমামুল হিন্দ হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আনন্দে গদগদ চিত্তে অনুবাদককে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে কলকাতা থেকে একাধিকপত্র প্রেরণ করেন। এই ঐতিহাসিক পত্রগুলো আজও উক্ত গ্রন্থের শুরুতে সন্নিবেশিত দেখতে পাওয়া যায়।

আল্লাহ পাক মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী সাহেবকে অনলবর্ষী ভাষণের এমন এক সম্মোহনী শক্তিদান করেছিলেন যে, তাঁর বিষয়বস্তুর গুরুত্বে-ভাষার ওজস্বিতায় বর্ণনা মাধুর্যে, পারিপাট্য ও কৌশলে সমবেত জনতা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ও মন্ত্রমুগ্ধ না হয়ে পারতো না। কুরআন ও হাদীসের অমিয় বাণী, সীরাতে নবী, ইসলামের ইতিহাস এবং সাল্ফে সালেহীনের ত্যাগপূতঃ আদর্শ জীবনের ঘটনাবলীই ছিল তাঁর আগুনঝরা, বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণে প্রধান উপজীব্য। আরব ভূমিতে আবদুল আযীয ইবনে সউদের শাসনভার হাতে নেওয়ার পর মু'তামারে আলামে ইসলামীর এক অধিবেশন সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে তিনিও যোগদান করেন।

অবশেষে ইসলামী শরীয়ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই প্রদীপ্ত মশাল মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী ১৯৪১ খ্রীঃ মুতাবিক ১৩৬০ হিঃ ১৩ই সফর জুমআর রাত্রে আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে স্বীয় জন্মভূমি জুনাগড় শহরে ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।

আলোচ্য তাফসীর ইবনু কাসীর সম্পর্কে আল্লামা হাফিয আবূ আলী মুহাম্মদ শওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ-১৮৩৪ হিঃ) বলেনঃ

وَقَدْ جَمَعَ فِيْهِ فَاَوْعٰى وَ نَقَلَ الْمَذَاهِبَ وَ الْاَخْبَارَ وَ الْاٰثَارَ وَ تَكَلَّمَ بِاَحْسَنِ كَلَامٍ وَ اَنْفُسِهٖ -

অর্থাৎ 'আলোচ্য গ্রন্থে তিনি হাদীসের রেওয়ায়তগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন পূর্ণাঙ্গভাবে তা আহরণ করেছেন যে, তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির লেশমাত্রও নেই। অনুরূপভাবে তিনি এতে বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদ, হাদীস এবং সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবি-ঈনের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করেছেন এবং প্রতিটি আলোচনা অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন'।

আলোচ্য তাফসীরের বিশেষত্ব এই যে, এতে কুরআন ভাষ্যের মূলনীতির অনুসরণে সর্বপ্রথমে অপরাপর আয়াতের আলোকে তাফসীর করা হয়েছে। তারপর হাদীসবেত্তাদের সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থমালায় উক্ত বিষয়ে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সনদসহ উদ্ধৃত করে প্রয়োজনবোধে সে হাদীসের 'সিলসিলায়ে সনদ' বা বর্ণনাসূত্র ও রিজাল বা হাদীসের রাভীগণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাফিয ইবনু কাসীরের এই তাফসীর অধ্যয়ন করে ভাষ্য সম্পর্কিত তাঁর অনুসৃত এই মূলনীতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পেরেছি। বাস্তবিকই এরূপ দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটির সূচারুরূপে সমাধার জন্যে তাঁর মতো সুযোগ্য ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন কালজয়ী মুহাদ্দিসেরই প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ পাকের অশেষ ধন্যবাদ যে, আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহঃ) তাঁর জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃতফল হিসেবে এই দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করে দিয়ে তিনি সুধী সজ্জন তথা শিক্ষিত জগতের প্রভূত কল্যাণসাধন করে গেছেন। আগেই বলেছি আলোচ্য তাফসীরে তিনি অন্যান্য তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে 'ইসরাঈলী রিওয়ায়িত' গুলোকে সূক্ষ্ম সমালোচনার মানদন্ড ও কষ্ঠিপাথরে যাচাই বাছাই করে তা সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি একজন সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এবং তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখানেই তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। একথা সত্য যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে ইবনু জারীর, ইবনু আবি হাতিম ও ইবনু আতীয়া গারনাতী প্রমুখ পূর্বসূরীদের ভাষ্যের তিনি মাঝে মাঝে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আবার কোন এক বিশেষ উক্তিকে অন্য উক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোকে বর্ণনা করতে গিয়ে কোন্‌টি অপ্রামাণ্য সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর এভাবে রাবী বা বর্ণনাকারীদের সূক্ষ্ম সমালোচনা করতে তিনি আদৌ পশ্চাদপদ হননি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'সূরাতুল বাকারার' ১৮৫ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি আবূ নুজাইহ বিন আবদুর রহমান আলমাদানী এবং আবূ হাতিম প্রমুখ বর্ণনাকারীদেরকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেন।[১] অনুরূপভাবে উক্ত সূরাতুল বাকারার ৬৭ আয়াত اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ-এর তাফসীর করতে গিয়ে প্রথমে গাভী সম্পর্কিত প্রচলিত চিত্তাকর্ষক কাহিনী আগাগোড়া তিনি বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সালফে সালেহীনের উক্তি এবং 'উবাইদাহ' আবুল আলীয়াহ ও সুদ্দী প্রমুখের বর্ণনা সম্পর্কেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারপর সমগ্র কাহিনীটিকে তিনি অনির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।[২] উক্ত 'সুরাতুল বাকারার' ২৫১ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি ইয়াহিয়া বিন সাঈদ প্রমুখ রাবীদেরও দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩]

পবিত্র কুরআনের ২৬ পারায় 'সূরায়ে কাফ' এর সূচনায় ق নামক যে আদ্য অক্ষরটি রয়েছে সে সম্পর্কে অন্যান্য মুফাসসির বা ভাষ্যকার বলেন যে, এটি সারা বিশ্বজাহানকে পরিবেষ্টনকারী এক পাহাড়ের (কোকাফ) নাম। হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর এ প্রসঙ্গে বলেন যে, এ ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়িত কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।[৪]

কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত ও হাদীস শরীফ ছাড়া তিনি স্বীয় তাফসীরের কোন কোন স্থানে ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিতর্কের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করার শ্রম স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আহকাম সম্বন্ধীয় আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের আলিমদের উক্তি ও দলীলসমূহের উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'সূরাতুল বাকারার' ১৮৫ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট চারটি মাসয়ালার কথা উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের উক্তি, দলীল প্রমাণ এবং অভিমতও পেশ করেন।[৫] অনুরূপভাবে সূরাতুল বাকারার তালাক সম্বন্ধীয় ২৩০ আয়াতের[৬] তাফসীর করতে গিয়েও পুনর্বিবাহের শর্তসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অনুকূল প্রতিকূল সমস্ত দলীল প্রমাণের কথা উল্লেখ করেন।[৭] এভাবে আহ্কাম সম্বন্ধীয় আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে

---

[১] 'তাফসীর ইবনু কাসীর'ঃ ১ম খণ্ডঃ পৃঃ ২১৬।

[২] 'আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন'১ম খণ্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২৪৫-২৪৬।

[৩] 'তাফসীর ইবনু কাসীর' ১ম খণ্ডঃ (পূর্বোক্ত) পৃঃ ৩০৩, ১০৮-১১০,

[৪] 'তাফসীর ইবনু কাসীর, ৪র্থ খণ্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২২১,

[৫] তাফসীর ইবনু কাসীরঃ ১ম খণ্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২১৬-২১৭।

[৬] আলোচ্য আয়াতটি নিম্নরূপঃ
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ـ اِلَى الْاٰخِرِ (২: ২৩০)

[৭] তাফসীর ইবনু কাসীরঃ ১ম খঃ (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২৭৭-২৭৯।

হাফিয ইবনু কাসীর ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের তুমুল বিতর্ক ও বাদানুবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তাঁদের বিভিন্ন মাযহাব ও দলীলসমূহকে নিয়ে আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোথাও সীমালংঘন করেননি–যেভাবে অন্যান্য ফেকাহশাস্ত্রজ্ঞ তাফসীরকারগণ সীমা-পরিসীমার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর এই আলোচ্য তাফসীরের শুরুতে প্রায় ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ 'মুকাদ্দিমা' বা ভূমিকার অবতারণা করেছেন। এতে তাফসীর সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। এই তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান ভূমিকার ফলে তাঁর তাফসীরের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেকখানি বর্দ্ধিত হয়েছে। অবশ্য এই দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শাইখুল ইসলাম ইমাম **ইবনু** তাইমিয়ারও কিছু কিছু অনুসরণ করেছেন।[১]

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর ইবনু কাসীরের নির্ভরযোগ্যতা ও অপূর্ব জনপ্রিয়তাকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন ভাষাভাষী পণ্ডিতবর্গ শুধু যে নানা ভাষায় এর অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন তাই নয়, বরং অনেকেই এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করে প্রকাশ করতেও সচেষ্ট হয়েছেন।[২] এই সংক্ষেপকারীদের মধ্যে শায়খ

---

[১] মুকাদ্দিমা-ই-তাফসীর ইবনু কাসীর'ঃ (পূর্বোক্ত) পৃঃ ১-৯; ডঃ মুহাঃ হুসাইন যাহাবীঃ আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাসিরূন'১ম খন্ড (পূর্বোক্ত) পৃঃ ২৪৪; মওলানা আবদুস সামাদ সারিস আযহারীঃ তারীখুল কুরআন ওয়াত তাফসীরঃ লাহোর ২য় সংস্করণ।

[২] 'সাফওয়াতুত্তাফাসীর' ও 'মুখতাসার ইবনু কাসীর' নামক গ্রন্থদ্বয়ের সংকলয়িতা শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্‌সাবুনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপঃ

তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার অন্তর্গত আলেপ্পো শহরে আশ্‌শাহবা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলেপ্পোর আশ্‌শারয়িয়া মহাবিদ্যালয় হতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আলেপ্‌পোর বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আট বছরকাল শিক্ষকতা করেন। তারপর মক্কা মুকাররমায় ইসলাম ধর্ম ও প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বেশ কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। এমনিভাবে তিনি সৌদী আরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পঁচিশটি বছর অতিবাহিত করেন।

তাঁর রচনাবলীঃ কুরআন সুন্নাহর উপর তিনি যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলোর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১। রাওয়াইউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকামিল কুরআন (২ খণ্ড)।
২। মিন কুনুযিস সুন্নাহ; দিরাসাতুন আদাবিয়াতুল লুগাভিতুন লিল আহাদিসি।
৩। আল-মাওয়ারিস ফিস্ শারিয়াতিল ইসলামিয়া ফী যাউয়িল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ।

(অপর পৃঃ দ্রঃ)

মুহাম্মদ আলী আস্‌সাবুনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বইরুতের দারুল কুরআনিল কারীম নামক প্রকাশনী থেকে বেশ সুন্দর আকর্ষণীয়ভাবে তিন খণ্ডে ছাপানো হয়েছে। নীচে টীকা-প্রটীকা বিশিষ্ট এই সংস্করণটি সর্বত্রই এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন যে, এ পর্যন্ত প্রায় ৮/৯টি সংস্করণ বেরিয়ে গেছে।

৪। আন্ নুবূওয়াত ওয়াল আম্বিয়া ওয়া দিরাসাতুন তাহলীলিয়াতুন লি হায়াতির রুসুলিল কিরাম।

৫। মুখতাসারু তাফসীর ইবনু কাসীর (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)

৬। আত্‌তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন।

৭। সুফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর (তিন খণ্ডে সমাপ্ত) (বাকী—৩২ পৃঃ)

৮। মুখতাসারু তাফসীরিত তাবারী।

৯। তাহকীকু কিতাবি ফাতহির রাহমান ফিমা ইয়ালতাবিসু মিনহু আয়াতুল কুরআন।

১০। তাহকীকু তাফসীরিদ দাওয়াত আল-মুবারাকাত।

১১। রিসারাতুল মাহদী ওয়া আশরাতুস সায়াত।

১২। রিসারাতু শুবহাত ওয়া আবাতিল হাওলা তা'আদ্দুদি যাওজাতির রুসুল (সঃ)।

১৩। আল হাদিউন নববী আস সাহীহ ফী সালাতিত্ তারাবীহ।

১৪। আল মুন্‌তাখাবুল মুখতার মিন কিতাবিল আযকার লিল ইমাম নববী (রহ)।

এগুলো ছাড়াও তাঁর বহু রচনাবলী পাণ্ডুলিপির আকারে আবদ্ধ ও প্রকাশনার পথে রয়েছে।

তিনি মক্কা মুকাররমার 'উম্মুল কুরা' বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত স্থায়ী শিক্ষক। কিন্তু এতবড় আলেম, লেখক, সংকলক এবং বিদগ্ধ মনীষী হওয়া সত্ত্বেও অতি দুঃখের সাথে জানাতে হয় যে, তাঁর আকীদা ও ঈমানগত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং আপত্তিজনক কার্যকলাপের জন্য আজ তিনি পবিত্র মক্কা শরীফ এবং আরব দেশের অন্যত্রও অতি ব্যাপকভাবে নিন্দিত, বিতর্কিত এবং অতি বিরূপভাবে সমালোচিত। সউদী আরবের অন্ধ অথচ শ্রেষ্ঠতম আলেম শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায স্বয়ং তাঁর বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। অনাগত দিনে আমরা এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করি।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

تفسير ابن كثير

تأليف

الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه اللّه

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن
الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية
جامعة راجشاهى، بنغلاديش